এবং মার্কেট ভিজিট



অভীক সরকার

এবং মার্কেট ভিজিট

অভীক সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

ABONG MARKET VIJIT
by Avik Sarkar

ISBN 978-81-952375-4-8

Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২১
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে।

লেখকের কথা

ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী তাঁর ''রোমন্থন'' নামের অসামান্য আত্মজীবনীমূলক রম্যরচনাটির শুরুতে লেখকের বক্তব্যের শীর্ষনাম দিয়েছিলেন 'প্রারম্ভিক মুখব্যাদান', যুক্তি ছিল মুখখোলাকে মুখবন্ধ বলা নিতান্তই অর্থহীন। প্রাজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর যে কথা বলে অনায়াসে পার পেয়ে গেলেন, এবং তাবৎ পাঠকেরা ''কেয়াবাৎ, বহোত খুব'' বলে সোল্লাসে শাবাসি দিয়ে উঠলেন, এই অর্বাচীন সে কথা বললে অনেক রসিকজনই যে আমার মুখ বন্ধ রাখার পক্ষেই মত দেবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু লেখককে কিছু কৈফিয়ত দাখিল করতেই হয়। যদিও প্রকাশক মশাই এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কয়েকটা পাতা ফালতু ফালতু নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু প্রথা। তাছাড়া জাতে বাঙাল, কথা কইবার সুজুক পাইসি, ছারুম ক্যান?

আমার লেখা বই বার হবে এ স্বপ্ন আমি কোনওদিন দেখিনি। বস্তুত লেখক হবার ইচ্ছে বা লেখক তকমাটির প্রতি মোহ, দুটির কোনওটিই আমার কখনো ছিল না, আজও নেই। আমি চাকরিজীবী ছাপোষা মধ্যবিত্ত। নিজের চাকরি,যৎসামান্য পড়াশোনা আর নিভৃত গৃহকোণটি নিয়ে ভারি সুখেই ছিলাম। এহেন দুর্মতি যে কখনও হবে তার কোনও পূর্বলক্ষণই ছিল না। ছোটবেলায় ভারি রুগ্ন ছিলাম বলে খেলাধূলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারতাম না। সেই বয়সে বড়দের চোখরাঙানি তাও মেনে নেওয়া যায়, সমবয়সীদের টিটকিরি মেনে নেওয়া বড়ই দুঃসহ। ফলে আমাকে একটা নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিতে হয়। সেই জগতের একচ্ছত্র অধিপতি রাজা রায়চৌধুরী বলে একটা খোঁড়া লোক, সঙ্গী হিসেবে দুই দাদা, প্রদোষ মিত্র এবং ভজহরি মুখুজ্জে। সে জগতে ষষ্ঠীঠাকুরুন ধরা পড়ার ভয়ে ক্ষীরের পুতুলের বদলে একটি ষেটের বাছা দিয়ে যান, সে জগতে এক বাচ্চা রিপোর্টার আর তার পোষা কুকুর শেখায় যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই সত্যিকারের সাহস। সেই জগতে আরও ছিল ভারি মিষ্টি কিছু ভূত, কবরে শুয়ে থাকা এক পাগলা সাহেব, পাতালঘরে এক্সপেরিমেন্ট করা এক বৈজ্ঞানিক, পুরোনো মায়াভরা কিছু গ্রামগঞ্জ যেখানে সদাসর্বদাই নানা মজার কাণ্ড ঘটে চলেছে।

আর এসবের মধ্যে ছিলেন গোল চশমা পরিহিত এক ভদ্রলোক, তাঁরই বানানো এক আশ্চর্য দুনিয়া নিয়ে।

সুকুমার রায়।

সেই নিজের বানানো জগৎ থেকে আজও পরিত্রাণ পাইনি, পাওয়ার যে খুব ইচ্ছে আছে তাও নয়। আমি পাঠক, পাঠক হিসেবেই ভারি তৃপ্ত ছিলাম।

এমন সময়ে, আমি তখন ঠিক কচিটি নই, চাকরিজীবনে প্রবেশ করেছি, এমন সময়ে ফেসবুক নামের সোশ্যাল মিডিয়াটি এসে দুদিনের মধ্যে জনচিত্ত জয় করে বসলো। পোস্ট, স্টেটাস, লাইক, শেয়ার, এই বহুলপ্রচলিত শব্দগুলির সংজ্ঞাই গেলো বদলে।

সমাজজীবনে ফেসবুক আদি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার অভিঘাত নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণা চলছে, আরও নিশ্চয়ই চলবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ফেসবুকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো আমরা যারা স্কুল ও কলেজ জীবনের পর বাংলা ভাষা পড়া বা লেখা ভুলেই গেছিলাম, তাদের ফের ফেসবুকের লেখালেখির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের দিকে টেনে আনা। আমার এক অনুজপ্রতিম সাংবাদিক এর নাম দিয়েছেন মুক্তগদ্য। বস্তুত ফেসবুকের দৌলতে এমন কিছু চমৎকার গদ্য বা পদ্য পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে যা আক্ষরিক অর্থেই মণিমুক্তোর সমান।

এমন সময় নিজেরও বাংলা অক্ষরে ফেসবুকে কিছু লেখার বাসনা দুর্মদ হয়ে ওঠে। কবে এবং ঠিক কি কারণে এই 'রেখো মা দাসেরে মনে' আবেগটির উদ্ভব ঘটে, বলা মুশকিল। তবে মোটামুটি আজ থেকে বছরখানেক আগে হবে, যখন আমি প্রথম বাংলা অক্ষরে কিছু লিখি। ততদিনে আমি বেশকিছু সাহিত্যমূলক গ্রুপেও ঢুকেছিলাম। তাদেরই একটিতে অসীম সাহসে ভর করে আমি দুয়েকটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করি। আমার এক প্রাচীনা বান্ধবী (না তিনি বয়সে প্রাচীনা নন, প্রাচীনকাল থেকে আমার বান্ধবী) 'তুমি ঠিক যে ভাবে কথা বলো, সেভাবে লেখো' গোছের পরামর্শ দেন। খুব সম্ভবত আমার আজন্মকালের ছ্যাবলামির ওপর তাঁর ঐকান্তিক আস্থা ছিল। আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম বেশ কিছু লোকজন পছন্দ করছেন। দু একজন গুরুস্থানীয় লোক উৎসাহ দিতে লাগলেন। ফলে এই উদ্বাস্তু গরীব বাঙাল উত্তেজনায় ফেটে পড়ে 'যায় যদি জীবন চলে' স্লোগান তুলে মহোৎসাহে লেখালেখি শুরু করে দিলেন!

আদতে আমি সেলসের লোক, দশ বছরের ওপর হলো এ লাইনে আছি। দেশ দেখেছি প্রচুর, লোক দেখেছি আরও বেশি। অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে, ভারতবর্ষ নামের এই ভূখণ্ডকে চিনেছি আরও নিবিড়ভাবে। সেসব অভিজ্ঞতাই এক এক করে 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে' গল্পের আকারে লেখার চেষ্টা করেছি বার বার। এছাড়াও কিছু ছোটগল্প, আমার শিশুকন্যার সঙ্গে আমার কিছু চিত্তাকর্ষক আলোচনাও রয়ে গেছে একইসঙ্গে।

তারপর বছরখানেক কেটে গেছে। নিজের টাইমলাইনে এবং বিভিন্ন গ্রুপে আজন্মসঞ্চিত ইয়ার্কি ফাজলামি গুলো লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেই চলেছি। অনেকেই বাংলাসাহিত্যের কমলবনে এই মত্তমাতঙ্গের বালখিল্য বিচরণ দেখে শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন, অজ জাতীয় প্রাণীর পক্ষে হলকর্ষণ যে তেমন সুফলপ্রদ নহে, মিষ্টভাষে এ কথা বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন নি। এহ বাহ্য, যেসব মহাত্মনদের চিন্তা সদাসর্বদাই তূরীয়মার্গে বিচরণ করে, সেই তাঁরা এহেন অপরিসীম ঔদ্ধত্যের পেছনে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের কালো হাত দেখে চ্যাটরুমে চ্যাটচ্যাটে থিসিস অবধি নামিয়ে ফেলতে ছাড়েননি!

এসব দেখে ভারি দুঃখ হলো। মহাতপাঃ নবারুণ বাঙালি জাতিকে অসহায় ছাড়াও আরেকটি সুচিন্তিত এবং মনোহারী আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অধম অতি দ্রুত সেই আখ্যার সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে বেশি সময় নেন নি। ফলে যাবতীয় খেচর, উভচর এবং জলচর বাঙালির সার্বিক মঙ্গলার্থে ভাবলাম এসব লেখা একত্রে বই হিসেবে প্রকাশ করলে কেমন হয়? কয়েকজন বন্ধুবেশী শত্রু খুবই উৎসাহ দিতে থাকলেন, সেসব শুনে নিজেকে মুজতবা আলি কি নবনীতা দেবসেনের সমকক্ষই বোধ হতে লাগলো।

কিন্তু বই প্রকাশ করতে প্রকাশক দরকার, তদুপরি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'র যুক্তি প্রকাশনা জগতে চলে না। আর তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা আমার মতন অর্বাচীনের বই ছাপাবেন, এহেন দুরাশা স্বপ্নেও করিনি। তবে এই দেখে আশা হয়েছিল যে কয়েকজন উৎসাহী যুবক বাংলা প্রকাশনা ব্যবসার মরা গাঙে তরী ভাসাতে রাজি হয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের নিবিড় আগ্রহ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদেরই একজন, দ্য কাফে টেবল-এর অরিজিৎ ভদ্র, যেদিন নিজে থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন, যেদিনই ঝট করে মনে পড়ে গেছিলো কবিগুরু একবার বলেছিলেন বটে, প্রকাশকের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ!

যাই হোক অরিজিতবাবুর সৌভাগ্য অক্ষয় হোক, কলেজ স্ট্রীটের সামনে ওঁর মর্মরমূর্তি স্থাপিত হোক, এই নাদান বালকের প্রথম বইটি তাঁরই কৃপায় প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা জীবনান্তেও ভুলব না।

বইটি বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট থাকার পর দীপ প্রকাশনের কর্ণধার দীপ্তাংশু পুনঃপ্রকাশের জন্য বইটি চেয়ে বসলেন। আমি তাঁকে অনেক করে বোঝালাম যে এই বই আর বিক্রি হওয়ার চান্স নেই বললেই চলে। একে এসবের অধিকাংশই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে লেখা, সেসব কাঁচা হাতের কলমবাজি দেখলে নিজেরই লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া বহুদিন ধরে তক্কে তক্কে আছি যে চিন্তাশীল সারস্বত সমাজে কল্কে পাব। সেখানে বিভিন্ন তাৎপর্যসন্ধানী তত্ত্বভুবনে আশ্চর্য স্বকীয়তায় ঋদ্ধ বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং তৎসন্নিহিত

মগ্নচৈতন্যে নিবিষ্ট বীক্ষাভুবন- এসব গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। সেই থেকে নিজের কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে একটা উদাস ইন্টেলেকচুয়াল ভাব আনার চেষ্টায় আছি। সেখানে এসব সস্তা ছ্যাবলামি করলে ব্র্যাইন্ড ভ্যালু লিক করে যাবে না?

কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই শুনলেন না, রাতবিরেতে ফোন করে খুব কড়া গলায় শাসাতে লাগলেন। ফলে ''তোমার ভুবনে মা'গো এত চাপ'' ইত্যাদি ভেবেটেবে মাভৈঃ বলে পাণ্ডুলিপিখান পাঠাতেই হল।

যাই হোক, অলমিতি বিস্তারেণ। অনেক প্যাচাল পাড়ার পর আপাতত এখানেই এই মনোলগ শেষ করলাম। আশা করি সুধী জনগণ বইটা বুকে তুলে নেবেন, বুকে না নিয়ে অন্ততপক্ষে হাতে তুলে নিলেও হবে। ভালো লাগলে জানাবেন, আর খারাপ লাগলে অতি অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, ঠাণ্ডা লাগাবেন না, দেখে রাস্তা পার হবেন আর হ্যাঁ, পরের বার মার্কেটে গেলে অধমের কথা মনে করতে ভুলবেন না কিন্তু!

সূচীপত্র

বসন্ত

দোলযাত্রা'র পুণ্য প্রভাত। সক্কাল সক্কাল দাঁতটাত মেজে, অতি সুপ্রসন্ন মেজাজে বাহুবলী স্টাইলে আরাম করে সোফায় বসে প্রাতরাশের অপেক্ষা করছি, এমন সময় মনে হলো আইলা, আজ হোলি না?

ভাবতেই নোলাটা কেমন স্যাক স্যাক করে উঠলো বুঝলেন? হায়, আজও কী দরিদ্র কায়স্থসন্তানের কপালে সেই রুটি আর ঢেঁড়সসেদ্ধ? আজও কি ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হবেন না? আজও কি গরীবের পেট মুক্তকন্ঠে বলে উঠবে না, "হামে চাহিয়ে আজাদি, ঢেঁড়সসেদ্ধসে আজাদি...?" দেশ জাতি সমাজ সবই কি আজ অত্যাচারী শাসকের কবলে? হায় বন্ধু, মানবতা আজ কোথায়? কোথায় সেই বসন্তের বজ্রনির্ঘোষসম "অচ্ছে দিন?" নিপীড়িত শোষিত নিষ্পেষিত অত্যাচারিত ভুখা পেট কি আজকে বিপ্লবের ধ্বজা তুলে ধরে গেয়ে উঠবে না, টু আর্মস সিত্রোঁয়ে..

এইসব ভেবেটেবে মনটা ভারী নরম হয়ে এসেছে, আরেকটু পর কেঁদে ফেলবো ফেলবো অবস্থা, এমন সময় মনে হলো একবার চান্স নিয়ে দেখি নাকি? বলা যায় না, ঈশ্বরবাবু যদি আজ তেনার বার্থডে উপলক্ষ্যে ইস্পেসাল কিছু অ্যারেঞ্জ করে রাখেন? মানে বেড়ালের ভাগ্যে কশ্চিৎ কদাচিৎ এমন সৌভাগ্যের উদয় হয় বটে। তবে আমি এমনিতে ঘরপোড়া গরু কি না, তাই এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে একটা রাজসিক হাঁক পাড়লাম, 'কই হে, আমার ব্রেকফাস্ট কই? দেখো, লুচিগুলো যেন ফুলকো ফুলকো হয়, আর আলুরদমটা মাখোমাখো। আশা করি জানো যে আমাদের বাড়িতে গাওয়া ঘি ছাড়া লুচি ভাজা হয় না। মোহনভোগটা একবাটিই দিও। আর হ্যাঁ, নলেনগুড়ের "আবার খাবো" টা ভুলো না যেন।'

বলেই চট করে চোখটা বন্ধ করে ফেললুম।

ছোটবেলা থেকেই আমার এই এক স্বভাব। বিপদ আসন্ন দেখলেই চোখটা বুজে ফেলি। মানে যা হয় হোক, আমাকে তোর আর দেখতে হচ্ছে না!

কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে ঈশ্বর বললেন 'ওহে খোকা, আজ হাম তোমার উপর সুপ্রসন্ন হ্যায়। কেয়া মাংতা হ্যায় চট করে বলে ফেল দিকিনি। আজ আমার আবার একটু তাড়া আছে।'

দৈববাণীর মতই রান্নাঘর থেকে সুমধুর কণ্ঠ ভেসে এলো, 'শুধু গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি খাবে গো? তার সঙ্গে একটু কমলালেবুর পায়েস আর রাবড়ি দিই? নাকি লুচির বদলে ঘিয়ে ভাজা পরোটাই করে দেবো? আর কালকে ওপরের মাসিমা বর্ধমানের সীতাভোগ দিয়ে গেছেন, খাবে নাকি?'

আমি তো মাইরি, ভালো বাংলায় যাকে বলে, টোটাল স্তম্ভিত ! নিজের গায়ে জোরসে চিমটি কেটে নিজেই লাফিয়ে উঠলাম। এ কি সত্য? নাকি স্বপ্ন?

জিভের জলটা সুরুৎ করে টেনে নিয়ে বললাম, 'ইয়ে, আর দুপুরে কী হয়েছে আজ?'

রান্নাঘর থেকে সুরলহরী ভেসে এলো, 'দুপুরে? মাখো মাখো ছানার ডালনা দিয়ে রাধাবল্লভী, তারপর দেরাদুন রাইসের সঙ্গে তেলতেলে গোটা কপি দিচ্ছি। চিতল মাছের পেটি আছে বেশ তেলঝাল দিয়ে। ও হো, তেলকইয়ের কথাটা বোধহয় বলিনি, না? তা সেই তেলকইয়ের পর কষা কষা মাটন রোগনজোশ আর আউধের পোলাও , শেষপাতে মোল্লারচকের লালদই, সূর্য মোদকের জলভরা তালশাঁস আর নলেন গুড়ের আইসক্রিম। আর হ্যাঁ, এর সঙ্গে জয়নগরের মোয়াও রাখবো কি?'

বলা বাহুল্য, এরপর কেঁদে না ফেললে কান্নাকাটি ব্যাপারটা থাকার কোনও মানেই হয় না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ধরা গলায় বললাম, 'আর রাতে?'

'রাতে তো মোর্গমসল্লম আর আরসালানের স্পেশাল বিরিয়ানির অর্ডার দিয়েছি। তারপর ফিরনি। আর শেষে রসমাধুরী, মালাই চমচম আর নাহুমের প্লাম কেক। এতে তোমার হয়ে যাবে না সোনা?'

চশমা খুলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের জলটা মুছে নিলাম। আহা, আজ আকাশটা কী সুন্দর, বাতাসে কী সুমধুর ইয়ে, মধুবাতা ঋতায়তে, মধুঃক্ষরন্তি সিন্ধবাঃ..

'আর শোনো না, অলিপাব থেকে তোমার প্রিয় ওই চিকেন আ লা কিয়েভ না কি একটা আছে না? ভাজা চিকেনের মধ্যে মাখনের পুর দিয়ে? ওইটা অর্ডার করলে বাড়িতে দিয়ে যাবে না গো?'

এবার ফেঁৎ ফেঁৎ করে নাকটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়েই কেমন একটা কুটিল সন্দেহ হতে লাগলো, বুঝলেন। একই দিনে এত ভাগ্যোদয়, মানে এ যে সৌভাগ্যের ষাঁড়াষাঁড়ি বান ডেকেছে রে ভাই! বলি কপালটা একটু রয়েসয়ে খুললে হতো না? এই রেটে খুললে তো শেষমেষ কপাল হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে দেখছি। সেটাই কি খুব ভালো দেখাবে, অ্যাঁ?

সন্তর্পণে প্রশ্ন ভাসিয়ে দিলাম, 'হ্যাঁ গো, ইয়ার্কি করছো না তো?'

ওধার একটা ছোট সাইজের পরমাণু বোমা উড়ে এসে কানের কাছে ফেটে পড়লো, 'ইয়ার্কিটা কে শুরু করেছে শুনি? যার কোলেস্টেরল দুশো আশি, ট্রাইগ্লিসারাইড চারশোর ওপর, ব্লাড প্রেশার একশো পঞ্চাশ বাই একশোয় চড়ে বসে আছে সে কোন আক্কেলে লুচির কথা বলে শুনি? আর মিষ্টি? তোমার লজ্জা করে না মিষ্টির কথা বলতে? ডাক্তার পইপই করে বলে দিয়েছে তোমার মিষ্টি খাওয়া বারণ, তা সত্ত্বেও কোন আক্কেলে তুমি কাল পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিতাই সুইটস থেকে দুটো সন্দেশ খেলে?'

ব্যাঘ্রগর্জনে চিঁ চিঁ করে বল্লুম, 'কই, খাই নি তো।'

'খাও নি? বটে? ফের মিথ্যে কথা? হ্যাংলা বাঙাল কোথাকার। আমার ন'' কাকু নিজের চোখে দেখেছে তোমাকে সন্দেশ খেতে। বলো তুমি খাওনি?'

সোফার কোণে সেঁধিয়ে গেলুম একেবারে। এবার থেকে দেখছি ন'' কাকু, সেজো পিসে, সিধু জ্যাঠা এইসব দেখেশুনে...

ঠকাস করে একটা প্লেট উড়ে এসে পড়লো সামনে, কড়া করে সেঁকা দুটো পাঁউরুটি, সঙ্গে দুকুচি শশা আর গাজর!

'সেদিন যে ব্লাড টেস্ট করালে, তার রিপোর্টটা আনা হবে কবে শুনি?'

আমি উদাসমুখে পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে আকাশের কাক গুণতে থাকি।

'কথা কানে যাচ্ছে না?'

'ইয়ে, আজকে ওদের আপিস বন্ধ, হোলিতে ওদের ছুটি থাকে কি না।'

'ফের বাজে কথা?' চোখ পাকিয়ে বললেন তিনি, 'ওরাই ফোন করে বলেছিলো না হোলির দিন রিপোর্ট নিয়ে আসতে?'

'অ্যাঁ? ইয়ে, আজ কার্তিকী অমাবস্যা না অলাবু ত্রয়োদশী, কি একটা আছে না? আজ পাঁজিপুঁথি মতে ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট আনা নিষিদ্ধ যে?'

'দেখো, একদম কথা ঘোরাবে না। যাও গিয়ে রিপোর্ট নিয়ে এসো। আর শোনো, এই হলো বাজারের ফর্দ। দু কিলো আলু, এককিলো পেঁয়াজ, পাঁচশো শশা...' এই বলে একটা লম্বা ফর্দ আমাকে ধরিয়ে দেন তিনি। শেষে বলেন, 'আর হ্যাঁ, নিতাই সুইটস থেকে আড়াইশো পনীর আনবে। আর যদি শুনেছি চুরি করে মিষ্টি খেয়েছো..।'

হাঁ হাঁ করে উঠতেই হয়, 'আহা চুরি করে খাবো কেন? ছিঃ, আমাকে তুমি এই ভাবলে? জানো আমি কোন বাড়ির ছেলে? আমি চুরি করে মিষ্টি খাবো? কভি নেহি, আমি পয়সা দিয়েই মিষ্টি খাবো। ভদ্রলোকের এক কথা।'

'না আ আ' ঘরের মধ্যে বজ্রপাতের কড়ক্কড় শব্দ, 'তুমি মিষ্টি খাবে না। বুঝেছো?'

বুঝতেই হয়। বোঝা ছাড়া এই অসার জীবনে আর কীই বা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি বলুন তো?

তা টুকটুক করে বাজারপত্তর সেরে নিতাই সুইটসে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। শোকেস জুড়ে থরেথরে মিষ্টির ভাঁড়ার। আমাকে দেখে তাদের সে কি হাঁকাহাঁকি, 'আমি নলেন গুড়ের কালাকাঁদ বলছি স্যার, একটু দেখবেন,' 'ওহে খুড়ো, বলি কাল ছিলে কই? এই সবে ভিয়েন থেকে এয়েচি। এট্টুসখানি হবে নাকি?', 'আরে দাদা যে, হেঁ হেঁ হেঁ, খবরটবর সব ভালো? তা আজ দেখছি আমার এই শ্রীঅঙ্গে এরা আবার একপরত আমসত্ত্ব দিয়েছে। চেখে দেখবেন নাকি একবার?' রসকদমগুলো তো কেঁদেই ফেললো, 'কী অপরাধ করেছি কত্তা, যে আপনার শ্রীপাকস্থলীতে ঠাঁই দেওয়া থেকে আমাদের এভাবে বঞ্চিত করছেন?' ওদিকে সরভাজার প্লেট থেকে যেটা ভেসে এলো সেটাকে আপনারা খোশবাই বলে ভুল করতে পারেন, আমার তো স্পষ্ট মনে হলো বিরহী যক্ষের দীর্ঘশ্বাস!

তবে শাস্ত্রে বলেছে পিঠে খেলে কোনওমতেই পেটে সয় না। ফলে শকুন্তলাত্যাগে উদ্যত নিঠুর নিদয় দুষ্মন্তের মতো গম্ভীর গলায় দোকানীকে বললুম, ''আড়াইশো পনীর দে খোকা।''

বলে খোকার দিকে তাকিয়ে আমি থ!

খোকা দেখি আকাশের দিকে, থুড়ি রাস্তার মোড়ের দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছে আর মোবাইলে কী যেন খুটুর খুটুর করছে। এই যে জলজ্যান্ত একশো কিলো ওজনেরর একটি গন্ধমাদন পর্বত তেনার সামনে দাঁড়িয়ে, ''ওহে খোকা পনিরং দেহি মে'' করে চিল্লে যাচ্ছে তার প্রতি কোনও ইয়েই নেই?

ব্যাপার কি? একে আমি নয় নয় করে নয় বচ্ছর ধরে চিনি। অতীব ভদ্রসভ্য ছেলে। আমার সঙ্গে একবার স্কচ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার পর গভীর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে একটি অসামান্য উক্তি করেছিল, 'দাদার বডিতে এডুকেশন আছে।' সেই থেকে ছোঁড়াকে আমি বিশেষ স্নেহই করি। সে আজ আমার দিকে এমন লোষ্ট্রবৎ অবজ্ঞানিক্ষেপ করে কেন?

তার ওপর চোখফোখ দেখে বুঝলুম, হুঁ, কেস প্রায় স্যুটকেস! অমন ফ্যালফ্যালে চোখ সচরাচর মুক্তপুরুষটুরুষদের হয়। এ ছোকরার তো সেদিকে মতি আছে বলে খবর পাইনি! তবে?

বেশীক্ষণ অবশ্য এর উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হলো না। ছোকরার আকুলনয়ান অনুসরণ করে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি স্টেট ব্যাঙ্কের মোড় থেকে খর্বনাসা, পীতাঙ্গী এবং সামান্য পৃথুলা এক সুন্দরীশ্রেষ্ঠা এদিকেই গজেন্দ্রাণীগমনে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে আমি একবার খোকার দিকে আড়নয়নে চেয়ে নিলাম। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী তার দিকে দিব্যভঙ্গিমায় হেঁটে আসছেন, এক হাতে বরমাল্য, অন্য হাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্যাশবাক্সের চাবি!

ধীরে, অতি ধীরে সে মদালসনেত্রা বিপণিসমীপে উপস্থিত হলেন। তারপর এক দিলতোড় কটাক্ষবাণ হেনে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপ ক্যায়সে হ্যাঁয় বাবলুজী?''

এতদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইতো পরাণ গেলে! ধীরেধীরে বাবলুকুমারেরর সর্বাঙ্গে স্বেদ কম্প আদি পূর্বরাগের সমস্ত লক্ষ্মণ ফুটে উঠতে লাগলো। চোখে সেই ভুবনমোহন হাসি, যে হাসি একদা উত্তমকুমার হাসতেন বলে অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। বিগলিত করুণা, জাহ্নবী যমুনা ভঙ্গীতে শ্রীবাবলু তাঁর স্বরে পোয়াটাক মধু এবং কয়েক পেগ ভালোবাসা মিশিয়ে বললেন, 'ম্যায় অ্যাকদম ঠিক হ্যাঁয় সঙ্গীতাজী, আপনি ক্যামন হ্যায়?'

সেই সুলোচনা, সুকেশী, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মহিলাটি মাধুরীসমহিল্লোলে বডি কাঁপিয়ে বলে উঠলেন, 'আপ তো খবর হি নেহি লেতে হোঁ। আব পুছনে সে কেয়া ফায়দা? ম্যায় আপসে বাত নেহি করতি, যাও।'

'হেঁ হেঁ হেঁ, ক্যায়সে খবর নিই? আপনে তো পিছলি বার আপকা নাম্বার নেহি দিয়া। ইনবক্সে কত বাত করেগা?'

'চল, ঝুটা কহিঁকা।'

বুকটা কেমন হু হু করে উঠলো, জানেন? আহা রে, তোর সঙ্গে দেখা হইতো যদি সখী, লত্তুন যৈবনেরই কালে... তাহলে কি আর গাজরসেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতে হতো এখন?

আমার সে চিন্তার মাঝেই সেই বরবর্ণিনী বলে উঠলেন, 'ইয়ে কেয়া আপকা দুকান হ্যাঁয়?'

দুকান এঁটো করা হাসি উড়ে এলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম আপনা দুকান হ্যায়।'

'মতলব আপ হালওয়াই হো? হি হি হি...'

সেই ইয়র্কারের সামনে আমাদের বাবলুকুমার পুরো এলবিডাব্লুকুমার হওয়ার মতো মুখ করে বসে রইলেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে করুণ সুরে সানাই বাজতে লাগলো, ''কানু কহে রাই , কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই মুই..''

ভদ্রমহিলার বোধহয় সে ভ্যাবলাকান্তকে দেখে কিঞ্চিৎ করুণা হলো, দয়ার্দচিত্তে তিনি বললেন ''ধান্দা করনা আচ্ছা হ্যায়। আপ বেঙ্গলি লোগ তো সির্ফ নোওকরি করতে হো।''

আমি গম্ভীরমুখে এই সাম্প্রদায়িক কুমন্তব্যের বিরুদ্ধে একখানা আড়াই পাতা ডায়লগ নামাতে যাবো, এমন সময় শ্রীবাবলু তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, 'মোট্টে না। এই তো হাম ক্যামন বিজনেস কর রাহা হ্যায়। ইধর আপনা মিঠাই খুব ফেমাস হ্যায়। স্বাদুষ্ট ওউর তন্দুরুস্ত।'

স্বাদুষ্ট বলে কোনও শব্দ হয় কি না, এ নিয়ে একটা কুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে পাকিয়ে উঠতে থাকে। আর মিঠাই তন্দুরুস্ত কী করে হয় সেটাও বুঝে উঠতে পারি না।

এদিকে শ্রীমতী তখন হেসে কুল পাচ্ছেন না। উচ্ছ্বল ঝর্ণার মতো সে হাসি কালিন্দীর ফুটপাথে লুটিয়ে পড়লো। 'তন্দুরুস্ত তো হ্যাঁয়, লেকিন মিঠাই নেহি, হলওয়াই।'

বাবলুকুমারকে দেখে মনে হলো জীবনে এই প্রথম নিজের বরতনুটি নিয়ে সামান্য লজ্জিত হলেন। ব্রীড়ানত মুখে বললেন, 'ম্যায় মোটা নেহি হুঁ, সামান্য হেলদি হুঁ, এই যা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আজি হতে শতবর্ষ আগে এরকমই এক শনিবারের বারবেলায়, নন্দন চত্বরে ঝোপের আড়ালে বসে, এমনই এক সামান্য স্থূলাঙ্গী মহিলাকে নেহাত আদর করেই 'মুটকি সোনু' বলে ডাকার পর ঝাড়া আধঘন্টা ধরে অনেক নতুন নতুন জন্তু জানোয়ারের নাম জানতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে আরও দুটো নতুন ইংরেজি শব্দ শিখেছিলাম, বডি শেমিং আর মিসোজিনি!

'আপ জিম উম মে জয়েন কিঁউ নেই করতে?' মহিলাটি এবার শোকেসের ওপর আরও ঘন হয়ে আসেন, 'লেকটাউনমে মেরে চাচা কা বেটা এক নয়া জিম খোলা হ্যাঁয়। একদম টপ টু বটম আপটুডেট, চকাচ্চক। বোলো তো বাত করওয়া দেতা হুঁ। ডিসকাউন্ট ভি দিলা দুঙ্গি।'

স্তম্ভিত হয়ে মহিলার দিকে চোখ গোলগোল করে তাকিয়ে রইলুম, কী ডেঞ্জারাস জিনিস রে ভাই! ডেট করতে এসে ভাইয়াকে কাস্টমার ভেট দেওয়ার ফিকির করছে?

তবে আমার আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি ছিলো। মহিলা আরও বলতে লাগলেন, 'লেকিন সির্ফ জিম করনে সে নেহি হোগা। আপকো ডায়েটিং ওগ্যারাহ ভি করনা পড়েগা। অয়েলি ফুড ইনটেক ইজ দ্য মেইন রিজন ফর অবেসিটি।'

এইবার আর চুপ থাকা গেলো না, গলা খাঁকড়ে বলতে বাধ্য হলুম, 'কথাটা কিন্তু উনি খারাপ বলেননি বাবলু, স্পেশ্যালি ওই ওবেসিটির ব্যাপারটা। কথাটা উনি যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছেন তখন এ বিষয়ে....'

বলেই থমকে যাই। মানে থমকাতে বাধ্য হই বললেই চলে!

বাপ রে! সে কী অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি, সে কী ভয়াল কুটিল চাউনি! মনে হচ্ছে আমাকে জ্যান্ত রোস্ট করা হবে নাকি কুচিয়ে ভর্তা করা হবে সে নিয়েই ভদ্রমহিলা সামান্য দ্বিধায় রয়েছেন। নইলে নরকের যে আঁচে আমার ইন্তেকাম হওয়া উচিত, সেখান থেকে একটা জ্বলন্ত নুড়ো এনে এক্ষুনি আমার মুখে গুঁজে দিলে ব্যাপারটা

বেশ খোলতাই হতো বলে ওঁর ধারণা। একটু আগেই যাকে হেলেন অফ ট্রয় মনে হচ্ছিলো, এখন তাকে গডেস অফ ভয় বলেই বেশী ঠাহর হতে থাকে।

এতক্ষণে বাবলুকুমারের টনক নড়ে। দু'মিনিটে ফটাফট দেড়শো গ্রাম পনীর ওজন করে, আমার হাতে প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে, পেমেন্ট নিয়ে চাপা, খুনী স্বরে দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, 'দাদা, ফুটুন।'

আমিও ফুল হয়ে ফুটে যাই। এপ্রিল ফুল হয়ে, এই ঘোর বসন্তেই। প্রেম যে এত হিংস্র আর অসহিষ্ণুহতে পারে তা এদের না দেখলে জানতেই পারতুম না! হায়, এ মৃত্যুউপত্যকা আমার দেশ না...

এই ভাবতে ভাবতে কাউন্টার ছেড়ে চলে আসছি, এমন সময় সেই বাবলুকুমারীর শেষের কথা গুলো শুনে পা'দুটো ভারখয়ানস্কের তুষারাবৃত উপত্যকার বুকে নাছোড় আইস অ্যাক্সের মতই আটকে গেলো।

স্বকর্ণে শুনলাম সেই মোহিনী আমাদের নধরকান্তি নদের নিমাইকে স্বাস্থ্যসম্বন্ধিত সৎপরামর্শ দিচ্ছেন, 'ব্রেকফাস্টমে ইয়ে সব পুরি সবজি, মিঠাই ওগ্যারাহ খানা বন্ধ করনা পড়েগা বাবলুজী। মতলব আগর আপ ইয়ে রিলেশন কে বারে মে সিরিয়াস হ্যায় তো।'

কোন সে দিগন্তের ওপার থেকে আমাদের ভোলাভালা ছেলেটার বিস্মৃতপ্রায় আবছা স্বর ভেসে এলো, 'হাঁ হাঁ সঙ্গীতাজী। বোলিয়ে না, কেয়া কেয়া করনা পড়েগা। আপকো তো মালুম হ্যায়..'

'মর্ণিং মে সির্ফ টু স্লাইস ব্রেড, উইদাউট বাটার। উসকে সাথ থোড়াসা কিউকাম্বার অ্যান্ড ক্যারট মিক্স...'

কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে, কেউ নিজের পা''টা কুড়ুলের ওপর মারে। ফলাফল একই।

আড়াইশো পনীর আর গাদাগুচ্ছের স্বাস্থ্যসম্মত সবজি সমেত বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুনি বাড়ির সামনে কোন বেরসিক হতভাগা মাইকে রোবিন্দসংগীত চালিয়েছে, 'আহা আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফুটে, এত বাঁশি বাজে..এত পাখি গায়...'

বসন্ত, মাই ফুট!

মার্কেট ভিজিট ১

সক্কাল সক্কাল প্রভাদেভিতে ওলা ক্যাব থেকে নামতেই দাঁত কেলিয়ে যে ছোকরা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো, তার নাম হাশিম মির্জা, দাদর এলাকার সেলস অফিসার। পরণে কুর্তা পাজামা, পাজামা গোড়ালির ওপর ইঞ্চিখানেক ওঠানো, তৎসহ থুতনিতে দিব্বি কচি একটি দাড়ি এবং নিখুঁত ভাবে কামানো গোঁফ। বেশ একটা অহিংস ছাগল ছাগল ভাব। বিগলিত গ্যালগ্যালে হাসি নিয়ে 'আইয়ে স্যার, ওয়েলকাম টু মাই টেরিটোরি' বলে সে কি অভ্যর্থনার ঘনঘটা!

একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিলাম। নাহ, এখান থেকে বেরিয়েই শিন্ডেকে ধমকাতে হবে। এ কি ধরনের মার্কেট ভিজিটের পোষাক আশাক হে বাপু? বলি প্রপার ডেকোরাম বলে বস্তুটি কি গাধার ইয়েতে দিয়েচ? মুম্বাইএর এরিয়া সেলস ম্যানেজার শিন্ডে অবশ্য বলেছিলো এই নাকি আপাতত মুম্বাই টিমের সেরা সেলস অফিসার। হবেও বা,তা বলে তো আর 'সিল্লি মানুস, হতিই পারে' বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না রে ভাই!!

যাগগে। চল মার্কেটে। হালগতিক দেখি। তাপ্পর তোর খপর নেবো।

টুকটুক করে খান দশেক দোকান করেও ফেললুম। হুঁ, খারাপ নয়। প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট আছে ভালোই। স্টক অ্যাভেইলেবল, রেঞ্জও আছে ঠিকঠাক, এবং ভিজিবিলিটিও চমৎকার।

মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এদ্দুর এলুম, একটু চেঁচামেচি, আগাপাশতলা ঝাড়, ভারী গলায় সদুপদেশ এসব না করলে খরচায় পোষাবে ক্যানে? দিনটা কি বৃথা যাবে?

একটু পর খেয়াল হল তেষ্টা পাচ্ছে। বিয়ার ঘেঁষা তেষ্টা। নেহাৎ ওয়ার্কিং আওয়ার্সে আছি তাই, নইলে রাস্তার উল্টোদিকেই একটা বার আগে থেকেই নজরে ছিল। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখি হাশিমবাবুর ব্যাকপ্যাকে একটা জলের বোতল গোঁজা। বল্লুম 'জলটা দে'। সে বাবু খানিকক্ষণ ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে তাপ্পর ভারি কুণ্ঠিত স্বরে বলল 'ইয়ে, স্যার, জলটা বাড়ি থেকে এনিচি'। বল্লুম সে তো দেখতেই পাচ্চি। তা বাড়ির জল খাওয়াতে কি পয়সা নিবি নাকি? নাকি জল খাওয়াতেও রেশন কার্ড লাগবে?

সে একগাল হেসে বলল, কি যে বলেন স্যার। নিন।

এরপর আরও খান দশেক দোকান। এরপর বিরক্ত লাগতে শুরু করলো। কোথাও কিছু বলার নেই। জেনারেলি গিন্নির সঙ্গে ঝগড়া হলেই পরদিন টুক করে একটা মার্কেট ভিজিট করে নিই। সেলস অফিসার আর সেলসম্যানদের ওপর খুব খানিকটা চোটপাট করে, চাকরি চলে যাবার ভয় দেখিয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেগুলোর গালে ঠোনা মেরে, শরীর মন চনমনে করে তুলে বাড়ি ফিরে আসি।এ হারামজাদা দেখছি সে গুড়ে কিলোখানেক বালি ঢেলে রেখেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। নাহ, মার্কেট এত ঠিকঠাক থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।

এরপর একটা রাস্তা পেরিয়ে, পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে ছোটখাট একটা দোতলা বাড়ির সামনে এনে ছোকরা আবার সেই গা জ্বালানি গ্যালগ্যালে হাসিটা হেসে বলল, যান স্যার, ব্যাপারটা সেরে আসুন।

আমার তো ভাই পায়নি। কি সেরে আসবো?

সে তো ঘাড়ফাড় নাড়িয়ে ''ন্যা ন্যা কি বলচেন স্যার'' বলে জিভটিভ কেটে অস্থির।

তার মাথা নাড়ানো থামলে বল্লুম, তবে?

আরে স্যার ভালো করে তাকিয়ে দেকুন। সিদ্ধিবিনায়ক টেম্পুল। সারা দুনিয়া থেকে রেগুলার কুটি কুটি লোক আসে পেন্নাম ঠুকতে। হেব্বি জাগ্রত ঠাকুর স্যার। আর আপনি এতো কাচে এসেও স্লাইট পুণ্যি নিয়ে

যাবেন নি, সেটি হয় নিকি কত্তা? হেঁ হেঁ। লোক পাটিয়েচি ডালা কিনে আনতে, এখন ওই কলের জলে একটু ওজু করে নিন দিকিন।

বিরক্ত হয়ে বল্লুম, দ্যাখো বাপু, আমার ওসবে বিশ্বেস টিশ্বেস নেই। মেলা কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান কোরো না। আর কাছেপিঠে কোথায় ভালো নন ভেজ রেস্তরাঁ আছে, নিয়ে চল। খুব হিংস্র টাইপের খিদে পেয়েছে।

সে বাবু তো চোখফোখ কপালে তুলে দিল।

বলেন কি স্যার? হেঁদুর ছেলে হয়ে এসব কি অনাছিষ্টি কতা? বলি ধম্মোজ্ঞান কি এক্কেরে থাকতে নেই? বউছেলেমেয়ে নিয়ে সোমসার করেন, বলি ভক্তি না হলেও, ভয় বলে তো একটি বস্তু আচে মশাই। অন্তত তাদের ভালোমন্দটাতো দেকতে হয়। চাচাচাচির কতাটা না হয় ছেড়েই দিলুম।

ছোকরার মুখে হঠাৎ খই ফুটতে দেখে পাক্কা আড়াই মিনিট হাঁ করে রইলুম।

তার পর মনে পড়লো, আমরা তো এইরকমই ছিলুম। মাজারে-মন্দিরে, সিন্নি-ফিরনিতে, শাঁখে-আযানে, ঝগড়া-কোলাকুলিতে, হাসি-কান্না- লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ে-আনন্দে জড়াজড়ি জাপটাজাপটি করে তো খুব খারাপ ছিলুম না। দার-উল-হার্ব আর হিন্দুরাষ্ট্র কে শেখালে আমাদের? কাফের মারলেই বাহাত্তর হুরের লোভ কারা দেখালো? মোছলমান দেকলেই পাকিস্তানে পাঠানোর কতাটা কে আমাদের কানে তুলল বলুন দিকিন? দাদরির মাংস আর কালিয়াচকের কালিয়া কে খাওয়াচ্ছে আমাদের?

সত্যি করে বলুন তো, কে শেকালো এসব আমাদের? কে?

প্যারিসে নিশিবাসরে

দোকানটাকে দেখে আমি বা আনন্দ ঠাকুর, আমরা কেউই প্রথমে কিছু বুঝিনি। এমনিতেই ভোরের আঁধার, তার ওপর তখনো খোঁয়াড়ি কাটার কোন লক্ষণই নেই। শুধু নেশাতুর চোখে দেখলুম দরজার ওপরে কোকা কোলার সাইনবোর্ড, ভাবলুম নিশ্চয়ই কোন সালঁ হবে,আর কিছু হোক না হোক, নিদেনপক্ষে কফি তো পাওয়া যাবেই। ফলে ঢুকে পড়তে দুবারের বেশি ভাবিনি।

তখনো পকেটে কিছু ইউরো রয়ে গেছিলো, জিগরে কিছু হিম্মতও বটে। নইলে প্যারিস এসেই, শুধু হোটেল অ্যাড্রেস আর টিউবের ম্যাপ হাতে কেউ রাত বারোটার সময় 'নাইটলাইফ' দেখতে বেরোয় না।

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

২০১০ সালের এপ্রিল মাস। কম্পানির কনফারেন্সের নামে আট দিনের স্যুইজারল্যাণ্ড কাম প্যারিস ভ্রমণে এসে দিল তখন পরিপূর্ণ রূপে গার্ডেন গার্ডেন। চারদিনের স্যুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষে জুরিখ থেকে বাসে করে প্যারিস আসছি আল্পসের পাশ দিয়ে। প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ রূপ দেখে শুধু আমি কেন, বাহান্ন জনের পুরো টিম মোহিত। আমার অবিশ্যি ধান্দা অন্য ছিল, আসার সময়েই আমি আর আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বিহারনন্দন আনন্দ ঠাকুর, দুজনে মিলে ঠিক করেছিলাম স্যেন নদীতে ক্রুজ দেখে বাকিদের সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো হোটেলে ঢুকবো বটে। কিন্তু একটু "ফ্রেশ টেশ" হয়েই দুজনে প্যারিসের বিখ্যাত নাইটলাইফ চাক্ষুষ করতে না বেরোলেই নয়। অ্যাদ্দুর এলুম, প্যারিসের বিখ্যাত নিশিবাসরের মৌতাত একটু মেখে না গেলে দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধবদের মুখ দেখাবো কি করে, অ্যাঁ? নতুন দেশে হারিয়ে যাওয়ার ভয়? আরে মহাই, সেলসের লোক প্রায় বিড়ালের মতই, যত দূরেই ফেলে আসুন না কেন, মান্থ এন্ডের আগে ঠিক রাস্তা চিনে ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্টে পৌঁছে যায়। আমরাও একটু গভীর রাত হলেও হোটেলে ঠিক পৌঁছে যাবই।

প্রথম বাওয়াল হলো "ফ্রেশ" হবার পর। কর্মসমাপান্তে দেখি জলটলের কোন ব্যাবস্থাই নেই যে! জুরিখে তাও হ্যাণ্ড শাওয়ার বলে একটা বস্তু ছিল। এখানে যে সবই নিকষ্যি শুকনো কাজকারবার!

যাই হোক, বাঙালের ব্রেইন, টক করে নজরে এলো যে বেসিনের ওপর দুটো গ্লাস রাখা আছে। অতঃপর..

তা আমি বেরিয়ে আসার পর সেই মহাপুরুষটি সৎকর্মসমাপনমানসে ভেতরে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে সেই বিহারানন্দের তত-আনন্দিত-নয় মার্কা আর্তনাদ 'দাদা, ধোঁয়ু ক্যাইসে?'

সেই "ধোঁয়ু" পিপাসীকে সৎকর্মের সহিহ রাস্তা বাতলাতে তিনি কর্মসমাপান্তে বাইরে এসে জ্ঞানসমৃদ্ধ সুচিন্তিত মতামতটি ব্যক্ত করলেন, 'সালেঁ গন্দে লোগ, কাগজ সে ধোতে হ্যায়'।

সে যাক, তখন রাত এগারোটা বাজে সবে, আমাদের নৈশঅভিসারের প্রথম রজনী। তা সেই রজনীতে পুরো রজনীকান্ত সেজে, জলটল খেয়ে বেরোব, এমন সময় তন্নতন্ন করে সারা রুম খুঁজে দেখি, যাঃ, খাবার জল নেই যে!

তৎক্ষণাৎ রিসেপশনে ফোনালুম জলের খোঁজে। ওপার থেকে ফরাসী রিসেপশনিষ্ট সুললিত ইংরেজিতে জবাব দিলেন যে আলাদা করে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। সুসভ্য ফরাসীজাতি বেসিনের নল থেকেই পেয় জল সংগ্রহ করে থাকে।

অ। তা বুঝলুম। তা সংগ্রহটা করে কিসে? ড্যাকরা মিনসেগুলো তো জলের জাগ অবধি দিয়ে যায় নি।

উত্তর এলো, কেন? টয়লেটে বেসিনের ওপর দু'দুটো জলের গ্লাস আছে যে!

শুনেই তো আমরা স্তম্ভিত! সেই গ্লাস দুটোই, অ্যাঁ? তা সেটা আগে খোলসা করে বলতে কি হয়েছিল অলপ্পেয়ে অনড্বানের দল? প্রাথমিক স্তম্ভিত ভাব কেটে গেলে অতঃপর দুইজনের বিনম্র এবং অস্বস্তিকর চোখ

তাকাতাকি, হ্যাঁ ভাই, তুই কোন গ্লাসটা ইউজ করেছিলিস রে?

ইত্যকার ঝামেলা মিটিয়ে নিচে এসে রিসেপশনের সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে সটান প্রশ্ন, অয়ি বরবর্ণিনী, প্যারিসের নাইটলাইফ, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, স্ট্রিপটিজ দেখতে গেলে কোথায় যেতে হবে আমাদের?

ভদ্রমহিলা বোধহয় আমাদের মতন ইতর লোক হ্যাণ্ডেল করে করে অভ্যস্ত,তাবৎ পারভার্ট ভারতীয়রা এসে নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ নিশিনিলয়ের সন্ধান চায় আগে। প্যারিসের টিউবের একটা ম্যাপ আর হোটেল অ্যাড্রেস সামনে ঝড়াকসে ফেলে দিয়ে বললেন' জায়গাটার নাম পিগাল। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে দুমিনিট হাঁটলেই টিউবস্টেশন। ফিরতে হলে রাত দুটোর আগে ফিরবেন, তারপর টিউব বন্ধ থাকে। নইলে সেই ভোরে, ছ''টার পর'। বুঝলাম, ফরাসীজাতির বানিয়াকরণ ইজ ইন প্রোগ্রেস।

পিগাল স্টেশন থেকে বেরিয়েই, আইসসালা, এই লাল রঙের উইন্ডমিল মার্কা বাড়িটা চেনা চেনা লাগে যে! আনন্দ তার গভীর মননের ফল আমাকে উপহার দিলো, 'দাদা, পার্ক স্ট্রিট মে অ্যায়সা এক বার হ্যায় না? সালোঁনে পুরা কা পুরা কপি উতার দিয়া লাগতা হ্যায়, নেহি?'

বাজে কথায় আমি কোনদিনই কান দিই নি, এবারেও দেওয়ার কোন মানে ছিল না, স্পেশালি চোখের সামনে যখন মহিমান্বিত প্রতাপে বিরাজমান দ্য গ্রেট মুল্যাঁ রুজ!

মুল্যাঁ রুজের সামনেকার দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে রাস্তার ধারে আসতেই, একটার পর একটা স্ট্রিপটিজ বার, রাস্তার দুপাশেই। আলোঝলমলে সুন্দরী প্যারিস তার মোহময়ী রাতের পশরা সাজিয়ে বসেছে। বিশাল বিশাল নিওন সাইন প্রতিটি দোকানের সামনে। পরিষ্কার ঝকঝকে রাস্তা,তার মধ্যে বয়ে চলেছে উদ্দাম জনস্রোত, লাস্যে, হাস্যে, লালিত্যে, বিভঙ্গে,কটাক্ষে, কলকাকলিতে মুখর লা পারি। স্ট্রিপটিজ বারের মাঝে মাঝে মদিরাশালা। সেখানেও উচ্ছল হাসি কলরোলের আনন্দলহরী। আহা, হাসি গান আনন্দে মুখরিত সেই সন্ধ্যাটি ছিল ফরাসী সুরার মতই মদির, ফরাসী তন্বীটির মতই উচ্ছল, ফরাসী তরুণটির মতই প্রাণবন্ত।

প্রতিটি স্ট্রিপটিজ বারের সামনে দালালের দল রীতিমতো হইহই করে বিচিত্র বিভঙ্গে কাস্টমার ডেকে আনার চেষ্টা করছে, শিয়ালদার হোটেলগুলোর সামনে যেভাবে 'ও দাদা এদিকে, ওও বৌদি এখানে' বলে খদ্দের ডাকে, অবিকল সেই তরিকা। দুএকটা হাতছানি এড়িয়ে বেশ বড়ো গোছের একটা স্ট্রিপটিজ বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি কি দাঁড়াইনি, বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক মহিলা দালালটি তেনার শালপ্রাংশু মহাভুজদুটি দিয়ে আমাদের দুইজনের নড়া ধরে নেংটি ইঁদুরের মতই ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে দুটো সীটে ফেলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য দশ দশ কুড়ি ইউরো খামচেই নিয়ে গেলেন। সে কি হাতের পাঞ্জা, মনে মনে মেপে দেখলুম ভদ্রমহোদয়া কোন কারণে রুষ্ট হয়ে যদি আমাকে একটা থাপ্পড় কষান, মোটামুটি ব্রহ্মতালু থেকে থুতনি অবধি ওতে কভার হয়ে যাবে!

এখন আপনি কিসের জন্যে নড়েচড়ে বসলেন স্পষ্ট বুইতে পাচ্চি, হেঁ হেঁ, কিন্তু কত্তা,স্ট্রিপটিজের বর্ণনা দিয়ে আমি কিছুতেই সুকোমলহৃদয় তরলমতি পাঠকপাঠিকাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারবো না, না, না। তাছাড়া অনেক গুরুজনেরাও আছেন,এমনিতেও আমার ছ্যাবলামি দেখে আর ফাজলামিগুলো পড়ে এঁরা আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের ব্যাপারে সাতিশয় উদ্বিগ্ন। এরপর স্ট্রিপটিজের রগরগে বর্ণনা শুনলে সরবিট্রেট, মোহমুদগর, রবীন্দ্রসংগীত, কিছুতেই শানাবে না যে!! শুধু জানিয়ে রাখি কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সেই সুরেন্দ্রবন্দিতাদের বিলোল কটাক্ষমদির লাস্যনৃত্য আজও চোখ বুঝলেই দেখতে পাই। আহা, শুধু শরীর দিয়েও এমন স্বর্গীয় জাদুর দুনিয়া গড়তে শুধু ফরাসীরাই পারে!

তা নাচটাচ দেখে, ঘন্টাদুয়েক বাদে ঠোঁটের কোণে একটা বিস্ময়,প্রশংসা, উত্তেজনা মেশানো হাসি নিয়ে বেরিয়েছি, আনন্দবাবু ঘোষণা করলেন যে ওনার পেটে বিলক্ষণ কিছু পোস্তা স্পেশাল চুহা দৌড়চ্ছে, এবং সামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তি না করে উনি সেখান থেকে নড়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না!

তা কথাটা আমারও দিব্যি মনে ধরলো। ইতিউতি খুঁজেই দেখি একটি ছোট্ট লেবানিজ রেস্তরাঁ। ভেতরে ঢুকে দু'দুখানা চেয়ার দখল করে বসতেই মধ্যবয়সী মালিক ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন, মুখে একটা অমায়িক 'কি খাবেন স্যার' মার্কা হাসি। বলতেই হলো যে আমরা এপাড়ার লোক নই, একটু দেখেশুনে কিছু খাওয়ালেই হলো, শুধু সঙ্গে যেন ভালো হুইস্কি থাকে, আর হ্যাঁ, আমরা বিফ খাই না।

মুখের হাসিটি অমলিন রেখে ভদ্রলোক শুধোলেন, কোন পাড়া? বলতেই হলো ইণ্ডিয়া। ভদ্রলোক স্মিত হেসে জানালেন উনি দেখেই বুঝেছেন ক্যাবলা দুইটি ইণ্ডিয়ান, প্রশ্ন আরো গভীর, ইণ্ডিয়ার কোথায়? আমরা তো মাইরি হেব্বি ইম্প্রেসড। আমি কিছু বলার আগেই আনন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর অনিন্দ্যসুন্দর বিহারি ইংরেজিতে গুছিয়ে জানালো এক মক্কেল বেঙ্গলের, আরেকজন বিহারের, উনি কি চেনেন? না না, মক্কেলদের নয়, জায়গাদুটিকে?

ভদ্রলোকের স্মিত হাসিটি চওড়া হলো, জানেন বৈ কি। জানা গেলো ইনি পাকিস্তানের, বছর ত্রিশেক আগে দেশান্তরী হয়ে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন, আর কোনদিনই ফিরে যান নি। তবুও প্রায়-দেশোয়ালি লোক দেখলেই এখনো দিব্যি আনন্দ পান,সোয়াত উপত্যকার হিমেল হাওয়ার স্রোত এখনো বুকের মধ্যে খেলে যায় নিরন্তর।

জীবনে সুখাদ্য কম খাইনি। কিন্তু সেদিন সেই পাকিস্তানি রেস্তরাঁতে বসে হুইস্কি আর আড্ডা সহযোগে খাওয়া একটি লেবানিজ ডিশ, শোওয়ারমা সেই সুতনুকার নাম, আমার কাছে এখনো সুজাতার পায়েস হয়ে আছে। শুধু কি রান্না? নাকি ফেলে আসা সোয়াত উপত্যকার হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসা কিছু স্মৃতি, প্রায়-দেশোয়ালি ভাইদের জন্যে কিছু ভালোবাসাও মিশে গেছিল তার সঙ্গে?

তা খেয়েদেয়ে ভদ্রলোককে যারপরনাই ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে আসছি, আনন্দ ভারি হাসিমুখে জিগাইলো, স্টেশনে যাচ্ছি কেন? বোকা বোকা প্রশ্ন শুনলে রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, খেঁকিয়ে বল্লুম হোটেলে ফিরবি না? আনন্দের মুখে হাসিটি কিন্তু প্রায় তুরীয়মার্গের, আমাকে মিষ্টি করে শুধলো, আমার হাতে কি ঘড়ি নেই? আমিও ততোধিক মিষ্টি করে ঘড়ির সঙ্গে স্টেশনের কি সম্পর্ক শুধোতে যাবো, এমন সময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি,

সর্বনাশ!!! রাত আড়াইটে!! টিউব বন্ধ। এখন উপায়???

রাস্তাঘাটে ট্যাক্সি চলছিল বটে, কিন্তু আনন্দের নিজের বয়ানে, ও একবার এরকমই এক অভিশপ্ত রাতে সোনাগাছি থেকে মদনাভিসার সমাপ্ত করে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরেছিল সল্ট লেক যাবে বলে। সে ট্যাক্সি তাকে ধর্মতলা হয়ে, রেড রোড ধরে, দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে, সাঁতরাগাছি হয়ে, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে সল্ট লেকে নিয়ে এসেছিল, সাড়ে আটশো টাকা ভাড়া দিয়ে। আনন্দ একটু বোকা বটে, কিন্তু প্যারিসে এসে উল্লু হবার কোন সদিচ্ছেই ওর নেই,তাতে লোকে ওকে কায়ের বা ডরপোক যা খুশি বলুক। আর সাড়ে আটশো ইউরো ট্যাক্সিভাড়া উঠলে কি কি বেচলে সেই টাকাটা জোগাড় হবে সেটা যেন আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি। রাজপুতের ছেলে সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু বিদেশবিভূঁইতে এসে বেকার হ্যাঙ্গামে কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে রাজি নয় ইত্যাদি ইত্যাদি...

অতএব,তিন সাড়ে তিনঘণ্টা ঘন্টা ওখানেই কাটানো ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? তবে ভরসা একটাই পিগালে রাত তখনো, যাকে বলে স্টিল ইয়াং। এদিকওদিক চাইতে চাইতে দেখি,

উরিত্তারা, তিনতলা একটি সেক্স শপ!!

এখন সেক্সহিপোক্রিট দেশের বুভুক্ষু মানুষ আমরা, এসব দেখলে চাপা দেওয়া লিবিডোর তাড়নায় ঢুকতেই হয়, এবং ঢুকে পড়েই হাঁ হয়ে যেতেই হয়। যেসব জিনিস আজ অবধি শুধু বিচিত্র সব পর্নো মুভিতে দেখেছি, সেইসব নিষিদ্ধ বস্তু দেখি থরেথরে সাজানো। শারীরিক আনন্দের জন্যে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি কি পর্যায়ে যেতে পারে ভেবেই মাথাটা শ্রদ্ধায় ও রোমাঞ্চে নত হয়ে এসেছে, চোখে জল আসি আসি, এমন সময় তাকিয়ে দেখি আমাদের ঠাকুর সাহেব যাকে বলে ভেরি ভেরি বিজি! তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে

অভিনিবেশ সহকারে প্রতিটি বস্তু দেখে, ধরে, টিপেটুপে, নাড়িয়ে, শুঁকে একেবারে যাকে বলে রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। একবার তো দুই বিদেশিনীর প্রতি উতলা হয়ে ছুটেই যাচ্ছিলেন, ওনাদের সদ্য কেনা বস্তুগুলির দ্রব্যগুণ ও ব্যবহারবিধি সম্যকরূপে বুঝে নেবেন বলে! সেযাত্রা পাবলিক প্যাদানির ভয় দেখিয়ে সেই বিহারনন্দনকে তার বিপুল জ্ঞানান্বেষণের পথ থেকে টেনে আনতে বাধ্য হই!!

ঘন্টাদুয়েক বাদে বেরিয়ে এদিকওদিক হাঁটতে লাগলুম। তখন রাত অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে, লোক চলাচলও কম। এমন সময় দুটি বারের মাঝে একটা অন্ধকার গলিপথ দেখে ভাবলাম দেখাই যাক কি আছে। টাইম তো হ্যাজ!

ঢুকেই বুঝলাম জায়গাটা খুব সুবিধের নয়। গলিটা শুধু আঁধারই নয়, নোংরাও বটে। আর গলিপথবাসী বা বাসিনীদের রকমসকমও খুব সুবিধের নয়। ছোটখাটো পোষাক পরা, উগ্র মেকআপ করা এই মুখগুলো বোধহয় হাড়কাটা গলি থেকে প্যারিসের রাজপথ, সর্বত্র একইরকম দেখায়। যথারীতি তেনারা নতুন শিকারের খোঁজে এগিয়ে এলেন। আনন্দবাবুর বোধহয় ভূমানন্দের সুখ নিতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার নজর পড়েছে তখন আরেকটু এগিয়ে, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট আগুন ঘিরে বসে কয়েকজন বেশ উদাত্তস্বরে গান ধরেছে।

ছোট আগুনের কুণ্ডলী, ঘিরে বসে কয়েকজন ছেলেমেয়ে। সবার হাতেই ঘুরছে বিয়ারের ক্যান আর সিগারেট। পিছনে একজনকে একটা রাংতা থেকে সাদা সাদা কিছু গুঁড়ো নাকে টেনে নিতেও দেখলাম। শুধু একজনের হাতে ছিল অন্যকিছু, একটা গিটার। সোনালী চুলের রোগাসোগা সেই ছেলেটি গাইছে একটি ফরাসী গান, উত্তাল তার ছন্দ, বলিষ্ঠ তার গায়কী। আশেপাশের সবাই দেখলাম জোরসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর সমে এলেই সমস্বরে চিৎকার করে উঠছে তাল মিলিয়ে, অনেকটা সেই "পেয়ার হামে কিস মোড় পে লে আয়া" র মতন, "ইয়ে দিল করে হায়" এর পরের হায়'টাতে না চেঁচিয়ে এই গান কাউকে উপভোগ করতে দেখিনি। এও প্রায় তার কাছাকাছিই। সবাই নেশায় বুঁদ। আমরাও দুখানা বিয়ার চেয়েচিন্তে নিয়ে বসে গেলাম। আশেপাশের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে ফরাসী বেশ্যাদের দল, আগের কাস্টমারকে ছাড়তে বা পরের কাস্টমারকে নিতে। এসে মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে শুনেও যাচ্ছে দুকলি, কারো কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে সিগারেট, কারো বিয়ারের ক্যানে একঢোঁক চুমুকই দিয়ে গেলো হয়তো। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই দেখলাম দালাল, কাস্টমার বেরিয়ে এলেই টুক করে গিয়ে দালালিটুকু নিয়ে আসছে বাঁধা মেয়েমানুষটির থেকে।

প্যারিসের মধ্যে এ এক অন্য প্যারিস!

খানিকটা ভোর ভোর হয়ে আসার সময় "হরি হরি বলো মুখে মিলি বন্ধুগন, শনির পাঁচালি কথা হোক সমাপন" টাইপের সমবেত জয়ধ্বনি দিয়ে আসর ভাঙলো। আমরাও উল্টোপথে হেঁটে পিগালের বড় রাস্তাটা ধরবো, তার দুইপ্রান্তে দুটি টিউবস্টেশন, এমন সময় মিনিট পাঁচেক হাঁটাহাঁটি করে বুঝলাম, কেলো করেছে, রাস্তা হারালুম কি করে?

ছ'টা প্রায় বাজে প্রায়। সকাল সাড়ে দশটা থেকে কনফারেন্স শুরু। আসার সময় আধঘণ্টার বেশি লাগেনি, যেতেও তাইই লাগবে, কিন্তু রাস্তাটা তো পেতে হবে!!

এমন সময় সেই দোকানটা চোখে পড়লো, যেটা দেখে আমি বা আনন্দ ঠাকুর, আমরা কেউই প্রথমে কিছু বুঝিনি।

কোকাকোলার সাইনবোর্ডের নিচেই এন্ট্রান্স ছিল দোকানটার, দরজাও ছিল খোলা। দেখে বিস্মিতই হলাম, এত সকালে ফরাসীরা দোকান খুলে রেখেছে? শুনেছিলাম তো এরা কুঁড়ের জাত, বাঙালিদের মতই। যাগগে,বিশ্বায়নের বাবাজি যদি সব জায়গায় ঠেল্লু দেখাতে থাকেন, ফ্রান্সই দোষ করলো কিসে? ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের ভাবনাচিন্তা করে ঢুকে দেখি, বাহ, এতো ব্যুটিক সালোঁ হে!! চমৎকার সাজানো ইন্টিরিয়র। ব্যবস্থা অবিশ্যি ছোটই, নিচু কয়েকটা চেয়ার,আর একটা কাঁচঢাকা টেবিল। দোকানের কোনে একটা চিনেমাটির

ফুলদানি। দেওয়ালে ঝুলছে মুঙখের স্ক্রিম আর গঘের স্টারি নাইটসের কপি,সব মিলিয়ে একটা দিব্যি পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ স্পষ্ট।

তা রেস্তরাঁর তারিফ টারিফ করছি, এমন সময়ে পেছনে একটা ''হেললো'' শুনে তাকিয়ে দেখি মধ্যবয়সী ওয়েট্রেস এসে হাজির, চোখে সামান্য বিস্ময়। খুবই স্বাভাবিক, দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কাস্টমারের ভীড় লেগে গেলে তো.... সে যাগগে, আমি তো স্মিত মুখে 'বঁজু মাদাম, দুকাপ কড়া করে কফি পাওয়া যাবে? আর সিগারেট? একটু হাত চালিয়ে দেবেন প্লিজ, তাড়া ছিল' বলে অর্ডার প্লেস করে দিলুম। মহিলাটি কি ভেবে ভেতরে চলে গেলেন।

বসে বসে আমরা দুইজনে গজল্লা করছি, এমন সময়ে সেই ওয়েট্রেস ভদ্রমহিলা একটা ট্রেতে ধুমায়িত দু কাপ কফি এনে হাজির। সঙ্গে এক প্যাকেট উৎকৃষ্ট সিগারেট। নাম মনে নেই, পরে খেয়ে বুঝেছিলুম এ রীতিমতো উচ্চাঙ্গের জিনিস। তা মহিলাটির পরে পরেই বিশালদেহী গুঁফো যে ভদ্রলোক ঢুকলেন, অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে ইনিই এই সালঁর মালিক। তিনিও বঁজু বলে অভিবাদন করলেন, আমরাও মাথা নেড়ে বঁজু বলে উত্তর দিলুম। ভদ্রলোকটি তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে এক কাঠের চেয়ারে বহু কষ্টে অধিষ্ঠান হলেন, তারপর পকেট থেকে একটা পাইপ ধরালেন,তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে ভাঙাচোরা ইংরেজিতে জানতে চাইলেন কোথা থেকে এসেছি, কি কাজ, কদ্দিন আছি, কি করে এই সালঁর খোঁজ পেলাম ইত্যাদি। আমরাও গড়গড় করে আমাদের জাত কুল ঠিকুজি, মায় গতরাতের নৈশসফরের কথা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলুম। ভদ্রলোক দেখলুম বেশ রসিক লোক। থেকে থেকেই অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন। আর মধ্যে মধ্যে কিছু আদিরসাত্মক ফোড়ন। সকাল সাড়ে ছটার পক্ষে আদিরস একটু আর্লিরস বুঝি, তবে আড্ডাটা দিব্য উপভোগ্য হচ্ছিল বলে আমরাও বেশ তালেতাল দিয়ে চলছিলুম। ওয়েট্রেস মহিলাও দেখলাম মালিকের কথা শুনে বেশ মিটিমিটি হাসছেন।

তা সেই দুর্দান্ত ভালো কফি শেষ হতে আমরা আরও দুকাপ অর্ডার করলুম। ভদ্রমহিলাও বেশ শশব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ততক্ষণে দুজনেই বেশ চনমনে হয়ে উঠেছি। ভদ্রলোক আমাদের নাম, বয়েস ইত্যাদিতে জিজ্ঞেস করা অবধি নেমে এসেছেন দেখে ভারি আপন আপন ফিল করতে লাগলুম। দেশে তো এইরকমই হয়, সামান্য আলাপেই লোকজন মাইনে, বাবার প্রস্টেট, শ্বশুরমশাই মারা গেলে সম্পত্তির কত অংশ পাবো, মেয়ের বিয়ের জন্যে কত ভরি সোনার গয়না জমিয়েছি, মায় অ্যাপেন্ডিক্সের সাইজ অব্ধি জিজ্ঞেস করে নেয়! ইওরোপীয়রা সেদিক দিয়ে অনেক সভ্য। তার পরেও যখন ইনি বয়েস, নাম ইত্যাদি অবধি নেমেছেন, এবং মেয়ের বিয়ে দেবার চক্কর নেই, নিশ্চয়ই সেটা নিজের বলে ভেবেছেন বলেই।

তা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কাপও এসে গেছে। আমরাও সেই দুরন্ত ভালো কফি শেষ করতে করতে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেলো।

আটটা বাজে, কি সর্বনাশ!!!

চকিতে বাকি কফিটা গলায় ঢেলে ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'খুব ভালো কফি খেলাম মাদাম, বিলটা আনুন প্লিজ, উঠতে হবে'।

এবার মাদাম আর মঁসিয়ে দুজনেই একে অন্যের দিকে তাকালেন, তারপর দুজনেই মৃদু হেসে জানালেন আমাদের পেমেন্ট করার দরকার নেই!!

অ্যাঁ, সে আবার কি?

এবার আমাদের বিব্রত হবার পালা। তা কি করে হয় মঁসিয়ে, আপনাদের সেবাযত্ন, যাকে বলে, হৃদয়ে রহিল গাঁথা, কিন্তু এত্ত উদার হলে আপনাদের রেস্তরাঁই বা চলবে কি করে, অ্যাঁ?

এবার দুজনেরই মুখের হাসি আরও চওড়া হলো, মহিলাটি স্মিত হেসে জানালেন, মঁসিয়ে স্যারক্যার, এটা রেস্তরাঁ নয়।

তখন আমাদের মনের অবস্থা, সংস্কৃতে যাকে বলে, অবর্ণনীয়!! রেস্তরাঁ নয়? মানে? সক্কালবেলা এসবের মানে কি, অ্যাঁ?

এবার বিপুলদেহী ভদ্রলোকটির হা হা অট্টহাসিতে চারিদিক সচকিত হয়ে উঠল, ওঁরা প্রথম থেকেই বুঝতেই পেরেছিলেন যে দুটি বিদেশী ভুল করে রেস্তরাঁ ভেবে ঢুকে পড়েছে। ওঁরাও এতক্ষণ তেড়ে কৌতুক উপভোগ করছিলেন, আমরা যে বুঝতেই পারিনি তাতে ভারি আমোদ পেয়েছেন। তবে সত্যিই এটি কোন রেস্তরাঁ নয়, রীতিমতো ভদ্রাসন!

আমাদের মনের অবস্থা বলে আর আপনাদের আর বিব্রত করবো না। শুধু পুরো ঘেঁটে যাওয়া মুখে একবার শুধোলাম, সব জেনেও আমাদের অ্যামন মুরগি করার কারনটা জানালে একটু সুস্থ হৃদয়ে দেশে ফিরে যেতে পারতুম আর কি!

ভদ্রমহিলা দেখলাম মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। পরিস্থিতি আচমকা বেদম গম্ভীর। গলা খাঁকারি দিয়ে সেই বিশালবপু ভদ্রলোকটি জানালেন, ঠিক আমাদের বয়েসী দুটি ছেলে ছিলো ওঁদের। বছর পাঁচেক আগে আল্পসে স্কিইং করতে গিয়ে হারিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি। বুড়োবুড়ি এখনো আশা করেন কোথাও না কোথাও ওরা সুস্থ শরীরে বেঁচেবর্তে আছে, হয়তো স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে। একদিন নিশ্চয়ই, রাস্তা খুঁজে ফিরে আসবে তারা, শীতের শেষে যেমন ফিরে আসে পরিযায়ী পাখিরা।

আশায় বেঁচে আছেন ওঁরা, এখনো।

বেরিয়ে এসে দেখি প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই কোকা কোলার বিজ্ঞাপন।

টিউবে করে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম চুরি করে যশোদার মাখন খেয়ে যাওয়া নিয়ে এত কানুগীত লেখা হয়েছে, মাখন খাইয়ে যশোদামায়ের আনন্দ নিয়ে কেউ কিছু গান লেখেনি কেন?

প্যারিস হোক বা বৃন্দাবন.... মায়েরা তো...

আনন্দের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালাম, একটা দুর্দান্ত সফরের জন্যে এসেছিল বেচারি।

কে জানতো, সব সফর শেষে তেমন সুহানা হয় না মঁসিয়ে!

মার্কেট ভিজিট ২

যাঁরা আমাকে কণিকামাত্রও চেনেন, তারাই জানেন আমার দ্বিতীয় প্রেম ইস্টবেঙ্গল আর তৃতীয় প্রেম বিরিয়ানি।

আমি যে মার্কেটেই যাই, লাঞ্চের ব্যাপার টা আগে ঠিক করে ফেলি। হুঁহুঁ বাওয়া ,এসব হচ্চে সেলসের চাকরির মজা, ভালো ইংরেজিতে বললে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট। আর তারপর যদি আমার মতন সুযোগ বুঝে যথাযথ রন্ধ্রে তৈলপ্রয়োগের ফলে ন্যাশনাল লেভেল অবধি উঠে থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই। এই গতকাল দিল্লীতে করিমসে তন্দুরি কাবাব, তো আজ আগ্রাতে পেঁঠা, আর আগামিকাল বেনারসে রাবড়ি আর কচৌরি। এই জিনিস চলতেই থাকে লিপিড প্রোফাইলের এইসি কি ত্যইসি করে, চক্রবৎ।

কিন্তু হায়দ্রাবাদ আর লক্ষ্ণৌর ব্যাপারটা আলাদা। এখানে আমি আসি শুধুমাত্র..

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, বিরিয়ানির জন্যে। এবং শুধুমাত্র পছন্দের ঠেক থেকেই, হায়দ্রাবাদে যেমন প্যারাডাইস, লক্ষ্ণৌতে তেমন দস্তরখান।

যাই হোক, আজ ভোর ছ'টা নাগাদ হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে, সাত বচ্ছর বাদে সূর্যোদয় দেখার আনন্দে ফের দুঘন্টা ঘুমিয়ে, তারপর স্নান করে, শেভ করে, ফিটফাট বাবুটি হয়ে গোমতীনগর মার্কেট নেমেছি দুটো নাগাদ বেরিয়ে যাব এই প্ল্যান নিয়ে। এখান থেকে স্ট্রেইট হজরতগঞ্জ এন্ড দেন, হেভেন।

তা আমার যা অভ্যেস, সেলসম্যানের সংগে হাত মেলাবার পরেই এবং তার হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই, স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন, 'সকাল থেকে কটা কল করলি? কটা প্রোডাকটিভ?'।

এ ছোকরা ভারি লজ্জিত ভাবে ঘাড় মাথা চুলকে মিনমিন করে জবাব দিল সকাল থেকে উনি সাতটা কল করেছেন, জিরো প্রোডাকটিভ!

শুনেই চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সাড়ে দশটা বাজে, মাত্র সাতটা কল করেছিস, একটাও প্রোডাকটিভ নয়, এই মাসের টার্গেটটা কে করবে, আমার বাবা?

খুব সম্ভবত আমার কান দিয়ে ধোঁয়াটোঁয়া বেরোচ্ছিল। ছোকরা সভয়ে পা তিনেক পিছিয়ে গিয়ে নিবেদন করলো বম্বে থেকে বড় সাহেব যখন ক্ষমাঘেন্না করে পায়ের ধুলো দিয়েই ফেলেছেন, এইবার একটা এসপার বা ওসপার না হয়ে যায় না, 'গুসসা না হইয়েগা'।

ছোকরার ঘেঁটি ধরে বললাম 'লেটস গো টু দ্য নেক্সট আউটলেট।'

নেক্সট দোকান দুবস্তা টাটা সল্ট নেবার পর রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল। সে বাবুও 'ঠিক হ্যয় বাউজি' বলে হাসিমুখে বেরিয়ে আসছিল, দরজায় আমি, আর আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখে ফের এবাউট টার্ণ।

এরপর কি ঝুলোঝুলি রে ভাই!! আরও তিনটে মাল গছালে।

তারপর থেকে দেখি ছোকরার উৎসাহ দেখবার মতন। প্রায় প্রতি দোকানেই সে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে বডি ফেলে দিচ্ছে, সেলও হচ্ছে মন্দ নয়। ক্যালানির ভয়ে না দৈবানুগ্রহ বোঝা দায়!

ভাবলুম এই সুযোগ, প্রায় দুটো বাজে, দস্তরখানের দেবভোগ্য বিরিয়ানির সেই উদাত্ত আহবান আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। তখন তাকে ডেকে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্লুম 'শোন, আমি চল্লুম। মন দিয়ে কাজ করিস। ফাঁকিবাজিটা বন্ধ কর। ইয়েমস্তি করে জীবনে কারও উন্নতি হয়নি। তুই কি জানিস ফাঁকিবাজি নিয়ে নোয়াম চমস্কি কি বলেছেন?'

ছোকরা মনে হল একটু ঘাবড়ে গেলো, ''উয়ো চামচুকিয়া বাবু কা বোলা স্যার?'

'উও বোলা অবহেলা করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে। বুঝলি? আভি হাম চলা। মার্কেট শেষ করকে হামকো রিপোর্ট পাঠানা। নইলে প্রচন্ড ক্যালানি তুমহারা কপাল মে নাচ রাহা হ্যায়, সমঝা?'

এত বড় সদুপদেশ শুনেও সে বাবু দেখি ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। বল্লুম 'কি হল?'

'আভি আপ যাইয়েগা?'

সেই রকমই তো ইচ্ছে। কেন? তোর পারমিশন লাগবে নাকি রে?

সে প্রায় ''আভি না যাও ছোড়কর'' গোছের চোখমুখ করে বলল 'আউর দো ঘন্টে রুখ যাইয়ে না সা'ব'।

ঝট করে মাথা গরম হয়ে গেলো, ওদিকে বিরিয়ানি ঠান্ডা হয়ে গেলো বলে ইনি এখন...

খ্যাঁক করে বল্লুম 'কিঁউ বে?'

এরপর ছোকরা ভারি অভিমানভরে 'আজ হাম আপনে দুঁয়াও কা অসর দেখেঙ্গে' ন্ট্রে জানালো সাহেব কি চাননা এই গরীব দুসাদের বেটা অন্ততপক্ষে একটা মাস একটু সেলস ইন্সেন্টিভ কামাক!

হালায়, তুমি বাঙালরে সেন্টিমেন্ট দিতাস?

খুব, খুউউব বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞেস করলুম আমি থেকে গেলে তার এক্সাক্টলি কোন চতুর্বর্গ লাভটা হবে শুনি?

জবাবে সে যা বলল, আমি শুনে থ্াঁ।

তার বক্তব্য একে তার এলাকায় সেলপত্তর তেমন নেই। তদুপরি তার উপরওয়ালা সেলস অফিসারটি একটি জাতখচ্চর হারামি ভূমিহার। সে ইচ্ছে করেই প্রতি মাসে এমন টার্গেট দেয় যে এই অসামান্য প্রতিভাধর সেলসম্যানরত্নটির কাছে সেই সাত রাজার ধন সেলস ইনসেন্টিভখানি কেবলই ''পিসলাইয়া পিসলাইয়া' যায়।

'তা খোকন, এতে আমি কি করবো?'

সে খোকা ব্রীড়ানতা কুমারীর মতন নখ খুঁটতে খুঁটতে জানালে, লাস্ট সাতাশ দিনে যা সেল হয়নি, শুধু আজই সে প্রায় নামিয়ে ফেলেছে।

'তো?'

এই তো'এর মানে আর কিচুই না। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি যদি আর ঘন্টা দুয়েক এঁর সঙ্গে ডেঁইড়্যে থাকি, উনি কালকের মধ্যেই টার্গেট নামিয়ে ফেলবেন। জাস্ট হাজার দশেক আর বাকি। ওটা পরশুর মধ্যে লিচ্চই হইয়ে যাবেক।

সে তো বুঝনু। তা ভাইটি, আমিই কেন?

এর উত্তরে সে ছোকরা যা বলল, লিখতে গিয়ে অবধি আমার গা টা কেমন শিউরে শিউরে উঠছে কাকা। মাইরি বলছি, একবন্ন বাড়িয়ে না।

আজ অবধি যা হয়নি, তা আজ হতে দেখে ছোকরার পাক্কা বিশ্বাস আজ স্বয়ং মা লক্ষী মুম্বাই থেকে শার্ট প্যান্ট পরিধানান্তে লক্ষণাবতীতে ওঁর এই অধম সন্তানটির সাহায্যবিধায় অবতীর্ণ হয়েছেন!

মানে?

মানে আর কি? বাবুর বয়েস একুশ। জাতিকূলসংস্কারবিধায় বছর দুয়েক আগে উনি উদ্বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, মাস খানেক আগে বাপও হয়েছেন। নেক্সট মাস কিছু খরচিলা টীকাকরণ কর্মসূচি আছে। টাকাটা উনি সসুরাল থেকে আদায় করবেন না গিন্নির বাউটিখানি বন্ধক রাখবেন স্থির করে উঠতে পারেন নি। ইন্সেন্টিভটুকু পেলে কাজ অবশ্যই হত, তবে কিনা প্রভু এর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। 'আজি এ প্রভাতে' এই অধম ওনার পেছনে না লাগলে এই 'বৃথা আশা মরিতে মরিতেও' চেগে উঠতো না বলাই বাহুল্য।

অতএব আমি যদি আমার এই মহিমান্বিত চরণদুখানি ওনার মস্তোকপরি আরও ঘন্টা দুয়েক রাখি, তাহলে এই গরীব দুসাদের বাচ্চা বেকার বেফালতু ঝামেলা উমেলা না বাড়িয়ে পরের মাসে নিজের অওলাদটির ফুল টীকার ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারে।

উফফফ, পুরো সেন্টিমেন্টের ঝাউগাছ মাইরি। কানের গোড়ায় দুটো থাপ্পড় মেরে চলেই আসতুম। শালা, তোর বাচ্চার টীকা ইম্পর্ট্যান্ট না আমার বিরিয়ানি?

শেষ পর্যন্ত থাকতে বাধ্য হলুম। প্রথমত মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলা আমার ঠাকুর্দার শেষ কথাটা খুবই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মনে পড়ে গেছিলো, 'কহনো লোক ঠকাইবানা, আর লুকযুনরে পারলে হেল্প করবা'।

আরও বড় কারণ আমার মাতৃদেবী।

আমার মাতামহ ছিলেন বরিশাইল্যা বাঙাল। তাঁর মেয়ের মধ্যে সেই গনগনে তেজোদীপ্ত ব্যাপারটা প্রবলভাবে বর্তমান। ''ছুডবেলা থেইক্যা'' দেখেছি এইসব কারণে ভদ্রমহিলার স্নেহ একদমই নিম্নগামী হয় না। বরং জানতে পারলে পিঠের চামড়া উঠে ডুগডুগি হবার বিপুল চান্স হাড়ে হাঁটুতে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

অতএব আর কি। চারটে অবধি সে দেহাতিনন্দনের সঙ্গে মার্কেট করে খালি পেটে দু পেগ হুইস্কি চড়িয়ে এই লেখা লিখছি।

ডিনারেও দস্তরখান কপালে নেই। সে হতচ্ছাড়া খুব জোর দিয়ে বলেছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আজ আমার জন্যে গরম গরম বাজরার রোটি আর দেসি চিকেনের ঝাল নিয়ে এসে আমার হোটেলে দিয়ে যাবে, ওনার জরু আমার জন্যে ইসপেসাল রান্না করে রেখেছে।

পুং মা লক্ষীর জন্যে ভোগপ্রসাদ আর কি!

ইয়ের চাকরি শালা !!!

অথ কণ্ডোম কাব্য

(কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্কদের জন্যে, আগেই গেয়ে রাখলুম বাপু)

জীবনের দশটা মূল্যবান বছর বিভিন্ন হোস্টেলে কাটিয়েছি। ছোটবেলায় অহরহ শুনতে হতো, 'তুই আর মানুষ হবি না'। মানুষ হতে পেরেছি কিনা সে নিয়ে আমার গুরুজনদের ঘোরতর সন্দেহ আছে বটে। কিন্তু তদসত্বেও যে এই ভবের হাটে করেকম্মে খাচ্ছি, সে অনেকটাই ওই হোস্টেলে থাকার সময় অর্জিত সারভাইভিং টেকনিকের দৌলতে।

তা এই গল্পটি হায়দ্রাবাদে চাকরি করার সময় যে ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রেইনি হোস্টেলে থাকতাম, তখনকার। রসিকেষু রসস্য নিবেদনমকরে বাজারে ছেড়ে দিলুম!

প্রথম চাকরি করার সময় আমার বুজুম ফ্রেণ্ড ছিল এক ঔড্রনন্দন। উচ্চতায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, রোগা প্যাংলা, এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সে ছোকরার একমাত্র পাসটাইম ছিল হস্তমৈথুন। প্রতি শনিবার ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনি হস্টেলে ওর রুমে আসর বসতো। ছোকরা খাটের ওপর কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় খুব দরদ দিয়ে 'বিবি নরম, পড়োসি গরম', 'লুট লিয়া মচলতি জওয়ানি' ইত্যাদি শীর্ষক অতি উচ্চাঙ্গের গদ্যসাহিত্য আবৃত্তি করতো। আর আমরা নিচে বোতল নিয়ে বসতাম। কোক, রাম আর মস্তরাম। আহা, অমন রসালো অবসর বিনোদন কবেই জীবন থেকে অবসৃত!

বিশেষ বিশেষ জায়গায় আবার রিপিটের অনুরোধ আসতো। ছোকরা ভারি উৎসাহ পেয়ে আরো নাটকীয় ভাবে রসালো টিকাটিপ্পনি সহ সেসব বিবৃত করতো। দু একটা নমুনা বুকের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু এখানে দেওয়া মানে সোজা শ্রীঘরবাস। তাছাড়া কবি রস আলাপনটা স্রেফ অন্তরঙ্গ সঙ্গে করার জন্যই খুব করে বলে গেছেন। বহিরঙ্গে সেসব নাম সঙ্কীর্তন না হয় আপাতত থাক!

হায় পাঠক, আপনারা কী হারাইলেন তা জানেন না।

ছোকরা একবার খুবই দুঃখ করে আমাকে বলেছিল কত বিবেকানন্দ এবং সুভাষ বোস সাবানের সঙ্গে বাথরুমে আহুতি দিয়েছে সে, কত শচীন আর অমিতাভ বচ্চন ওর বিছানার চাদরে বা শর্টসের কাপড়ে অবহেলায় ধুঁকে ধুঁকে প্রাণত্যাগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আহা, সেই যৌবনজলতরঙ্গ যদি ও বয়েসকালে একটু সামলেসুমলে রাখতো! এখন ওর বাচ্চা পয়দা হলে যে পাক্কা ওর মতই একপিস হারামি হবে, এ বিষয়ে ছোকরা নিঃসংশয় ছিল।

তা কি বলছিলাম যেন?

হ্যাঁ, আমার সেই বন্ধু। হাইট পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, রোগা প্যাংলা আর বিচ্ছিরি রকমের কালো। মানে উজ্জ্বল ঘনশ্যাম নয়, নোংরা কালো। একে শুধু চাকরি করতে গিয়ে নয়, তার আগেও চিনতাম, কারণ ছোকরা আমার কলেজের সহপাঠী ছিল।

আগেই স্বীকার করে নিই, বেরহামপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই ঔড্র সন্তানের মাথা ছিল অতি সরেস। বাবা মা নিরক্ষর, আদ্যন্ত ভাগচাষীদের ফ্যামিলি। ছেলে যে শুধু আই আই টি ক্র্যাক করেছিল তা নয়, আমাদের ব্যাচে সিভিলের টপার ছিল।

যাই হোক, এহেন প্রতিভার দুর্বলতা ছিল শুধ দুটি, পানুদর্শন ও মহিলা অবলোকন। তবে ছেলে ছিল ভারি সভ্যভব্য, হাঁ করে আদেখলের মতন তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর বেশি কিছু করার হিম্মত ছিল না। তার ওপর সে ছোঁড়া নিজেও এ নিয়ে বেশ সচেতন ছিল। একবার মদ্যপাবস্থায় বলেই ফেলেছিল, ও যদি নারীসঙ্গহীন জীবন কাটিয়ে মারা যায়, ওর অতৃপ্ত আত্মার পিণ্ডদান যেন সোনাগাছিতে করা হয়!! আর মিস্টার

ইন্ডিয়ার ঘড়ি বা হ্যারি পটারের ইনভিজিবিলিটি ক্লোক হাতে পেলে ওর কি কি করার ইচ্ছে সে আখ্যান বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ পেলে হিউ হেফনার ওর কাছে নাকখত দিয়ে নাড়া বাঁধতেন, মস্তরাম আর বিচিত্রবীর্য খেদমতের কাজে নিযুক্ত হতেন!

তা আমাদের চারজনের গ্যাং ছিল, আমি, এই মহাপুরুষ, জগদীশ কুম্ভারে আর গণেশ পাওয়ার, ওরফে ভাউ। মারাঠিতে ভাউ কথাটা সসম্ভ্রমে প্রতিপত্তিশালী লোকেদের বলা বলা হয়। কিন্তু গণেশ পাওয়ারকে ভাউ বলা আর তুষার কাপুরকে অ্যাল প্যাচিনো বলা একই কথা। কিন্তু সেটা আমাদের বক্তব্য না। আমাদের গল্প এখন অন্য।

সুধী পানুবিদদের আশা করি মনে আছে, ২০০৩ সালে মল্লিকা শেরাওয়াতের একটি মুভি রিলিজ করে, ''খোয়াইশ'' বলে। ভদ্রমহিলা তাতে সতেরোটা চুমু খেতে জনমানসে অশেষ হর্ষোৎপাদন করেছিলেন। তা সেই চুম্বনসমুদ্রের ঢেউ আমাদের হায়দ্রাবাদের উপকূলীয় জনপদ রামচন্দ্রপুরমেও এসে লাগলো। সেই ঔড্রনন্দন তো সাতিশয় উত্তেজিত। অফিসে মন দিয়ে পিএলসির সার্কিট ডিজাইন করছি, তার প্রায়-অর্গ্যাজমিক গলায় ফোন, 'উসকি **** দেখা হ্যায় বে? মন করতা হ্যায় কাটকে ঘর লে আঁয়ু'। তাকে এইসব হিংস্র স্যাডিস্ট চিন্তাভাবনা থেকে নিবৃত্ত করে ফোন রেখেছি কি রাখিনি, ফের ফোন, 'ইসিকো **** স্টাইলমে লাগানে সে য্যাদা মজা আয়েগা, নেহি? তুঝে কেয়া লাগতা হ্যায়? উয়োম্যান অন টপ?'

শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে বল্লুম ধুর মূর্খসঙ্গমী, চল, তোকে সিনেমাটা দেখিয়েই আনি। নইলে আমার এই ইয়ে জ্বালানো তোর বন্ধ হবে না।

আমার একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে কেনা বাজাজ ফোর এস ছিল। টুকটুক করতে করতে সবচেয়ে কাছের যে সিনেমা হল, যেখানে ছুঁচোর ভয়ে পা তুলে রাখতে হয়, সেখানে এক শনিবারের সন্ধ্যায় দুজনে গিয়ে হাজির।

জানি না কতজন এই জঘন্য সিনেমাটি দেখেছেন, এবং তার মধ্যে কতজনের মনে আছে। শুধু রসিকজনা জেনে রাখুন, এই মুভিতে এক জায়গায় দেখানো হয়েছে যে হিরো হিরোইন সঙ্গমপূর্ব কালের প্রিকশন হিসেবে কণ্ডোম কেনা মনস্থ করেন, হিরোটি সেই লজ্জাজনক বস্তুটি কিনতে গিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল বেহুদ্দ ছড়ান, অবশেষে মল্লিকা গিয়ে স্মার্টনেসের হদ্দমুদ্দ করে সেই রাবারখণ্ড কিনে বিজয়তিলকস্বরূপ ধারণ করে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' করে ফিরে আসেন।

যাহাই হউক। সিনেমা দেখে টুকটুক করে ফিরে আসছি। সেই মক্কেল দুহাতে আমার কোমর জড়িয়ে বাঁ কাঁধে থুতনি রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ রে, তুই পারবি?'

'কি পারবো?'

'দোকানে গিয়ে সবার সামনে কণ্ডোম। কিনতে?'

'ধুর বাঁ*, না কেনার কি আছে?'

'বা* পারবি বাঁ*। আমি বলছি তুই পারবি না, তোর গাঁ* দম নেই'।

বাঙালকে চ্যালেঞ্জ দেখানোটা ভারতের ইতিহাসে চিরকালই ঐতিহাসিক ভুল বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। মনে হলো এ কথাটা এই ওড়িয়াছানাকেও বুঝিয়ে দেওয়াটা আশু কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

ফল, হাজার টাকার বেট!

তা বাইক এনে থামালুম টাউনশিপের মধ্যেকার বাজারের সবচেয়ে বড় মেডিক্যাল শপটির সামনে। বাইক স্ট্যাণ্ড করলাম। তিনি আমাকে সদর্পে বললেন, 'চল বে চুতিয়ে, লে কর আ।'

ভাগ্যক্রমে দোকানে এক সমবয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে কাফ লজেঞ্জ কিনছিলো। আমি গিয়ে শুকনো গলা ঘেঁ ঘুঁ ঘিঁ করে বল্লুম 'ক ক ক কণ্ডোম আছে?'

ঠক করে একটা ছোট প্যাকেট, ছোট্ট ব্রাউন এনভেলাপে বন্দী হয়ে এলো। আমিও অন্যদিকে তাকিয়ে দশটাকা দিলুম, দোকানদারও নৈর্ব্যক্তিকভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে টাকাটা নিয়ে ড্রয়ারে রাখলেন।

বীরদর্পে ফিরে এলুম, ছোকরার সামনে প্যাকেটটা নাচিয়ে বল্লুম, 'ওহে ভগিনীসঙ্গমী, আব তু যা, করকে দিখা।'

দৈব। দৈব সর্বত্র প্রবল। এ কথা অস্বীকার করে কার সাধ্য? নইলে এতক্ষণ খালি থাকা কাউন্টারে সে ছোকরা এগোনো মাত্র দুটি সুন্দরী কিশোরীর আবির্ভাব ঘটবে কেন?

রসের নাগর হিসেবে আমার খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। রগড় দেখার জন্যে একদম সাইড ঘেঁষে এলাম। সে ছোঁড়া তো যে ভাবে দোকানের সামনে এগোলে, দেখে মনে হলো সত্তরের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস ব্যাটারির সামনে ব্যাট হাতে জাভাগাল শ্রীনাথ!!

সেই নিস্তব্ধ সশঙ্ক মুহূর্তটি এখনো মনে আছে। বন্ধুবর সেই সদ্যযৌবনবতী কিশোরীদুটির প্রতি অপাঙ্গে কিছু অহৈতুকী প্রেমার্তি বিলিয়ে দোকানদারকে বললেন, 'কন্ডোম হ্যায়?'

স্পষ্ট দেখলুম, সেই কিশোরীদ্বয়ের চোখে সপ্রশংস কৌতুক খেলে গেলো। মুহূর্তে আমার বুক জ্বলে পম্পেই। দোকানদার ভদ্রলোক সহজাত নির্লিপ্ততায় একটা প্যাকেট এনে ঠকাস করে রেখে বললেন 'দস রুপেয়া'।

এতক্ষণ সব কিছু ঠিক চলছিল। গোল বাধলো এর পরেই। অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এই আপ্তবাক্য ভুলে বন্ধুবর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'ইসকা কালার কেয়া হ্যায়?'

সেই মহাপুরুষের মহাপ্রশ্নে দোকানী হতভম্ব, কিশোরীদ্বয়ও যৎপরোনাস্তি বিস্মিত। আমার কথা আর কহতব্য নয়। কন্ডোমের কালার? অ্যাঁ, বোকাচণ্ডী, এই ছিলো তোর মনে?

তা সেই দোকানদার ভদ্রলোক, তাঁর সমস্ত ডিগনিটি কুড়িয়েবাড়িয়ে বললেন,

'পিঙ্ক হ্যায়। কিঁউ?'

'হরা ইয়া ব্ল্যাক কালার কা নেহি মিলেগা?'

স্তব্ধ। দুনিয়া থেমে গেছে। হাসি মুছে গেছে। কোকিল গাইছে না। কাক কা কা করছে না। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ। মেয়েদুটির পলক পড়ছে না।

এমন সময়ে সেই দোকানির ভারি নিরীহ এবং নিরাসক্ত প্রশ্ন সেই নৈঃশব্দ্য খানখান করে দিলো, 'ব্ল্যাক ইয়া হরা মে এক্সট্রা মজা আয়েগা কেয়া?'

দীর্ঘ তেরো বছর কেটে গেছে, এখনো কণ্ডোম কিনতে গেলে সেই মহাপ্রশ্ন মনে পড়ে, যায়, আর সেই অনামা বিপণীমালিকের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নীচু হয়ে আসে। সত্যিই তো,

কণ্ডোমের কালারভেদে কি আনন্দের রকমফের হয় রে পাগলা, অ্যাঁ?

মার্কেট ভিজিট ৩

ছোটবেলা থেকেই এসব সহ্য করে যাচ্ছি। কি আর করবো, রিফিউজি বাঙাল বাড়ির গরীব ছেলে। কোনমতে টুকেটাকে পাশ করে চাকরি করে খাচ্ছি,কায়ক্লেশে দিন চলে যায়, আমার খারাপ লাগার কার কি দায় বলুন? সেই যে ছোটবেলায় বাবলুকাকুর পানের দোকানে দেখেছিলাম 'গীতা সারাংশ', আয়নার পাশে সেলোটেপ দিয়ে মারা ছিলো, সেটাই মাথায় ঘুরছে, কি নিয়ে এসেছিলাম? কি নিয়ে যাবো?

বাদ্দিন ওসব। এসব আমার জ্ঞান হওয়া ইস্তক চলছেই। আর চলবেই। (দীর্ঘশ্বাসের শব্দ)।

কালকে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বেনারস পৌঁছে, হোটেলে ঢুকে, স্নানটান করে, ছোট্ট করে একটা পেগ বানিয়ে আয়েশ করে এক কাঙাল মালসাটটা খুলে বসেছি, এমন সময় ইন্টারকমটা বেজে উঠলো।

ফোন তুলতেই ওদিক থেকে ভারী মিষ্টি গলায় কোন এক ললনা বলে উঠলেন, 'গুড ইভনিং মিস্টার সরকার, হোটেল র‍্যাডিসনে আপনাকে স্বাগত জানাই।'

কি বলবো ভাই, কানটা যেন জুড়িয়ে গেলো। একে তো অনেকদিন বাদে বাংলা শুনছি, তার ওপর কি মিষ্টি কি মিষ্টি গলা কি বলবো, মনে হল যেন টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে প্রথমবার সূর্যোদয় দেখছি, হাতে ভীমনাগের নলেনগুড়ের সন্দেশ।

আমিও হাসিমুখে বল্লুম 'আরে আপনি বাঙালি নাকি? হেঁ হেঁ বাহ বাহ, এদ্দুর এসে বাঙালি মহিলারা চাগরি কচ্চেন, খুউপ ভালো'।

উনি তেমনই মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমাকে তুমিই বলুন স্যার, আমি আপনার থেকে বয়েসে ছোটই হব। আমার নাম সুকন্যা আফরিন। আমি এখানকার ব্যাঙ্কোয়েট ম্যানেজার। আপনার সংগে আলাপ করে খুব খুশি হলাম'।

খুশি যে আমিও একঘর হয়েছি বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটা খটকা লাগলো মনে হল?

'থ্যাঙ্কস আ লট সুকন্যা। কিন্তু আমি তো ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার। ব্যাঙ্কোয়েটের সঙ্গে, ইয়ে, মানে আমি তো কোন মীটিং অ্যারেঞ্জ করছি না!'

ওপার থেকে রিনরিন করে হাসির শব্দ ভেসে এলো 'না না স্যার, আমি জানি সেটা, শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলব বলেই ফোন করছি'।

খুব মায়া হল জানেন? আহা রে বেচারি হয়ত ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশবিভূঁইতে পড়ে আছে, বাংলা বলার লোক পায় না, নিশ্চই মায়ের কথা ভেবে মন খারাপ করে, নিশ্চই অনেকদিন পার্কস্ট্রিটের কাটি রোল আর হাতিবাগানের ফুচকা খায়নি, হয়তো বইমেলা যেতে চেয়েছিল, পার্মিশন পায় নি, ওর একটা পাক্কা ইয়ের হাতবাক্স মার্কা বস আছে, বিচ্ছিরি রকমের বদমেজাজি আর খেঁকুড়ে, বোধহয়...

মনটা ভারি হুহু করতে লাগলো, বুঝলেন? খুব দরদ মেশানো গলায় বল্লুম, 'তা বাড়ি থেকে এদ্দুরে পড়ে আছো, কষ্ট হয়না?'

টেলিফোন কি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারে? বিদ্যুৎবাহী তার কি জানে কত কষ্ট বয়ে যায় এদিকে থেকে ওদিকে?

'না স্যার, এখন আর তেমন কষ্ট হয়না, আগে হত। এই মাঝে মাঝে আপনার মতন লোকজন এসে পড়েন, মাঝে মাঝে কথা বলে খুব ভালো লাগে।'

'বাহ বাহ। কলকাতায় থাকো কোথায়? মা বাবা কি করেন?'

'প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে থাকি স্যার। বাবা কলেজে পড়াতেন, এখন রিটায়ার্ড।'

'আর তুমি? '

'আমি স্যার জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কম নিয়ে পড়েছি। তারপর দেখলাম চাকরি পাচ্ছি না, তাই ছোট একটা কোর্স করে এই লাইনে ঢুকে পড়েছি।'

'বাহ বেশ করেছো'

'আমি তো স্যার, কাল যখনি শুনেছি আপনি আসছেন, তখন থেকে ভাবছি, কখন আপনাকে ফোন করবো'।

নাহ, এরও দেখচি আমার মতই বাঙালি বাঙালি বাই আছে।

'কিছু মনে করলেন না তো স্যার?'

পাগল, সুন্দরী মহিলা নিজে থেকে ফোন করে আলাপ করছে, কিছু মনে করব মানে? পোড়া কপালে তো এসব সৌভাগ্য জোটে না বিশেষ। সামনাসামনি দেখলে নিশ্চই 'ভালো থাকবেন মেসোমশাই, মাসিমাকে আমার প্রণাম জানাবেন' বলে কেটে পড়তো। তা যখন হচ্ছে না, ছোট করে এট্টু ফোনপ্রেম করে নিতে ক্ষতি কি?

গলাটা মিষ্টি করে, মানে এই হেঁড়ে গলা যদ্দুর মিষ্টি করা যায় আর কি, বল্লুম 'এখানে কোথায় থাকো? উইকেন্ডে কি কর?'

(মানে আজই তো উইকেন্ড, ''হ্যালো, ইজ ইট মি ইউ আর লুকিং ফর?'')

'কোম্পানির একোমোডেশন দেওয়া আছে স্যার। উইকএন্ডে কি আর করবো, এদিক ওদিক ঘুরি'।

'একাই?' খুব সন্তর্পণে প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিই।

'উমম, মাঝে মাঝে রুমমেট সংগে থাকে, বেশিরভাগ সময়ে অবশ্য একাই বেরিয়ে পড়ি'।

জয় গুরু। এবার ব্যাপারটা সাবধানে, খুউউব সাবধানে খেলিয়ে খেলিয়ে...

'আমার কিন্তু স্যার ভীষণ ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে।'

হেঁহেঁ, ভীষণ ভালো যে আমারও লাগচে সে আর বলতে?

'গুড টু নো দ্যট সুকন্যা (ইংরেজিটাই চলুক নাকি? ইম্প্রেস করতে সুবিধা হবে মনে হয়), কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে আমি এখানে উঠছি?'

'আমাদের ফ্রন্ট ডেস্ক যিনি দেখেন, মুখার্জী বাবু, তিনিই জানালেন যে আপনি আসছেন। আমি তো তখন থেকে স্যার অপেক্ষা করছি আপনার সঙ্গে কথা বলবো বলে'।

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না মশাই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আজি এ প্রভাতে রবির কর, আমারই ওপরে পড়বি? পড়।

কপাল ঠুকে বলেই ফেলি নাকি কালকে বিকেলে আমাকে বেনারস ঘুরিয়ে দেখার কথা? পাটনার ট্রেইন টিকেটটা অবশ্য ক্যান্সেল করাতে হবে, পরশুর টিকেটই করাব। নাকি ভলভোতেই চলে যাই? বেনারস টু পাটনা তো জাস্ট ঘন্টা চারেকের রাস্তা।

গলাটা খুব গাঢ় করে বল্লুম 'কেন বলতো সুকন্যা?'

'আমি তো আপনাকে ফেসবুকে ফলো করি স্যার। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট টা পাঠাবার সাহস হচ্ছিল না।'

সে কি রে পাগলা? আমি তো সব্বার ইয়ে এক্সেপ্ট করি, এই তো কালই দুটো এক্সেপ্ট করলুম, একটার নাম ''মিষ্টি নেড়ি'', আরেকটার নাম ''ন্যাংটো গোলাপ'', তোরটায় তো হামলে পড়ে ইয়েস বলবো।

'আরে পাঠালেই পারতে। এমন আর কি ব্যাপার'।

'আমি তো স্যার একটু আধটু লেখালেখিও করি,...'

মার দিয়া কেল্লা। গাড়ি লাইনে ঢুকে পড়েচে। এবার আস্তে করে,...

নিশ্চয় আমার লেখা পড়েছে। নইলে এতো আকুলিবিকুলি কিসের? নিজের ওপরেই শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো ঝপ করে। নাহ, এই যে কিছুমিছু লিখিটিখি, পাবলিক একধারসে হুলিয়ে খিস্তিয়ে যায়, দু একজন তো লেখা

বন্ধ না করলে মার্ডার করারও হুমকি দিয়েছে ইনবক্সে, সেসব খুব খারাপ নিশ্চই নয়। এই তো সেদিন একজন মেসেজ করলেন 'লিখে যা পাগলা, বীভৎস বাজে লিখিস বটে, কহতব্য নয়, রোদ্দুর রায়ের রবীন্দ্রসংগীত আর তোর বাংলা লেখা প্রায় একই, কিন্তু চেষ্টা করে যা। কালেক্কে একদিন আমার লেভেলে না পৌঁছলেও কিছু তো অন্তত পারবি। সেটাই বা তোর পক্ষে কম কি?', এসবের কি কোন দাম নেই?

খুব প্রেম প্রেম গভীর গলায় বল্লুম, 'ইয়ে, কাল বিকেলে কি করছো?'

'বিশেষ কিছুই না স্যার'।

ধরা যাক না কাল সারা দিন একসঙ্গে রইলাম দুজনায়।। কাশীর গলির মধ্যে, দশাশ্বমেধ থেকে অসসি ঘাট অবধি ঘুরে বেড়ানো, হা হা হি হি হাসি, একসঙ্গে পানিপুরি বা পাপড়ি চাট? রুমাল দিয়ে গালে লেগে থাকা কিছু মুছিয়ে দেওয়া। সুধীন দত্তের শাশ্বতী কবিতাটা মুখস্ত করে যাই? নাকি শক্তি চাটুজ্জে?

তারপর একসঙ্গে বসে আরতি দেখার সময় আলতো করে আঙুলে আঙুল, কাঁধে মাথা। হয়তো উড়ন্ত চুল আমার মুখে....

ঘপাৎ করে থার্ড পেগটা পুরো নামিয়ে দিলুম। লাফাতে থাকা হৃৎপিন্ডটাকে বাঁ হাতে চাপা দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বল্লুম 'হোয়াই ডোন্ট ইউ হেল্প মি টু এক্সপ্লোর দিস বিউটিফুল সিটি অফ বেনারস টুমরো? লাঞ্চ ইজ অন মি'।

ধক। ধক। ধক।

'অফ কোর্স স্যার, দ্যাট উইল বি মাই প্লেজার'।

ওরে কে কোথায় আছিস? শাঁখ বাজা, উলুধ্বনি দে। কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা বলি দেবো মা। এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছো!

'তোমার কোন অসুবিধা নেই তো?'

(নাহ, কার্টসি বলে তো একটা বস্তু আছে রে ভাই।)

'কি বলছেন স্যার? জানেন স্যার আপনার সংগে দেখা করার কবে থেকে ইচ্ছে? সেই জার্নালিজম পড়ার সময় থেকে। আপনার সংগে কিছু সময় কাটানো তো ভাগ্যের ব্যাপার স্যার। কত কিছু শেখার আছে আপনার কাছ থেকে। বাংলার সবচে'' বড় সংবাদপত্রের সম্পাদনা কি ছোটখাট ব্যাপার স্যার? তাও এতদিন ধরে? ভাবতেই ভালো লাগছে ছোট্টবেলার স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে ....

ঠক করে ফোনটা নামিয়ে রাখলুম।

লাস্ট পেগটা নীট মারবো। কাল সকালেই চেক আউট।

ইয়ের লাইফ শালা !

আপিসের গল্প

নতুন যে অফিসে জয়েন করেছি, সে মশাই চমৎকার জায়গা। সুন্দর সাজানো অফিস, ইয়্যাত্তোবড় একটা কেবিন দিয়েছে আমাকে, তাতে জনা দুয়েক লোক বক্সিং করতে পারে, চাইলে ভারতনাট্যমও নাচতে পারে, কুচিপুড়ি নাচলেই বা আটকাচ্ছে কে? এমনকি আমার দৃঢ় বিশ্বাস চেপেচুপে বসলে শীতকালে একটা পিকনিক অবধি করে ফেলা যায়! লোকজনও দেখলাম উদার, মহৎ, সাহসী, সচ্চরিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি!

আমাদের বহুতর ডিভিশনের মধ্যে একটি ডিভিশন হলো ওয়াটার পিউরিফায়ার, শর্টে ওয়াপু। তার যিনি কাস্টমার কেয়ার দেখেন তিনিও একই অফিসে বসেন। অত্যন্ত সরল, নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এই ভদ্রলোকের একটিই বৈশিষ্ট্য, এঁর গলার আওয়াজটি জবরদস্ত। থেকে থেকেই বাজখাঁই গলার আওয়াজে আমরা চমকে চমকে উঠি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ভদ্রলোক নিজের গিন্নিকে প্রেম নিবেদন করলেও সেটা ওঁদের পাড়ার রাস্তার মোড় থেকে শোনা যায়। দশানন রাবণ খাণ্ডার রাগে রৌদ্ররসের গান গাইলে এইরকমই শোনাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মুশকিল হয় ভদ্রলোকের হিন্দি উচ্চারণ নিয়ে। মাঝেমধ্যে আমরা চমকিত হয়ে উঠি, কখনও কখনও চিন্তিত। রাষ্ট্রভাষার এতটা দুর্গতি মেনে নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে হৃদয়ে সংশয়াকুল প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে।

এই তো সেদিন শুনি খুবই উত্তেজিত হয়ে হেড অফিসে কার সঙ্গে বার্তালাপ চালাচ্ছেন, 'ব্যাটা বহুত বদমাশ হ্যায়। আপ অ্যায়সে অ্যায়সে উস ফাইলকো নেহি ছোড়নে কা, উসকা বগল মে রিমার্কস মারিয়ে, মানে বাজে রিমার্কস মারিয়ে। আরে মারিয়ে না, বগল মে খুব বাজে বাজে রিমার্কস মারিয়ে....' এইরকমভাবে খানিকক্ষণ চলার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হলাম, 'আরে দাদা, বগলে রিমার্কস নয়, ডিও মারতে বলুন, যা গরম!'

কাল আবার শুনি কাকে বলছেন, 'আরে আপ মদন স্ট্রিট যাইয়ে, কাম একদম হো যানেকা গ্যারান্টি হ্যায়। আরে মদন স্ট্রিট নেহি সমঝা, আরে মদন স্ট্রিট....'

আমরা তো স্তম্ভিত! মিত্রদা দেহ রেখেছেন বলে তো শুনিনি! নাকি দিদি পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই না দিয়ে দাদার একবারে জীবিতাবস্থাতেই একপিস ''মদন ধরণী'' উপহার দিলেন? আমাদের চিন্তাপর লোকজনকে প্রশ্নের মহাসিন্ধুতে নিমজ্জিত রেখে সারা অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই অমোঘ প্রশ্ন, 'আরে মশাই মদন স্ট্রিট নেহি জানতা, কিস টাইপকা ট্যাক্স কন্সালটেন্ট হ্যায় আপ? আরে চাঁদনির কাছে মদন ষ্ট্রীট.....'

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যাসকূট সমাধান করেন কমার্শিয়াল অফিসারটি। উঠে গিয়ে সেই মদনপথাভিমুখী ভদ্রলোকের পিঠে হাত রেখে ছলছল চোখে জানান, 'দাদা, আপনি শান্ত হোন, মদন নয়, ওটা ম্যাডান স্ট্রিট হবে!'

তবে কাণ্ডটা ঘটলো সেদিন। মার্কেট সেরে অফিসে ঢুকে দেখি সারা অফিসে শ্মশানের স্তব্ধতা। শুধু এসির শব্দ, লোকজন হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে, আর তাদের পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে, হাসিতে না কান্নায় বোঝা যাচ্ছে না। শুধু একটাই গলা শোনা যাচ্ছে, আমাদের সুভদ্র সদালাপী কাস্টমার কেয়ারিং ভদ্রলোকটির। তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সঙ্গে কোনও মহিলা কাস্টমারকে বোঝাচ্ছেন, 'আপকা একদম জল নেহি নিকল রাহা হ্যায় ম্যাডাম? আরে নিচেকা হ্যাণ্ডেল হাত লাগাকে টিপিয়ে না, টিপিয়ে। টিপতে টিপতেই আপকা পানি নিকলেগা!'

কী ভাবছন এতেই শেষ? আজ্ঞে না। এই অফিসে নমুনা কম নেই। এই যেমন ধরুন বলাই। না না, ওর নাম বলাই নয়, জাস্ট ধরে নিতে বল্লুম। একটু আস্তে ধরবেন, এই যা।

বলাই হচ্ছে, যাকে বলে আমাদের সকল কাজের কাজী।

সব অফিসেই দেখবেন এমন একটি ছেলে থাকে যার কাজ ফাইফরমাশ খাটা। যেমন এই চট করে পান এনে দেওয়া, টাইমে টাইমে চা বা কফি খাওয়ানো, একটু জেরক্স করে আনা, ফাইলটা বড় সাহেবের ঘরে দিয়ে আসা..এই আর কি। পদমর্যাদায় পিয়নের থেকে একটু নীচে, এদের ইংরেজিতে বলে errand boy।

একটু খেয়াল করলে আরও দেখবেন যে সচরাচর এরাই অফিসের সবচেয়ে কর্মঠ কর্মী হয়। এরা একদিন অফিসে না এলে ত্রাহি মধুসূদন রব ওঠে। প্রবীণ কেরানীটি প্রায়ই কাজে ভুল করতে থাকেন, নতুন এমবিএ করে আসা ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিটি কাজ ছেড়ে সুন্দরী এইচ আর অফিসারের সঙ্গে হাওয়া খেতে গিয়ে হাওয়া হয়ে যায় আর রক্তচক্ষু বড়সাহেব হাতে মাথা কাটতে থাকেন।

আমার এই সবব errand boys দের নিয়ে অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। আজ অবধি যে যে অফিসে চাকরি করেছি, দেখেছি যে এদের বুদ্ধি, স্মার্টনেস, বিনয়, কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল কোন বড় ম্যানেজারের থেকে কম নয়। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত জটিল কাজকর্ম অবধি নির্ভুল দক্ষতায় করতে দেখেছি, অথচ পড়াশোনা হয়তো এইট পাশ!

ঠেকলাম এই অফিসে এসে!

ছোকরার নাম, আগেই বলেছি, ধরে নিন বলাই। এমনিতে চটপটে ছেলে, অসুবিধা একটাই, কথাটা বড় আধোআধো বলে, প্রথমে বুঝতে কষ্ট হয়। মানে হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ পাশের হোটেলে কি রান্না হয়েছে রে?' উত্তর এলো, 'মোতার তলকালি আল তিকেন ভত্তা'। এখন প্রাকৃত পৈঙ্গলে ''পুনবন্তা'' কবি ওগগর ভত্তা খেয়ে ''কান্তা'' কে ধন্য করেছিলেন। এ যুগে আমাকে মোতার ইয়ের সঙ্গে কিসের না কিসের ভত্তা খেতে হবে ভেবে তীব্র ঘৃণা ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ি। পরে বুঝতে পারি, বেচারির সাদা মনে কাদা নাই, মোচার তরকারি আর চিকেনের ভর্তাই তো খাওয়াতে চেয়েছে!

বলাইবাবুর সময়জ্ঞান অসামান্য। একদিন হয়তো শখ করে একটু বিরিয়ানি খেয়েছি অফিসে। ভিজিটিং কার্ড দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে আয়েশ করে হয়তো বল্লুম, 'বলাই, মিষ্টি পাতা দিয়ে, কিমাম দিয়ে এক খিলি জম্পেশ পান খাওয়া দিকি বাপধন।' বাবু সন্ধ্যে ছ''টা নাগাদ এসে পানটা টেবিলে রেখে গ্যালগেলে হেস বলবেন, 'কুব বালো পান থ্যার, গলিয়াহাত তেকে নিয়ে এলাম।' এরপর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আর কিই বা করার থাকে বলুন?

আর শুধু সময়জ্ঞান কেন, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞানও প্রায় প্রবাদপ্রতিম! মাঝেমধ্যেই ঘোর বিপদে পড়তে হয়।

যেমন ধরুন উনি রোজ দুপুরে আমার কেবিনে ঢুকে অতি নম্রভদ্র ভাবে সুচিন্তিত প্রশ্ন পেশ করেন, 'আজ ছোয়াবিনের তলকালি আল দিমেল দালনা হয়েথে। পোত্তর বলা কি বলবো?'

(অস্যার্থ, আজ সোয়াবিনের তরকারি আর ডিমের ডালনা হয়েছে। প্রভু কি এর সঙ্গে পোস্তর বড়াও ইচ্ছা করেন?)।

আমি কিছু একটা বলে টাকা দিয়ে দিই, দ্বিপ্রাহরিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

মুশকিল হচ্ছে কখন কি জিজ্ঞাসা করা উচিৎ, সেটা সবসময় মহাপ্রভুর ঠিক খেয়াল থাকে না!

গত মাসের মাঝামাঝি নাগাদ টিভিএস গ্রুপের এক অত্যন্ত উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল আমার অফিসে দেখা করতে এসেছিলেন। ইস্ট রিজিওনে টিভিএস গ্রুপ ব্যবসা বাড়াচ্ছে, তারা আমাদের চায় সহযোগী হিসেবে। আমাদের হেড অফিস গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন, এখন রিজিওনাল লেভেলে চুক্তিপত্র সই সাবুদ হবে। প্রতিনিধিদলের দুজন বাঙালি একজন তামিল, এবং এই তামিল ভদ্রলোকই দেখলাম শুদ্ধ বাংলা বলেন, বিন্দুমাত্র ইংরেজির মিশেল নেই। আমাদের বোর্ডরুমে বসে মার্জিন স্ট্রাকচার, ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট,

ডিস্ট্রিবিউশন ব্লু প্রিন্ট ইত্যাদি নিয়ে ঘনঘোর আলোচনা চলছে। এই সব মীটিং আসলে একধরণের স্নায়ুযুদ্ধ। দুপক্ষই চায় তাদের দিকে বেশি বেনিফিট টেনে নিতে। টেনশনের আবহাওয়া আর কাঠ কাঠ হাসিমুখে আলাপ চালানো লোকজনদের দেখে বোঝা যাবে না যে আসলে প্রত্যেকের দুহাতে রয়েছে দুটো করে খোলা অদৃশ্য তলোয়ার।

এমন সময়ে দরজা খুলে শ্রীমান বলাইয়ের প্রবেশ। পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই গাম্ভীর্য সর্বাঙ্গে মেখে তার ঘোষণা, 'কুমলো ফুল ভাজা, ইলিথের ধোল আর আলু পোত্ত হয়েছে। আপনি কী খাবেন?'

এই ঋষিবাক্যে আমরা স্তম্ভিত! টিভিএসের রিজিওনাল হেড কথার খেই হারিয়ে আমতা আমতা করতে থাকেন। শুধু তামিল ভদ্রলোক জামার হাতা দিয়ে জিভের জলটা মুছে নিয়ে বললেন, 'ইলিশের ঝোলটাই চলুক, না কী? আর, ইয়ে ইলিশের ডিমের বড়া হবে না?'

সেইদিনই চুক্তি সই হয়, ইলিশ ভাজা খেতে খেতে।

তবে গতকাল বলাই যা করেছে, তার তুলনা নেই!

দিন দশেক হলো ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠেছি। সেই ইস্তক কিছু খেতে পারছি না, কিছু খেলেই বমি পাচ্ছে, সারা মুখ তেতো। কাল বহুকষ্টে অফিসে এসেছি। টুকটাক কাজ কম্ম করছি, ঠিক দুক্কুরবেলা ভগ্নদূতের প্রবেশ, 'আজকে হয়েথে তিকেন কছা আর লুটি....', মেনুকার্ড আওড়াবার আগেই তাকে থামিয়ে দিই, 'একটা শশা আরে একটা আপেল আনবি।' ছোকরা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আকর্ণবিস্তৃত হাসে, 'একতা তিকেন কছা, তিনটে লুটি আর একটা আপেল আর একটা থথা?'

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে থাকি। অতঃপর শ্রীমান বলাইয়ের ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হয়। 'থিক আথে থ্যার,' বলে চলে যেতে উদ্যত হয়েই আবার ফিরে আসে, 'পান আনতে হবে থ্যার?'

কপালের ঘাম মুছি। বটেই তো, একটা শশা আর একটা আপেল, এমন রাজসিক মধ্যাহ্নভোজের পর একটা পান না খেলে কি আর চলে? আপনারাই বলুন?

ঘন্টাখানেক বাদে দেখি থালায় করে সুচারুভাবে একটা শশা আর আপেল কেটে এনেছে, এক কোণে একটু বিটনুন। দেখে খুশি না হয়ে পারি না, কে বলে বলাইয়ের বুদ্ধি নেই? শাবাশি টাবাশি দিয়ে খেতে যাবো, এমন সময়, যাহ...খাবো কি দিয়ে? ল্যাপটপে কাজ করতে করতে খাচ্ছি,খালি হাতে তো খেতে পারছি না এখন!

'বলাই।'

'থ্যার।'

'তোর মাথায় বুদ্ধি কবে হবে বলবি?'

'কেন থ্যার?'

'বলি কি দিয়ে খাবো? একটা ফর্ক অন্তত দিয়ে যা। খেতে দিলে স্পুন, ফর্ক এসব দিতে হয়, সবই কি বলে দিতে হবে ভাই?'

সে তো মা কালীর মতো 'এ ম্মা, ন্যা ন্যা ন্যা' করতে করতে দৌড়..কিছুক্ষণ বাদেই একটা স্পুন আর ফর্ক এনে হাজির।

যাই হোক, কচমচ করে পিত্তিরক্ষা করে তো কাজেকম্মে মন দিলাম। প্রচুর ফোনাফুনি, ধমকধামক, মিষ্টিকথা ইত্যাদি শেষে যখন একটু ছাড়ান পেলাম, তখন দেখি সন্ধ্যে ছ'টা বাজে। কর্মচঞ্চল অফিসে। সবাই মন দিয়ে কাজে কম্মে ব্যস্ত। একটু এদিকওদিক হেঁটে দেখলাম শরীরটা টাটিয়ে গেছে। জল টল খেয়ে নিজের সীটে বসে মালুম হলো, পাচ্ছে প্রবল ক্ষিদে। স্বাভাবিক, দুপুরে প্রায় কিছুই খাইনি। অতএব অগতির গতি সেই....

'বলাইইইই'

'বলুন থ্যার।'

'নিচ থেকে ঝালমুড়ি নিয়ে আয় দেখি। শোন, বেশি করে কাঁচালঙ্কা আর বাদাম দিতে বলবি, মনে থাকে যেন। আর দেখিস তো, গরম চপ ভাজছে কি না। একটা আলুর চপ আর একটা বেগুনি নিবি।' ইত্যাদি বলে প্রফুল্ল মনে যারা তখনও ব্যস্ত তাদের বিরক্ত করতে চলে যাই। অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ভদ্রলোক নির্বিরোধী লোক, তার সঙ্গে কলকাতার ফ্ল্যাটের দাম নিয়ে খুবই চিত্তাকর্ষক আলোচনার পর এইচ আর এর কাছে যাই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতি, মোদীর বিদেশনীতি, মমতার মহরম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণ করে ব্যাপক বিনোদিত হয়ে সীটে ফিরে এসেছি, এসেই আমি স্তম্ভিত!

টেবিলে সযত্নে সাজানো থালার ওপর শোভা পাচ্ছে একটি মুড়ির ঠোঙা এবং একটি চপ। পাশে ততোধিক যত্নে শায়িত রয়েছে একটি চকচকে চামচ ও একটি কাঁটাচামচ!

এসব অবশ্য গা সওয়া হয়ে গেছে। হাজার হোক, আমারই অফিসের লোক, একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে তো হয়ই। কিন্তু ইন্টারভিউ নিতে গিয়েও যদি এরকম নমুনার সামনাসামনি হতে হয় তাহলে কীই বা বলার থাকে বলুন?

সদ্য আমাদের ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্টটি খালি হয়েছে। ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে MIS এক্সিকিউটিভ আর কি। সারা রিজিওনের সমস্ত তথ্য গুছিয়ে রাখবে, দরকার মতন অ্যানালিসিস করে সাজিয়ে দেবে, এই হলো গিয়ে কাজ। সেই পোস্টটাই খালি।অথচ সেলসে ডেটা অ্যানালিসিস ছাড়া স্ট্রাটেজি প্ল্যানিং করা আর অ্যামাজনের জঙ্গলে টর্চ আর ম্যাপ ছাড়া পোলার বিয়ার খুঁজতে যাওয়া প্রায় একই ব্যাপার।

এমন হাতি ঘোড়া কোয়্যালিফিকেশন কিছু লাগে না। থার্ড পার্টি পে রোল, হাজার পনেরো মতন মাইনে দোবো। ক্কঅত্বত্রন এ দুরন্ত নলেজ আর গ্র্যা জুয়েট হলেই চলে। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে মোটামুটি একটা নাম্বার দেখে নিই, এই পোস্টে রকেট সায়েন্টিস্ট লাগে না। আমি রকেট ওড়াবো না, ডেটা না ওড়ালেই খুশি!

তা বেশ কয়েকটি ইন্টার্ভিউ নেওয়ার পর যখন হতাশ হয়ে পড়েছি, বাঙালি জাতির অবক্ষয় তথা সার্বিক অবনতি নিয়ে একটা জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখবো ভাবছি, (আহা, বাঙালির আর কে আছে বলুন? রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, সুভাষ বাবুও ফিরলেন না, আর আমারও শরীরটা ভালো নেই!), এমন সময়ে তিনি এলেন!

ছোকরাকে প্রথম দর্শনেই বেশ পছন্দ হয়ে গেলো। চালাকচতুর চোখমুখ, বডিতে এডুকেশন আছে, ভালো ফ্যামিলির ছেলে, আর কি চাই? বাবা কোথাও একটা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, ছোঁড়া জয়েন্টে একুশশো না কত যেন র‍্যারঙ্ক করেছিলো, বাবার ক্যান্সার ধরা পড়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারেনি। দশ বছরে মাত্তর একবার চাকরি বদলেছে। কেন জয়েন করতে চাও জিজ্ঞেস করাতে সটান বলে দিলো, ''বিয়ে করেছি স্যার, বেশি মাইনে না হলে বউ প্যাঁদাবে বলেছে''। স্পষ্টতই খুশি হলুম, সত্যি কথা আমি চিরকালই পছন্দ করি, আর বউকে কে না ভয় করে চলে বলুন? আমি তো বিলক্ষণ ভয় পাই, আপনি?

আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। থাক তাহলে এখন, পরে একদিন না হয়...

যাই হোক, ব্যাপারটা বেশ পজিটিভলি ঘন হয়ে এসেছে, এমন সময় আলতো হেসে জিজ্ঞেস করলুম, ''হেঁ হেঁ, প্রিয় ফুটবল ক্লাব কি খোকা?'' ছেলে বুক চিতিয়ে বললো, ''কেন স্যার? ইস্টবেঙ্গল।''

নেহাত ইন্টার্ভিউ বোর্ডে ক্যাণ্ডিডেটকে জড়িয়ে ধরে চকাম করে হামি খাওয়াটা শাস্ত্রে মানা, নইলে ছোকরাকে কোলে তুলে চুমু খেতুম। আনন্দাশ্রু গোপনে চাপতে চাপতে বল্লুম, 'বাহ বাহ বেশ বেশ, শুনে খুশি হলুম। দাঁড়াও বাপু, আসছি।'

এই বলে বাইরে গিয়ে এইচ আর এর ভদ্রমহিলাকে এর সিভি প্রসেস করতে বলে ফের চেয়ারে এসে জুত করে বসলুম। যাকগে, শেষ পর্যন্ত মনোমত ছেলে পাওয়া গেছে ভেবে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সামনে চাইতেই দেখি ছোকরা জুলজুল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি খুব স্নেহময় স্বরে বল্লুম, 'তা ভাইটি, পাস কোর্সে বি এ করেছো তো শুনলুম, বিয়ে করে পাস করার চেষ্টায় আছো তাও শুনলুম। তা বাপু, তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট কি শুনি?'

'বাংলা সাহিত্য, আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস স্যার'

ওই যে বললাম, চকাম করে হামি খাওয়া মানা!

গদগদ হয়ে বেশ ঘনিয়ে এলাম, 'বাহ বাহ। বেশ বেশ। তা বাপু বলোতো, চর্যাপদ কোন রাজবংশের রাজত্বকালে লেখা'।

খুবই কনফিডেন্ট উত্তর এলো 'সম্রাট অশোকের সময় স্যার'।

কনফিডেন্স দেখে যে খুবই মোহিত হলুম সে বলা বাহুল্য, কিন্তু সেটা বোধহয় আমার চোখেমুখে ঠিক ফুটে ওঠেনি, ছেলে চট করে তাকিয়ে বললো, 'ওহ সরি স্যার, নন্দ বংশের সময়।'

ক্ষীণ স্ট্রে চিঁ চিঁ করে বল্লুম, ''ঠিক বলছো ভাই?''

সে ছোকরা ভারি আশ্চর্য হলো। চোখ কপালে তুলে বললো 'নয়? তাহলে কি সেই মুণ্ডু ছিলো না সেই রাজার সময়ে স্যার?'

কণিষ্ক জীবিত থাকার সময়েও মুন্ডু ছাড়াই রাজত্ব চালাতেন কিনা মনে করার প্রবল চেষ্টা চালাতে থাকি। এবং সে বোধহয় আমার মুখের দিকে চেয়ে ভাবিত হয়ে পড়ে। একের পর এক রাজত্বের নাম বলে যেতে থাকে, 'চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী? নাকি সেই পাগলা রাজা তুঘলকের সময়? নাকি আকবরের সময় লেখা স্যার? বাবর নয় তো? ও হো, সেনবংশ, হ্যা হ্যা হ্যা, মনে পড়েছে। যাশ্লা, নয়? তাহলে কি পালবংশ? নাকি....'

হুড়মুড়িয়ে প্রায় টেবিলের ওপর ঝাঁপ দিয়ে সে মহাপুরুষকে থামাই, 'আপাতত ওই পালবংশটাই থাক, পরে না হয় ভেবেচিন্তে দেখা যাবেখন, কেমন?' ভয় হচ্ছিলো, ছোকরা এরপর এগোতে এগোতে ওয়ারেন হেস্টিংস অবধি না পৌঁছে যায়!

উঠে গিয়ে মুখে চোখে জল দিই। তারপর খানিক পর এসে ফের তাকে নিয়ে পড়ি, 'প্রিয় উপন্যাস কি তোমার?'

'পথের পাঁচালী, স্যার'

চমৎকৃত হই, 'বেশ বেশ, কার লেখা বলোতো?'

'সত্যজিৎ রায় স্যার। এইটা কিন্তু আমার ভুল হতেই পারে না, এত্তবার দেখলুম'।

স্তব্ধ হয়ে থাকি, শোক আর আতঙ্কের মাঝামাঝি একটা অবস্থায়। এরপর ধরা গলায় জিজ্ঞেস করি,

'প্রিয় লেখক?'

'রবীন্দ্রনাথ, স্যার'

ছেলের গলায় যে ভক্তি ঝরে পড়ে, তার তুলনা একমাত্র পান্নালালের গলায় শ্যামাসঙ্গীত! সেই গদগদ স্বর, সেই ভক্তিরসাপ্লুত আকুতি, সেই সমর্পণের ভাব।

কিন্তু ঠেকে শিখেছি, ফলে সতর্ক হয়ে এগোতেই হয়। মেঝেতে চুরচুর হয়ে ছড়িয়ে থাকা কনফিডেন্স কুড়িয়েবাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, 'রবীন্দ্রনাথের লেখা কোন গল্পটা সবচেয়ে ভালো লাগে?'

অনেকক্ষণ সে উদাস চোখে আমার কেবিনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পর কাকেদের ওড়াউড়ি দেখেটেখে ছলছল চোখে জানায়, 'দুটো গল্প খুব প্রিয় স্যার। দুটোই খুব দুঃখের গল্প। কোনটা বলবো বলুন?'

'আহা, তুমি দুটোর নামই বলো না।'

'মহেশ আর অভাগীর স্বর্গ'।

খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকি। কানের ভিতরে উচ্চিংড়ে লাফাতে থাকে, মাথার খুলির মধ্যে রোদ্দুর রায়ের অ্যাসিড রক কন্সার্ট!

খানিকক্ষণ বাদে শরীরটা সামান্য ভালো লাগলে চোখ খুলি, গলা দিয়ে একটা হতাশা বেরিয়েই পড়ে, 'বাংলা সাহিত্যের খুবই দুরবস্থা দেখছি!'

'সে আর বলতে?' ছোকরা দেখি হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে বিপুল বেগে হাত পা নেড়ে আমাকে বোঝাতে লাগলো, 'দুরবস্থা বলে দুরবস্থা? আজকাল তো ভালো সাহিত্য আর লেখা হয়ই না স্যার। আর তার ওপর এসেছে এই এক নতুন হুজুগ, ফেসবুকে সাহিত্যরচনা! সবাই নাকি পটাপট লেখক হয়ে যাচ্ছে স্যার, সব্বাই রবীন্দ্রনাথ। আর তাও না হয় বুঝতুম, শখ হয়েছে বলে আঁকিবুঁকি কাটছিস, ওখানেই চেপে যা! ওমা, আজকাল দেখি এরা আবার বইও বার করছে স্যার, কি আস্পদ্দা বলুন দিকি! একজনকে তো বলেছিলাম স্যার, বাংলা সাহিত্যের এত বড় সর্বনাশ করছিস, বলি তোদের বাড়িতে মা বোন নেই? তেড়ে মারতে এলো! কি সাহস ভাবুন অ্যাঁ! আর তো আর, এই তো গত বইমেলায় দুটো ফিশফ্রাই খেলাম আর একটা বই দেখলাম, ''মার্কেট ভিজিট'', তা ভাবলুম সেলসের বইটই হবে, আমিও তো সেলসের লোক, কিনলুম না হয়। ওমা, কিনে দেখি গপ্পের বই! আর সে কি জিনিস কি বলবো, দু পাতার বেশি পড়া যায় না। যেমন জঘন্য লেখা, তেমন ভাষার ইয়ে, আর তেমনই কতগুলো বাজে নচ্ছার জোক্স স্যার....ওটা দিয়ে অবশ্য আমার বাড়ির ডাইনিং টেবিলটার একটা পায়া একটু উঁচু করেছি স্যার, বেশি লস হয়নি। বাংলা সাহিত্যের খুবই দুরবস্থা স্যার, এসব বইও ছেপে বার হচ্ছে..কি আর বলবো.... '

আমার একটা ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। সন্ধানে কেউ থাকলে বলবেন প্লিজ। থার্ড পার্টি পে রোল, হাজার পনেরো মতন মাইনে। মোটামুটিরকম গ্র্যাজুয়েট হলেই হবে, যেন এক্সেল খুব ভালো জানে, আর হ্যাঁ, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যেন দূর দূর তক কোনও সম্পর্ক না থাকে!

মার্কেট ভিজিট ৪

কলকাতার সেলস ম্যানেজার সুজন বলেছিলো গড়িয়াহাটের আগে পাল কোম্পানীর বড় কসমেটিক্সের দোকানের সামনেই সেলসম্যান দাঁড়িয়ে থাকবে। অনিবার্য কারনে উনি নিজে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বটে (ঝাড়ের নাম বাবাজী আর কি। অনেকেরই আমার সংগে মার্কেট করতে অসুবিধা হয় রে ভাই, বুঝি), তবে ছেলে নাকি খুবই চৌখস আর আমার কোনই অসুবিধা হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'তা তাকে চিনবো কি করে?'

'আপনি দেখলেই চিনবেন স্যার, ইউ ক্যান্ট মিস হিম (খিক খিক), তাছাড়া ও আপনাকে আগেও মীটিঙে দেখেছে, ওই বরং আপনাকে খুঁজে নেবে ঠিক'।

সেই মতন ঠিক দশটার সময় পাল কোম্পানীর সামনে দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম সামনেই কেউ বেশ বলদৃপ্ত মন্ত্রে ডাকল 'শ্যার'।

কিন্তু কাউকে তো দেখিনা রে ভাই! সকাল দশটায় গড়িয়াহাটের মোড়ে নিশি ডাকল নাকি?

মাথাটা এগারো ডিগ্রী মতন নিচে নামাতেই,

নির্ঘাত এইই সেই।

ছোকরার ডাইমেনশন দেখে বাক্যি হরে গেলো। খানিক্ষণ বাদে ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

'তোর নাম কি?'

'বাবলু মন্ডল স্যার'

'হাইট কতো?'

'চার ফুট আট ইঞ্চি স্যার'

'ওজন?'

'ঊনচল্লিশ কিলো স্যার'

চমৎকৃত হলাম। এই স্ট্রাকচারে এতো বড় লোড নিচ্ছে, কম বড় কথা নয়!

'বয়েস কত?'

'ঊনিশ, স্যার'

'চল মার্কেটে। কোন মার্কেট আজ?'

'গোলপার্ক টু প্রিন্স আনোয়ার শা বীটে কাজ আছে স্যার'

'চল'

'আমার বাইকে র পেছনে বসুন স্যার'

'ফেলে দিবি না তো'

'হি হি। না না স্যার, বসুন না'

'কবে কিনলি বাইক?'

'আমার নয় স্যার, স্টকিস রতনদার। আমি চালাই, মাঝে মাঝে মাল ডেলিভারও করি। তাছাড়া রতনদার ছেলেকে স্কুল থেকে এনে দিইই, বউদিকে বাজার এনে দিই....'

বুঝলাম। বাইক চালানোর মূলো দেখিয়ে যতটা নিংড়ে নেওয়া যায় আর কি!

'বাইক চালাতে ভালো লাগে?'

'হেবি লাগে স্যার, একদিন তো বুলেট চালালাম। ব্যাপক'।

'বুলেট চালালি কি রে? বুলেটের ওজন জানিস?'

'সাইজ দিয়ে কিছু হয় স্যার? ইনজিন কন্ট্রোল করতে জানতে হয়। একবার সাইজ করে ঘাড়ে বসে ব্যালান্স রাখলেই, ব্যাস'

সুজন ঠিকই বলেছিল, ছোকরার চোখেমুখে কথা।

'হ্যাঁ রে হেলমেট নেই কেন? পুলিশ ধরে কেস দিলে কে বাঁচাবে?'

'চিন্তা করবেন না একদম স্যার', ছোকরা দুহাত তুলে অভয়দান করলো 'আপনি আমার এলাকায় আছেন স্যার। ওসব নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না'

উরিশ্লা, এই দিলতোড় কনফিডেন্স দেখে সন্দেহ হল,

'হ্যাঁ রে, পার্টি পলিটিক্স করিস নাকি'

'ওই আর কি স্যার, হেঁ হেঁ'

'বাড়ি কোথায় তোর?'

'বারুইপুর স্যার'

মার্কেট করতে করতে চলেছি। আমার চিরকালের অভ্যেস সেলসম্যানদের হাঁড়ির খবর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করা, টুকটাক করে সে চেষ্টাও চলছে।

'হ্যাঁ রে, মাইনে কত পাস?'

'ছয় মত স্যার, ইন্সেন্টিভ নিয়ে সাত হয়ে যায় '

'বাবা কি করেন?'

'মারা গেছেন স্যার, মাদ্রাসাতে পড়াতেন'

শুনে একটু খটকা লাগলো,

'হ্যা রে, তোর নাম কি বললি যেন?'

'বাবলু', একটু চোরা ইতস্তত ভঙ্গি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বুঝল আমার আসল প্রশ্নটা কি।

ফিক করে হেসে বলল, 'আখতার মন্ডল স্যার। ডাকনাম বাবলু'।

তখনও তাকিয়ে আছি দেখে এবার একটু ম্লান হেসে বলল, 'একটু এই ধরনের নাম বললে কাজ পেতে সুবিধা হয় স্যার'।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, 'চ' 'চ', আরও সতেরোটা দোকান বাকি। বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বোন'

মানে??

'বুঝলাম না হে। শুধু বোন?'

'হ্যা স্যার, গেলো বচ্ছর আগস্টে মা মারা গেলো। এখন আমি আর বোন থাকি'।

'কবে থেকে ঢুকলি সেলসে?'

'সেপ্টেম্বর থেকে'

'পড়াশুনা করিস'

'করতাম স্যার, এগারক্লাসে উঠেছিলাম'

বুঝলাম, সবই ওই ''গেলো বচ্ছর আগস্টে'' কেস।

'বোন কত বড়? কি নাম?'

'এই তো আট ক্লাসে উঠবে। ওর নাম লক্ষ্মী', বলেই আমার দিকে ঝটিতি চেয়ে যোগ করল, 'ভালো নাম শবনম'।

'বোন লেখাপড়া করে?'

'কি বলছেন স্যার? লক্ষ্মী তো পত্যেক বছর ফার্স্ট বা সেকেন হয়। হেবি ব্রেন স্যার। গেলো অ্যানুয়ালে অঙ্কে একাশি পেয়েছে, আর ম্যাথসে সাতাত্তর'।

বুঝলাম কোথাও গুলিয়ে ফেলেছে, কিন্তু ঠিক করে বোঝাবার আগেই 'বুলেটগাড়ি খুব ছুটেছে' ভঙ্গিতে তার বাক্যস্রোত দৌড়তে থাকলো, 'ওর ইস্কুলের হেডস্যার রণেনবাবু বলেছেন ওর মাথা খুব সাফ স্যার। আমাকে বলেছেন বোন যেন লেখাপড়া বন্ধ না করে, অসুবিধা হলে জানাতে'।

এরপর বকবক চলতেই থাকলো। লক্ষ্মীর বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবচরিত্র, শিল্পানুরাগ ইত্যাদির বিবিধ ব্যাখান শুনে আমারও কেমন যেন মনে হতে শুরু করেছে যে হাফ কিলো মারি কুরির সংগে আড়াইসের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল আর পোয়াটাক লীলা মজুমদার মিশিয়ে এই স্ত্রীরত্নটি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, এমন সময় খেয়াল হল,

খিদে পেয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে।

সামনেই সাউথ সিটি। টপ ফ্লোরে মেইনল্যান্ড চায়না। কথাটা মনে পড়তেই পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি গুলো পাক দিতে লাগল। শ্রীমান বাবলুকে বললাম, 'হ্যাঁ রে, তোর খিদে পায়নি?'

'বেশি পায়নি স্যার, সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি তো।'

'আচ্ছা? কি খেলি?' হাল্কাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলুম।

'ভাত'

'ধুর শালা, সে তো শুনলাম। আর কি?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'গরম গরম ফ্যানা ভাত স্যার, নুন, লঙ্কা আর সর্ষের তেল দিয়ে। ব্যাপক লাগে খেতে'।

'বাহ বাহ, এ তো রাজভোগ রে। চল, আমার খিদে পেয়েছে, একসঙ্গে খাবো'।

ছোকরা তৎক্ষণাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক মেরে দাঁড়িয়ে গেলো, 'না স্যার, আপনি যান'

'মারবো কানের গোড়ায় দুই থাপ্পড়, চল বলছি'।

সে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে টেনেটেনে মেইনল্যান্ড চায়না অবধি তো নিয়ে গেলাম, ঢুকে দেখি বাবুর হাত পা ঠান্ডা, চোখমুখ ফ্যাকাশে, কথায় উড়নতুবড়ি ছোটানো স্মার্টনেস উধাও। জবুথবু হয়ে সীটে প্রায় সিঁটিয়ে আছে। এসব জায়গায় যে আগে আসেনি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নাহ, ছোকরা কে একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার।

একটা ক্যান্টনিজ নুডলস আর চিলি চিকেন অর্ডার দিয়ে ওর দিকে ফিরলাম।

'তুই আর বোন ছাড়া আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই?'

'চা-ইয়ে এক কাকা আছেন। '

'তিনি কিছু সাহায্য করেন না?'

ম্লান হাসল, 'বলেছিলাম। চাচী বললো ওদের বাড়ি কি এতিমখানা?'

'তোদের কি নিজেদের বাড়ি'

'না স্যার, ভাড়াবাড়ি। একটা ঘর নিয়ে দুইজনে থাকি'

ততক্ষণে খাবার চলে আসায়, বাধ্য হয়েই এই সদালাপ বন্ধ রাখতে হয়।

মাথা নিচু করে নিবিষ্ট মনে খাচ্ছিলাম, চিলি চিকেনের বৌল থেকে হাফ তুলে নিয়ে। হঠাৎ মাথা তুলে দেখি, ই কি ব্যাপার??

ছোকরা স্রেফ নুডলস খেয়ে চলেছে, চিলি চিকেনে হাত অবধি লাগায় নি।

'কি রে, চিলি চিকেন টা তোর'।

'জানি স্যার'

'জানিস যখন খাচ্ছিস না কেন?'

ফিক করে হেসে ফেলে, 'রাগ করবেন না তো? '

'না। বল'।

'এদের বললে আমার চিল্লি চিকেনটা পেলাস্টিকে করে গাডার দিয়ে বেঁধে দেবে না স্যার?'

'দেবে, কিন্তু কেন?'

'লক্ষ্মীর খুব চিল্লি চিকেন খাওয়ার ইচ্ছে স্যার। কোন্দিন খায় নি তো। ভাবছি গাডার দিয়ে বেঁধে নে যাই, রাত্তিরে দুইজনে খাবো''খন? আপনি রাগ করলেন না তো স্যার'।

গলায় নুডলসটা আটকে গেলো নাকি?

কে যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন না, কতখানি নতজানু হলে কতটুকু বেঁচে থাকা যায়?

কতখানি, ভারতবর্ষ? কতটুকু?

অথ হোস্টেল সিরিজঃ

বিধিসম্মত সতর্কীকরণঃ আমার হস্টেলজীবনের বেশিরভাগ গল্পই সেন্সরের অ্যান্টেনার অনেক ওপর দিয়ে ওড়ে। ফলে সব গুফন কথা ওপেন করে বলায় সামান্য অসুবিধা হ্যাজ। ''অশ্লীলতার দায়ে নবীন লেখককে অমুক থানায় দেওয়া হলো প্রবল কচুয়া ধোলাই,'' খবরের কাগজে এমন শিরোনাম গুরুজনেরা খুব একটা পছন্দ করবেন না বলেই বিশ্বাস। অবশ্য বলা যায় না, অনেকে হয়তো সেই আশাতেই বসে আছেন! দিনকাল তো ভাল না। তাই এখানে উল্লিখিত সব গল্পই যাকে বলে সুরুচির উপকূল ছুঁয়ে যাবে। যাদের বাজে ইয়ার্কি অপছন্দ তারা এখানেই ক্ষমাঘেন্না করে ছেড়ে দিন। আর তার পরেও যেসব মহাত্মারা এগোতে চান, মে দ্য ফোর্স বি উইথ ইউ!

শুরু করি তাহলে? জয়কালী

অথ হোস্টেল সিরিজঃ পার্ট ১

পক্ষীদের আদি পিতামহ মহাত্মা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাকি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।

নরেন্দ্রপুরে আমাদের উড়তে শেখান জনাব মন্ডল। ওনার পিতৃদত্ত নামটি চেপে গেলাম। কারণ ভদ্রলোক এখন দাপুটে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। তার ওপর এই অধমের পাশের পাড়ায় থাকেন। আর আমার ইনশিওরেন্স এর লেটেস্ট প্রিমিয়াম টা খুব সম্ভবত দেওয়া হয় নি, অতএব...

এহেন শ্রীমন্ডল সুহৃদ মহলে বাপ বলে পরিচিত ছিলেন। সঠিক কারণ দেবা নঃ জানন্তি। তবে ডাকনামটি যে আক্ষরিক অর্থে সত্য ছিলো না সে বিষয়ে আমরা অবিশ্যি নিঃসংশয় ছিলাম। সেরকম কিছু হলে খবর চাপা থাকত না।

শ্রীমন্ডল অত্যন্ত নির্বিরোধী নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন। পোচ্চন্ড গাঁজা খেতেন, রাস্তার সাইডে মাথা নিচু করে হাটতেন। কারো সাতেপাঁচে থাকতেন না। কাউকে জ্বালাতেন না, নিজেও জ্বলতেন না।

এহেন নিপাট ভদ্রলোকটি খ্যাতির মধ্যগগনে ওঠেন, যখন, নতুন বাংলার স্যার এঁকে প্রশ্ন করেন 'আচ্ছা বলত, গফুর ত মুসলমান ছিলো, তবু তার গরুর নাম হিন্দু মহেশ ছিলো কেন?' বাপ অনেক ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে জবাব দেন 'তার কারণ উর্দুতে ষাঁড়ের কোন ভালো নাম হয় না স্যার, তাই'।

আমাদের গল্প এহেন শ্রীমন্ডলের সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে রোমহর্ষক লীলাটি নিয়ে।

একদিন প্রসন্ন প্রভাতে, টেস্ট পরীক্ষা শেষে, দিকে দিকে আনন্দঘন পরিবেশ। শ্রীমন্ডল ঘুম থেকে উঠে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে স্নানে যাচ্ছিলেন। ঐতিহাসিকরা পরে সাক্ষ্য দেন যে ওইদিন উনি মালঞ্চ'র নুন শো তে 'লুট গ্যয়ি কুঁয়ারি দুলহন' দেখা মনস্থ করেছিলেন।

আমাদের হস্টেল গুলো ছিলো স্কোয়ার টাইপের। মাঝখানে খোলা ছোট্ট মাঠ। চারদিকে বারান্দা আর সারি সারি ঘর। চারটে কর্ণারে চারটে গণবাথরুম।

উনি স্নানযাত্রার রাজবেশে, মানে কোমরে একটি শতছিন্ন গামছা জড়িয়ে মন্দ মন্দ মলয় সমীরণে রাজেন্দ্রপ্রতিম আভিজাত্যে হেটে যাচ্ছিলেন।

বাপের রুমমেট ছিলেন অনীশ তালুকদার নামের জনৈক প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল এক তরুণ। তিনি তখন কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে ইয়ারবন্ধু সমভিব্যাহারে মাধুরী দীক্ষিতের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু রসজ্ঞ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে কী মনে হওয়াতে তিনি শ্রীমণ্ডলের পরিধেয় গামছাটি আকর্ষণ করে 'বাপ তোর গামছা নেবো, বাপ তোর গামছা নেবো ' বলে অত্যন্ত অশ্লীলভাবে এবং কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে।

কে না জানে, বিয়ন্ড আ পয়েন্ট সমস্ত সাধুপুরুষই ইন্টলারেন্ট। মহামতি আমির খান থেকে শুরু করে আমাদের বাপও তাই। মিনিটখানেক সহ্য করে, ঠিক যে স্টাইলে সম্রাট হর্ষবর্ধন পরিধেয় শেষ বস্ত্রখন্ডটি কুম্ভমেলার জনারণ্যে বিলিয়ে দিতেন, ঠিক সেই স্টাইলে শ্রীমন্ডল 'গামছা নিবি? এই নে' বলে গামছাটি খুলে অনীশ এর হাতে দিয়ে বাথরুমের দিকে রওনা দিলেন।

পাঠক, কল্পনা করুন। মাঠের এদিক থেকে ওদিক ধীর কিন্তু দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন এক মহাপুরুষ। এই মুহূর্তে তিনি আক্ষরিক অর্থেই দুঃখেষুঅনুদ্বিগ্নমনাসুখেষুবিগতস্পৃহ এক সন্ন্যাসী। পরণে শুধু আঙুলে জড়ানো একটা ব্যান্ডেড। আর বাঁ হাতে বালতি আর সাবান। সারা হস্টেল স্তব্ধ। বাক্যরহিত। বাই চান্স যদি কোন মহারাজ দেখে ফ্যালেন....

বেচারি অনীশের তখন আক্ষরিক অর্থেই সসেমিরা অবস্থা। তারপর শুরু হল মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। অনীশ বাপের পেছন পেছন ঘুরছে 'বাপ, প্লিজ গামছা পর'। কণ্ঠস্বরে সে কি আকুতি। বাপ পুরো সন্ন্যাসীরাজা স্টাইলে সামান্য হেসে বলছে ' তোমরা আমাকে গামছা পরতে বলছ? কিন্তু আমি যে গামছা পরতে চাইনি'। সারা হস্টেলে হুলুস্থুলু আন্দোলন। প্রায় সারা হস্টেল বাপের পেছনে হাত জোড় করে বলছে 'বাপ, প্লিজ গামছা পর'

বাপ কিন্তু ভদ্রলোক। এক কথা। জাগতিক সমস্ত প্রলোভন দুপায়ে মাড়িয়ে বীরদর্পে সে এগিয়ে চলেছে সবচেয়ে দূরবর্তী বাথরুমটির দিকে, পুরো শাহরুখ খান স্টাইলে।

শেষে কি হয়েছিল আমারও ঠিক মনে নেই।

শুধু এটুকু জানি নেক্সট এক মাস বাপকে গাঁজা-আদি জাগতিক ব্যাপারে এক পয়সা খরচ করতে হয়নি।

সেই পয়সা কে বা কারা যুগিয়েছিল সেটা এখানে বলার মতন নীচ আমি কখনওই হতে পারব না!

অথ হস্টেল সিরিজঃ পার্ট ২

আবার সে এসেছে ফিরিয়া!!!

অথ শ্রীমন্ডলের দ্বিতীয় লীলা। তবে আগেই বলে রাখি, গপ্পটা আমার শোনা। অতএব 'ইহা সত্য কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক' গোছের ডিসক্লেমার দিতে পারবো না।

জনাব মন্ডল উচ্চ মাধ্যমিকের গেরো কাটিয়ে যে ঘাটে মনপবনের নাও বাঁধেন সেটি একটি প্রসিদ্ধ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। প্রতি বছরই সেই মহাদ্রুমের শাখাপ্রশাখায় দেশবিদেশের বিচিত্র সব পক্ষীকূল বাসা বাঁধে। সেই বিশাল পক্ষীসমাজে অবশ্য শ্রীমণ্ডল জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠতে উনি বেশি সময় নেন নি। অসম্ভব গঞ্জিকাকুশলতার কারণে শ্রীমন্ডলের সতীর্থরা ওনাকে শিবজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতো।

ইতিহাসবিশারদেরা জানাচ্ছেন যে কেমিস্ট্রির প্র্যারকটিক্যালের প্রথম ক্লাসেই উনি সবার সপ্রশংস বাহবা কুড়িয়ে নেন। কোন এক নাদান ব্যাচমেট ভুল করে খানিকটা ইথার খেয়ে' বাপ, ইথার খেয়ে ফেলেছি, কি করব' জিজ্ঞেস করে ফেলায় উনি খুবই সুচিন্তিত সৎপরামর্শ দেন, 'কি আর করবি, পেছনে একটা মোমবাতি গুঁজে জ্বালিয়ে দে'। সেই থেকে খেটে খাওয়া প্রলেতারিয়েত আমজনতার নয়নের মণি হয়ে উঠতে ও প্রবল প্রতাপে রাজত্ব চালাতে বিন্দুবৎ অসুবিধা হয় নাই।

সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি যদিচ ঘটে ফাইনাল ইয়ারে।

রসিক পাঠক মাত্রেই জানেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফাইনাল ইয়ারে মনটা সদা সর্বদাই তুরীয়মার্গে বিচরণ করে। এই মলিন ধরাধামের সমস্ত নীচ দীনতা, যেমন পড়াশোনা, ভাইভা, প্র্যা কটিক্যাল, সেমেস্টার এক্সাম

এসব তুচ্ছ দিনগত পাপক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে এই ব্যাকুল হৃদয় সদা সর্বদাই 'মন হারাল হারাল মন হারাল' গাইতে থাকে।

এমন মনকেমন করা 'শোন, কোন এক দিন' শ্রীমন্ডলের রুমমেটের ভাই, সাম খোকা, এজেড এরাউন্ড এইট্টিন, দেশের বাড়ি থেকে তার দাদা ও দাদার রুমমেটের জন্যে নাড়ু বা সামথিং লাইক দ্যাট নিয়ে এক প্রসন্ন দুপুরে এসে হাজির।

ভাইটি পেরথম বার দাদার কাছে এয়েচে। দুএকজনকে জিজ্ঞেস করতেই, 'তোমার দাদা বাপের ঘরে থাকে' শুনে বেহুদ্দ ঘাবড়েছে। যাই হউক, এদিক সেদিক করে রুম খুঁজে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই ধাঁ!

সারা ঘর গাঁজার ধোয়াতে অন্ধকার। ঘরে এক্সাক্টলি কোথায় কি আছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। তাকের ওপর ওল্ড মংকের খান চারেক বোতল রাখা। চেয়ারের ওপর একটি প্লেটে বেশ কিছু নিরীহ মুরগির ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো। আর তার মধ্যে দুইদিকে দুই বিছানার ওপর মধুর মধুর হাস্যরত দুই ভুবনবিজয়ী বীর।

তখন টেবিলের ওপর একটা ডেস্কটপে শ্রীমতী সানি লিওনির একটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র চলছিল, যদিচ কোন অজ্ঞাত কারণে সাউন্ড মিউট করা ছিলো।

কিন্তু যা দেখে খোকা বিচলিত এবং পুরোপুরি কনফুজিয়া গেলো, সে হচ্ছে দুই মহাপুরুষই সম্পূর্ণত মুক্তকচ্ছ। আক্ষরিক অর্থেই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত।

ব্যাপারটা খোকার কেমন কেমন লাগল। কিন্তু হাজার হলেও দাদা, চট করে তো কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না!

যাই হক, ঘন্টাখানেক নানা রকম ভব্যিযুক্ত আলোচনার পর, জগত ও জীবন সম্পর্কে অসীম জ্ঞান আহরণের পর, ভবিষ্যতের পথে বহুমূল্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে খোকাবাবু যখন লাল জুতো পায়ে বেরোবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, শ্রীমন্ডল ঝটিতি একটা রিস্ট ওয়াচ হাতে বেধে নিয়ে বললেন, 'চ, তোকে নিচে ছেড়ে দিয়ে আসি'।

পুরো সীনটা আপনার মানসনেত্রে কল্পনা করুন পাঠক। নিরালা দুপুরে এক নির্জন করিডর ধরে হেটে যাচ্ছে এক যুবক, জকি আর টাইটান পড়ে, এক কিশোরকে এইটে বোঝাতে বোঝাতে, 'ফার্স ইমপ্রেসনটাই সব বুঝলি, আর সবসময় ফিটফাট থাকবি, একদম টিপটপ।

নিচে নেমে চলে যাবার আগে খোকা আর পারলো না, জিজ্ঞেস করেই ফেললো,

'ইয়ে, মানে আপনারা, মানে তোমরা কি মানে ইয়ে মানে সবসময় (অপাঙ্গে নিচের দিকে তাকিয়ে) এইপরেই থাকো?'

নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধদেবের মতো স্মিত হেসে বাপ বললেন,' ধুর পাগলা, তাই কখনো হয়? আজ তুই এলি বলে জাঙিয়াটা পরলাম'।

ভাইটি নাকি শুনেই এক চলতি ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠে পড়ে। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ঈষৎ স্খলিত স্বরে ড্রাইভারকে বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি চালিয়ে দাদা, সোজা শিয়ালদা, রাস্তায় কোত্থাও দাঁড়াবেন না'।

অথ হোস্টেল সিরিজ পার্ট ৩ঃ

কুষ্ঠিতে 'বিংশতি বর্ষে উচ্চস্থান হইতে পতনজনিত কারনে রক্তপাত'লেখা থাকায়, আই আই টি তে ইলেক্ট্রিকালে ভর্তি হবার পর আমার ঠাকুমা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ত'রে ল্যাম্পপোস্টে উঠতে অইব না'তো?'

না। ল্যাম্পপোস্টে উঠতে হয়নি বটে। কিন্তু ফাঁড়া একটা গেছিলো বটে। যে কোনও ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের থেকে সে জিনিস কোনও অংশে কম নয়। তার নাম হল'গে, গ্র্যা ন্ড ভাইভা।

গ্র্যান্ড ভাইভা হল গিয়ে আই আই টি খড়গপুরে একটি ভয়াবহ বজ্রপাত সহ ঝড়ঝঞ্ঝা বিশেষ। আয়লা, এল নিনো, পম্পেই, হিরোশিমা আদি সূর্যোগ এর কাছে তুশ্চু, যাকে বলে ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান। কুম্ভীপাক

নরকের সংগে সুলেইমানি দোযখ সাঁইতিরিশ বার গুন করলে সাড়ে দুই পার্সেন্ট মতন এর আইডিয়া হয়।

আপনি যখন ফোর্থ ইয়ারে একটি রসালো চাগরি বাগিয়ে, 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি সিজিপিয়ে' আউড়ে, ওল্ড মঙ্ক, হিউম্যান ডাইজেস্ট, গাঁজা, সানি লিওনি ইত্যাদি প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন সাব্যস্ত করেছেন, তখনই এই অনাছিষ্টির ডাক। অত্যন্ত সংগত কারনে আমরা এর উল্লেখ র'ফলা য'ফলা বাদ দিয়েই করতাম।

ইহা কি? রসিকা পাঠিকা, ঘাবড়াইবেন না। ইহা তেমন বিশেষ কিছুই নহে।

ধরুন কোন এক বসন্তের সোনাঝরা সন্ধ্যায় আপনার ডিপার্টমেন্টে এগারোজন প্রফেসর আপনাকে ঘিরে বসেছেন। অন্ধকার ঘর, পুরো জঙ্গলের পরিবেশ, চারিদিকে জ্বলন্ত চোখ আর খিকখিক করে অত্যন্ত অপমানজনক হাসি। সেই আতঙ্কের হাড়হিম করা পরিবেশে আপনার দিকে ইন্টারন্যাশনাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতন উড়ে আসছে অসভ্য টাইপের কোশ্চেন, আপনি লাস্ট চার বছর কি কি শিখেছেন তার সব কিছুর ওপর। মানে চার বছরে আপনার যা যা শেখবার কতা ছিল, না না উটকো ফালতু ঝামেলায় শিখে উঠতে পারেন নি, পূজ্যপাদ প্রফেসরেরর দল সেই সব হিসেব আজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবেন।

পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ বোধহয় একটু বেশি মানবিক ও সিমপ্যাথেটিক ছিলো এর থেকে।

নিজের কতা কইতে নজ্জা নাগে। শুধু এটুকু মনে আছে, ঘন্টা দুয়েকের পর ওরা যখন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে জিগাইলেন 'সরকার বাবু, আপনি তো দেখছি সেরেফ ইয়েমস্তি করে কাটিয়েছেন চার বচ্ছর। আপনাকে তো ডিগ্রীখানি পেরাণে ধরে দিতে পারচি না, গার্জিয়ান কল করতে লাগে। বাবার নাম খানি বলুন ত মশায়'। আমি পাক্কা আড়াই মিনিট চুপ থেকে বলেছিলুম 'আরেকটু সময় দিন স্যার, মনে করার চেষ্টা করছি'।

কিন্তু মহাত্মা অ্যালেক্স হেইলি মহাগ্রন্থ 'রুটস' এর লাস্ট লাইনে বলেই গেছেন, মাঝে মাঝে পরাজিতের লিখিত ইতিহাসও মহত্তর হয়ে ওঠে। আমাদের গপ্প সেই নিয়েই। ওই এক বারই, জাস্ট একবারই ঘুঘুতে আর ধান খেয়ে যেতে পারেনি পুরোপুরি, সেইটাই আপনাদের কমু''অনে।

আমাদের মেকানিকালের শ্রীমান ক্যাবলা, বুইলেন কিনা, চেষ্টাচরিত্তির করে আই আই টি তে ঢুকে পরার পর মা সরস্বতীকে আর বিশেষ ডিস্টার্ব করেন নি। উনি ওঁর মত ছিলেন, ইনি নিজের মতন। কিন্তু ভাইগ্যের লিখন খন্ডাবে কে? এক বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় বিরহী যক্ষের পত্রখানির মতই সেই নিয়তির ডাক আসিয়া পৌঁছাইল।

১৯৯৮ এর সেই শীতার্ত বিকেলে মেকানিকাল ডিপার্টমেন্টের ল্যাবে শ্রীমান ক্যাবলা যখন গ্র্যান্ড ভাইভাতে অ্যাপিয়ার হন, তখনো অপেক্ষমান উল্লসিত আটজন প্রফেসর আন্দাজ করে উঠতে পারেননি ঠিক কি ঘটতে চলেছে।

ক্যাবলা সেই আয়রন থ্রোনে অধিষ্ঠিত হতেই সমস্বরে 'হাউ ইউ আর ফীলিং টুডে ক্যাবলা?' গোছের প্রশ্ন উড়ে আসে। জবাবে ক্যাবলাসুন্দর ফেঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, যার মর্মার্থ 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়?'

এরপর ওনাকে একাদিক্রমে বাইশটি প্রশ্ন করা হয়। আঠারোটির উত্তরে উনি বলেন 'আই ডোন্ট নো'। বাকি চারটির উত্তরে বলেন 'আই ক্যান্ট রিকল নাউ'।

এর পর সমবেত খ্যাঁক খ্যাঁক খোউয়া খোউয়া র মধ্যে,

-'বাপু, তোমার সিজিপিএ কতো এখন?'

-'ফোর পয়েন্ট এইট আউট অফ টেন স্যার'।

-'চাকরি পেয়েছ?'

-'না স্যার'

-'ক্যাট দিয়েছিলে? পারসেন্টাইল কতো? '

-'সিক্সটি টু, স্যার'

(নেপথ্যে আবার সেই খ্যাঁক খ্যাঁক...)

-'জি আর ই দিয়েছিলে নাকি? স্কোর কত?'

-'১১০০ আউট অফ ২৪০০ স্যার'

সমবেত কুরুচিপূর্ণ হাস্যরোলের মধ্যে একজন জিগালেন, 'সন্টিমন্টি, এই তো তোমার নেকাপড়ার অবস্তা। জীবনে কি করবে কিচু ঠিক করেচ?

-'হ্যা স্যার, ভাবছি আই আই টি র প্রফেসর হব'।

এর পরের ঘটনার বিশদ বর্ণনা দেওয়াটা বাহুল্য। তবে এটা ঘটনা কে শ্রীমান ক্যাবলা শুধু মাত্র তাঁর নিজের ইচ্ছায় ডিগ্রীখানি পরের বছর গ্রহণ করেন। এখন হীন চরিত্রের কেউ যদি ওই ভাইভাকে এর কারণ হিসেবে দেখাতে চান, তাহলে আমি নেহাতই নাচার।

তবে ক্যাবলার কাহিনী এখানেই শেষ নয়!

শ্রীমান ক্যাবলার বাবা নিতান্ত নিরীহ বাঙালী ভদ্রলোক হলেও মা ছিলেন অত্যন্ত দাপুটে ভাটিন্ডা কি শিখণী। ভবানিপুরে কোনোদিন বাঘ বেরোয়নি, কিন্তু বেরলে যে ওনার দাপটে স্থানীয় গরুদের সংগে একই ঘাটে জল খেতো সে নিয়ে কারও মনেই কোনো সন্দেহ ছিল না। এহেন ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে স্নেহ নিম্নগামী হবার প্রশ্নই ওঠে না। আর তাছাড়া ভাটিন্ডা আর ইতালি পাশাপাশিও নয়।

ফলে ছেলের সংগে প্রফেসরদের মুলাকাতের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেয়েই, কোকিলের কুহুমুখরিত এক বসন্তের বিকেলে উনি নিরীহ হাসব্যান্ড ভদ্রলোকটিকে চুরণীতে বেঁধে, হোস্টেলে এসে হাজির।

শ্রীমান তখন হিউম্যান ডাইজেস্ট নামক একটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ম্যাগাজিন থেকে রস আহরণে কিঞ্চিৎ বিজি ছিলেন। ফলত সঙ্গত কারণেই এই অনৈসর্গিক আক্রমণের জন্যে উনি প্রস্তুত ছিলেন না। ক্ষণকালের মধ্যেই একটি হাড়হিম করা আর্তচিৎকারে আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ক্যাবলার রুম থেকে কিছু কাঠের স্কেল ভাঙার শব্দ উড়ে আসে, এবং অনতিবিলম্বে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া ক্যাবলার নিজের উইং থেকে অন্য উইংএ দৌড়, অবধারিত ভাবে কার্ল লুইসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এর ফলশ্রুতি হিসেবে অনেকটা বাধ্য হয়েই ক্যাবলাকে পরের বছর মা সরস্বতীর সংগে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আসতে হয়। ভদ্রমহোদয়াও এবার আর সম্পূর্ণ নিরাশ করেননি। টুকটুক করে, কখনো হামাগুড়ি নিয়ে, কখনো লাফিয়ে,নানান ধরনের 'টেন্স, বাট আন্ডার কন্ট্রোল' সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে ক্যাবলাকে লাস্ট সেমেস্টারের গেরো পেরিয়ে ক্যাবলা ফের এসে পড়ল সেই কালান্তক গ্র্যান্ড ভাইভার সামনে!

ভাইভার দিন সকালবেলা থেকেই ক্যাবলা ল্যাবের সামনে। যারই শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে দৌড়ে গিয়ে 'এই বল না, কি কি জিজ্ঞেস করলো' বলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সব অত্যাচারেরই লিমিট থাকে,প্রফেসরদের কোয়েশ্চেনের স্টকেরও। ফলে মোটামুটি ভাবে দুপুরের মধ্যেই ব্যাপারটা অস্নাত অভুক্ত ছেলেটির আয়ত্তের মধ্যে এসে গেলো।

সেবার প্রায় সব ছেলেকেই একটি বিশেষ প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা হচ্ছিলো। দুটি বিভিন্ন সাইজের পুলি (ঞ্চন্ডননত্রা) ওপর দিয়ে বেল্ট লাগানো সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। এর পর তাদের স্পীড, রোটেশন, রেডিয়াসের রেশিও, বেল্টের টেনশন ইত্যাকার নানাবিধ রকমফের।

ক্যাবলাও এর প্রতিটি ভ্যারিয়েশনের আনসার হৃদমাঝারে রেখে দিয়েছিললেন,কারণ সোনার গৌর যদি এবারেও উনি ছেড়ে দেন, তার ফলাফল ভেবেই ওনার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল।

ক্যাবলার ডাক আসে প্রায় সন্ধ্যে হবার মুখে।আবার সেই প্রায়ান্ধকার ল্যাব, সেই সব কুটিল কুচক্রী স্যারেরা। সমস্বরে সবাই 'পধারো মারে দেস' বলে অত্যন্ত হিংস্র উল্লাসের সংগে ওনাকে ঘিরে বসলেন।

প্রথম প্রশ্নটা ওঁরা একটু সহজই করে ফেলেছিলেন। ক্যাবলাও লুজ বল পেয়েই যথাযথ মর্যাদায় মাঠের বাইরে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেননি।

স্যারেরা সচকিত। একটু নড়েচড়ে বসলেন।

এর পর নানান ধরনের আক্রমণ। কখনো বিষাক্ত স্পিনের ছোবল, কখনো হটাৎ উঠে আসা বাউন্সার, তো কখনওবা চোরা ইয়র্কার। বেল্ট এবং পুলির প্রশ্নটির সমস্ত রকমফের জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেলো। কিন্তু ট্রু স্থিতধী পুরুষের প্রজ্ঞায়, সমস্ত হীন চক্রান্ত 'এহ বাহ্য' বলে হেলায় সরিয়ে ক্যাবলা আজ পুরো রিকি পন্টিং।

স্যারেরা চমকিত। অনেকেই পুলকিত হৃদয়ে আনন্দাশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ গতবারের ঘটনার জন্যে খুবই অনুতপ্ত ও লজ্জিত। বোধহয় কি ভাবে সেই পাপস্খালন করা যায় সেই চিন্তা শুরু হয়েছে,

এমন সময় হঠাৎ একজন চুড়ান্ত বেরসিক এক প্রফেসর জিজ্ঞেস করে বসলেন 'আচ্ছা, এইবার বলত, যদি পুলির বেল্টটা মাঝখানে ছিঁড়ে যায়, তাহলে কি হবে?'

মিনিটখানেক চেষ্টা করে ক্যাবলা ন্যায্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'এতগুলো ছেলের ভাইভা হোল, কারও বেলায় বেল্ট ছিঁড়লো না, আমার বেলাতেই ছিঁড়তে হোল?'

প্রফেসরকুল স্তম্ভিত ও হতবাক!

যাই হোক, পৃথিবীতে যে ধম্মোজ্ঞান কিছুটা অবশিষ্ট আছে বোঝা গেলো, যখন সন্ধ্যেবেলায় খবর এলো ক্যাবলা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সেইদিন রাতে হাফ বোতল হুইস্কি খেয়ে, শুধু এনসিসি বুট আর তোয়ালে পড়ে ক্যাবলার নাগিন ড্যান্স যদি আপনি না দেখে থাকেন পাঠক, আপনি জানেনেই না যে আপনি কি হারিয়েছেন!

মার্কেট ভিজিট ৫

পাক্কা তেরো বছর পর ব্যাঙ্গালোরে এসে যেটা প্রথম খারাপ লাগলো সেটা হচ্ছে ট্র্যাফিক। এর কাছে কলকাতার সি আর এভেন্যু বা মুম্বাইয়ের গ্রান্ট রোডের ট্র্যাফিক তুশ্চু। এগারো কিলোমিটার রাস্তা যেতে যদি আড়াইঘন্টা সময় লাগে, কারই মেজাজ ঠিক থাকে দাদা ??

আজ সারা সকাল ধরে একটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর এবং ততোধিক অপ্রয়োজনীয় মীটিং শেষে হোটেল রুমে ঢুকেই ঠিক করলাম ব্রিগেড রোড যাব, পাব হপিং করতে। লাস্ট এসেছিলাম দশ বছর আগে, তখন থেকেই জায়গাটা আমার ভারি প্রিয়।

ব্রিগেড রোডের ঠিক মোড়ে কাভেরী এম্পোরিয়ামে ঘোরাঘুরি করে, সত্তর লাখ থেকে এক কোটির মধ্যে দাম, এমন কিছু চন্দনককাঠের দুর্ধর্ষ মূর্তি দেখে ব্রিগেড রোডের আলোঝলমল শাইনিং ভারতের হাসিরাশি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম।

টুকটুক করে এগোতে এগোতে ইদিকউদিক তাকাতে তাকাতে রঙিন দোকানপাট, খাটো স্কার্ট পরা আফ্রিকান ললনা, চওড়া শর্টস, মেহেদিরঞ্জিত হাতের কনুই অবধি চুড়ি পরিহিত সদ্য বিবাহিত মাড়োয়াড়ি কন্যা,জিন্স টি শার্টস পরা সপ্রতিভ কেজো তরুণী দেখতে দেখতে যেখানে এসে থামলাম, সেখানে একটু জিরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি, উইমা, ব্রিগেড ডিলাইট বার (উইথ লাইভ ব্যান্ডস)।

তখন সন্ধ্যে প্রায় সাতটা। বার দেখেই গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠলো। অতএব হাসিমুখে সেখানে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

সে প্রায় মুঘলাই সিঁড়ি চড়ে ওপরে উঠেই আমি ধাঁ!!

বিশাল বড় বার। কম করে চারটে সেকশন, তার মধ্যে মাঝেরটা সবচেয়ে বড়। সেখানে এক ভূঁড়োকাত্তিক দুলে দুলে বীভৎস বাজে সুরে 'চুপকে চুপকে রায়ায়াত দিন, আঁসু বহানা ইয়াদ হ্যায়' গাইছে।

আমি বাঁদিকের দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লাম।

ঢুকেই চোখটা ধাঁধিয়ে গেলো। সাউন্ডপ্রূফ বোঝাই যাচ্ছে, কারন বাইরের আওয়াজ কিছু কানে আসছে না, আর খুব আলতো সুরে ''মোরা সাঁইয়া মোসে বোলে না'' গান বাজছে স্টিরিও তে।

হাতড়ে হাতড়ে, আবছা ধীরলয়ে ঘুরে যাওয়া, হালকা সাইকোডেলিক আলোর বিভ্রম সৃষ্টকারী আলোআঁধারির মাঝে এসে একটা টেবিলে এসে বসলাম।

সংগে সংগে ওয়েটার এসে দাঁড়াতে আমি রেটকার্ড না দেখেই অর্ডার দিলাম দুটো লার্জ ব্লেন্ডার্সের।

খানিক পরে চোখটা সামান্য আঁধার সয়ে আসাতে খেয়াল করলাম আমার পাশের টেবিলে দুটি মেয়ে বসে বিলক্ষণ হা হা হি হি করছেন।

আমি প্রথমে পাত্তা দিই নি। কিনতু কিছু কথা কানে যাওয়াতে কান দুটো উদগ্র রকমের অসভ্য হয়ে উঠলো। যা বুঝলাম, তা হল

১) দুজনেই বাঙালি। সে তো সফটওয়ার পারদর্শী অনেক বঙ্গললনাই এখানে আছেন। আলাপ জমাবো নাকি? সন্ধ্যেটা না হয় চমৎকার কেটে যাবে?

২) যেটা খটকা লাগলো সেটা হল দুজনের উচ্চারণ। শহুরে কলকাত্তাইয়া মার্জিত বাঙলা আর গ্রাম্য মিষ্টি বাঙলার মধ্যে অনেক পার্থক্য, যেটা শুনেই বুঝতে পারছিলাম। তাছাড়া সেলসের কাজে গত দশ বছর বিবিধ জায়গা পরিভ্রমণের ফলে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু ডায়ালেক্ট চিনতে শিখেছি। সেই জ্ঞানে বুঝনু যে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি অবাঙালী, খুব সম্ভবত বিহার বা ইউপির এবং দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত

এলাকার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকাতেই এই ডায়ালেক্ট বা কথ্য ভাষার টান শোনা যায়।

এই উচ্চারণের কোন বঙ্গললনা বেঙ্গালুরুতে সফটওয়্যারে কাজ করলে আমি সত্যি খুব খুশি হতাম, সোশাল আপলিফটমেন্টের জাগ্রত নমুনা দেখে, কিন্তু আমার ষষ্ঠ ঈন্দ্রিয় বলছিল ডাল মে সামথিং প্রচন্ডরকমের ব্ল্যাক তো হ্যায়! তাছাড়া এনাদের হাহাহিহি ঠিক আমার চেনাশুনা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুনিদের হাসিঠাট্টার সংগে মিলছিল না, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো নয়ই।

সে যাই হোক, প্রথম পেগটা এসে পড়াতে আমি হাল্কা চুমু দিয়ে ফেসবুক দেখছি, এমন সময় দীর্ঘাঙ্গী কন্যেটি হাল্কা হাস্কি স্বরে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, 'থোড়া ইধর ভি দেখিয়ে জনাব, মোবাইলমে কেয়া রাকখা হ্যায়?', সংগে একটি বিলোলমদির মক্ষীরানি মার্কা হাসি।

আমি প্রথম রাতেই বিল্লি মারতে অভ্যস্ত, ঘুরে দাঁত কেলিয়ে বললাম, 'আরে, আপনারা বাঙালি নাকি? বাহ বাহ'।

দুইজনেই একটু থমকে গেলেন, স্থূলাঙ্গীটি একটু কাষ্ঠ হেসে হিন্দি ঘেঁষা বাংলায় বললেন, 'আপনিও আমাদের মতুন বংগালি নাকি?'

আমি দাদা, সেলসের লোক, দরকার থাকলে যে কোন পাবলিককে নিজের পছন্দসই দূরত্বে রেখে বা কাছে টেনে আলাপ জমানোটা আমার পেশাগত দক্ষতার মধ্যেই পড়ে। আমি ভারি উৎসাহ ভরে ওদিকে ঘুরে কান এঁটো করা হাসি দিয়ে বলি 'আলবাত। আপনারা কোথায় থাকেন? কি করেন?'

দুজনেই সন্দিগ্ধভাবে একে অন্যকে দেখে নেন। তারপর আমাকে ঠিক একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

আমি সত্যি কথাই বলি। আমি কে, কি, কেন, হোয়াই ব্যাঙ্গালোরে টুডে, সওব।

দুজনেই একটু আড়ষ্টতা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করেন। দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণা রমণীটি একটু ভেবে বলেন, ওনার নাম নেহা। স্থূলাঙ্গীটি জানান যে ''হামার নাম পূজা আছে''।

দুটো নামের গা দিয়েই পাক্কা মিথ্যে মিথ্যে গন্ধ বেরচ্ছিল। কিন্তু কিছু বললাম না। সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

'আপনার?' - নেহা

'আমার বাড়ি দমদমে'

'আপুনি কি কাজ করেন?'- পূজা

'সেলসএ আছি ম্যাডাম। সারা দেশ ঘুরতে হয়'।

লক্ষ্য করলাম ''ম্যাডাম'' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও একটা ম্যাজিক ঘটে গেলো, দুজনেই একটু প্রীতিসহকারে সহজ হলেন।

'আমার বাড়ি নৈহাটিতে' - নেহা

'হামি...উমমম, পার্ক সার্কাসে থাকি'। - পূজা

এটাও মিথ্যে পাক্কা, কিন্তু ততক্ষণে আমার ভেতরের ফেলুদাটি হাসিমুখে বলছেন 'ধৈর্যং রহু'।

আমি অযাচিতভাবেই একটু বাগাড়ম্বর করি। নিজের চাকরি সংক্রান্ত ঝামেলার কথা বলি, মেয়েকে নিয়ে নাজেহাল হবার গল্প। আমার দওশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ''ফালতু'' মোবাইল কিনে ঠকে যাবার গল্প।

এনারাও কিছু সহজ হতে শুরু করেন। তখন আমিও জিজ্ঞাসা শুরু করি,

'আপনারা কি করেন এখানে?'

পূজা জবাব দেয় ''হামরা এখানে বিউটি পার্লারে কাজ করি''।

আমি মুখে হাসিটা টেনে রেখেই সটান জিজ্ঞেস করি, 'তা এখানে সন্ধ্যেবেলা কি করছেন দুজনে? রোজই কি আসেন? টেবিল তো পুরো খালি দেখছি'।

নেহা ফাজিল হেসে বলে 'ধুর, ও মিথ্যে বলছে। জানেন আমরা কি করি? পেছনের দিকে তাকান'

তখন অল্প আলোতেই দৃষ্টি চোখসই হয়ে এসেছে।

এর আগে ওদিকে, মানে বারের একদম পেছন দিকে, যাকে বলে আলো আঁধারির সীমানা ছাড়ায়ে, কিছু যুবকযুবতীর কলোচ্ছল হাসিতরঙ্গ ভেসে আসছিল বটে, এবার ওদিকে তাকিয়ে কারণটা সুস্পষ্ট দিবালোকের মতনই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

প্রতি টেবিলে একেকজন পুরুষ একেকজন নারী নিয়ে ব্যস্ত। সেই সব নারীদের চেহারাছবিও এই আমার সমীপবর্তিনী দুই মহীয়সীর মতনই!!

আর ''ব্যস্ততার'' কি বর্ণনা দেবো? হে শেয়ানা পাঠক/ পাঠিকা, সময়কালে কি আপনারা নিজ নিজ নিষ্পাপ মহিলা/ পুরুষ বন্ধুদের সহিত, সেই যৌবনতাড়িত দিনে, সবচেয়ে খাজা সিনেমাগুলির মর্নিং শো''তে সর্বোচ্চ সারির একদম কোণার দিকের সীটগুলি বুক করে ঘনিষ্ঠতম আদিম আকাঙ্ক্ষা গুলির খবর নেননি??

পার্থক্য এই যে, এখানে এই আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ বড় ঘৃণ্য। বছর ষোলর রাহুল বছর পনেরোর সালমার বুকে থরথরকম্পিত হাত রেখে ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে ইলেক্ট্রিক শকসম একটি চুম্বন করিলেন, সে বড় ভালো।

কিন্তু এখানে বছরপঞ্চাশের একটি পারভার্ট আধবুড়ো একজন বছর কুড়ির মেয়েকে হিংস্র বুভুক্ষু দানবের মতন চটকাচ্ছেন, আরও অস্থানে কুস্থানে হাত ঢোকাচ্ছেন , সেটা হজম করা একটু ইয়ে লাগে প্রথম দর্শনে।

চোখ সরিয়ে এদিকে আনলাম। দ্বিতীয় পেগে চুমুক মেরে ভাবছি কেসটা কোনদিকে যাবে, এমন সময়ে নেহা বললেন, 'আপনার পাশে বসবো নাকি? দশ মিনিটে পাঁচশো টাকা নিয়ে থাকি। আপনি দেশের লোক, না হয় পনেরো মিনিটই থাকবো, হি হি হি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কত কি যে করে যেতে হয়, পেটে খিদে পেলে।

মৃদু বললাম 'না না ম্যাডাম, আমার ওসবের শখ নেই, আমি শুধু মদ খেতেই এসেছি'।

দু কন্যেই চুপ করে গেলেন। অন্তত বাহ্যিক দিক দিয়ে। নেহা জিজ্ঞেস করলো (আর আপনি আপনি বলতে পারছিলাম না কেউই)

'তোমার বাড়িতে কে কে আছে?'

'মা, বাবা, মেয়ে, বউ। তোমার?'

'মা বাবা, বোন, ছেলে'

ছেলেই শুধু? হাজব্যান্ড নেই? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভারি সংকোচ হচ্ছিল।

এমন সময় পূজা খেঁকিয়ে উঠলো,'তোর মর্দের নামটা লিচ্ছিস না যে?'

নেহা কি একটু অপ্রতিভ হল? খানিকক্ষণ চুপ থেকে জানায় যে ওর ''মরদ'' ব্লাড ক্যান্সারের রুগি। ঠাকুরপুকুরে আছে দু বছর।

খানিকক্ষণের নৈঃশব্দ।

আমার যা স্বভাব। সুযোগ পেলেই লোকজনের ইনকাম, লাইফস্টাইল, স্পেন্ড প্যাটার্ন, সোশিও ইকনোমিক চয়েস, ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল এসব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করা আমার অভ্যেস। এই স্বভাবের জন্যে সমাজের বিভিন্নস্তরে কিছু চিত্তাকর্ষক রুজির বন্ধু আছে আমার। আমি থার্ড পেগের অর্ডার দিয়ে হাসি মুখে কাজে লেগে পড়ি।

পূজাকে নিয়েই পড়লাম, 'তুমি কতদিন আছো এখানে?'

'তিন বোছর হোবে'।

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'তাইজি'

মানে? আর কেউ নেই?

নাহ। অসুস্থ জ্যেঠিমা ছাড়া ভদ্রমহোদয়ার তিনকূলে আর কেউ নেই।

এইবার খাপ খুললাম, 'ইয়ে, তোমাদের কি রকম রোজগারপাতি হয় এই কাজ করে?'

সমস্বরে উত্তর এলো 'ডিপেন্ড করে'।

আহ। সে তো বুঝনু। কার ওপর কি কতটা ডিপেন্ড করলে কতটাকা হাতে আসে ভাই? অন অ্যান অ্যাভারেজ?

আবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, পেটে প্রায় বোমা মেরে জিজ্ঞেস করে যা জানতে পারলুম, রোজগার প্রতি মাসে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোন কোন মাসে স্পেশাল মুর্গি / কাস্টমার পাকড়াও করতে পারলে ওটা সত্তরও হতে পারে। আর যে বুদ্ধু মেয়ে দিওয়ালি আর ''ফাসট জানুয়ারি'' মাস দুটোতে কম সে কম দেড় লাখ টাকা কামায় না, তার এ লাইনে থাকা না থাকা সমান।

এবার আড়াই পেগ মেরে দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা বাড়ি যাও? বছরে কবার?'

'তা দাদা, বলতে গেলে, উমম (দাদা বলেছে শুনে, সত্যি বলছি, খুউব ফ্রি লাগলো নিজেকে) এক দুবার তো যাইই'।

'কিসে যাও?'

'ধরো টেরেনে বেশিরভাগ সময়েই। মাঝেসাঝে ফেলাইটেও যাই'।

'একাই থাকো? খাবার কোথায় খাও?' (নিজেকে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মনে হতে থাকে এর পরে।)

'তিনচারজন মিলিয়ে থাকি দাদা। ধরো বারো হাজার টাকা ভাড়া দিইই। বাঁধা মাসি আছে, রান্না করে দিয়ে যায়।'

'উইকেন্ডে কি করো?'

দুই জনেই হেসে গড়িয়ে পড়লো, 'আমাদের আবার ছুটি কি দাদা, সনিরোব্বারেই তো বেসি কাস্টমার আসে। তখনি তো নগদাপাত্তি কিছু পকেটে ঢোকে দাদা। ছুটি বলতে, ধরো পোনরো আগস, কি গান্দি বাড্ডে, এই আর কি'।

পরের প্রশ্নটা করতে খুবই ইতস্তত করছিলাম বটে, শেষে করেই ফেললাম, 'তোমাদের, ইয়ে, আর কোন, মানে, ইয়ে আর কোন ইনকামের রাস্তা আছে? মানে, ইয়ে, এইসবের থেকে একটু এগিয়ে?', জিজ্ঞেস করে একটা বোকা বোকা ক্যালানে মার্কা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখি।

দুজনেই প্রশ্নটার মানে বোঝে, ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে হাসে। স্পষ্ট স্বরে, চোখে চোখ রেখে বলে ওঠে, 'সবই তো বোঝ দাদা। ওই ধরো সেখান থেকেও আরও বিস পচ্চিস হাজার হয়। পার শট পাচ নিইই। মাসে চারপাচটার বেসি কাজ করি না'।

এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছি বলে বললাম, 'কিছু খাবে নাকি?'

শোনা মাত্র শিকারি বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় ওয়েটার এগিয়ে আসে, বুঝতে পারি

(১) ইনি বাঙলা বোঝেন ('জোয়ন্ত দা কিস্নমগরের লোক'), এবং

(২) এই সাকীদের যে খাদ্য পাণীয়ের অর্ডারটা আসে, সেটাও একটা উপার্জনের রাস্তা বারের পক্ষে, হয়ত মত্তাবস্থায় ক্যাবলার অর্ডার করানো একই তন্দুরি চিকেন সংগিনীটির ইশারাতে ডাবল দামে পরিবেশিত হয়।

নেহা আমার দিকে চোখ ফেরায়, 'তুমি তো বসলেই না। ফ্রিতে আমরা কিন্তু কিছু খাই না।'।

আরে ধুর। কি জ্বালা, 'না না এমনি বলছি। কিছু খাবে?'

দুইজনে চোখাচোখি করে। তারপর পূজা হেসে বলে, 'ঠিক আছে, জোয়ন্তদা, দুটো সুইট লাইম সোডা নিয়ে এস। নর্ম্যাল'।

'নর্ম্যাল মানে'?

দুজনেই দাবড়ে দেয়, 'তোমাকে বুঝতে হবে না'।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করি,

'এখানে কজন মেয়ে কাজ করে?'

'তা ধরো পনেরোষোলো জন'
'এরা কোন কোন স্টেট থেকে আসে?
দুজনেই চুপ।
'কি হল'
অনেক্ষন পরে জবাব আসে, 'আর্ধেক আসে বিহার আর কোলকাত্তা থেকে, বাকি আর্ধেক বাংলাদেশ থেকে'।
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। ইস্ট ইন্ডিয়ার মেয়েরা এতই সস্তা নাকি?
এবার শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমাদের নাম গুলো ভুল বলেছ, তাই না?'
দুজনেই একটু বোকা বোকা হাসি দিয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, ততক্ষণে এসে যাওয়া স্যুইট লাইম সোডাতে চুমুক দিতে থাকে, এলোমেলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে 'তোমার মেয়ে কত বড়?' 'ওলে বাবা' 'কোন ক্লাসে পড়ে?' 'খাওয়া নিয়ে ফালতু ঝামেলা উমেলা করে না?'
ততক্ষণে আমারও তিন পেগ শেষ, নেশা পুরো টঙএ চড়ে বসেছে।
আলো আরও আঁধার হয়ে এসেছে, উচ্চস্বরে গান বাজছে, 'হায় হায় জওয়ানি লে ডুবি', সন্ধ্যে হয়ে উঠেছে আরও মদির মাতাল, আগত রাত্রির পরতে পরতে পাপ বুনে দিচ্ছে তার শোষণের দীর্ঘমেয়াদি ইতিহাসের কালিমা।
অন্ধকার টেবিলের চারিদিকের সাইকোডেলিক আলো আর বেআইনি ধোঁয়াতে দুনিয়াটা পুরো সুররিয়ালিস্টিক হয়ে উঠেছে,
এমন সময় পূজার ডাক এলো, হুমদো বঙ্গভাষী ওয়েটারটি পূজার কানে কানে কিছু বলতেই, কন্যেটি মাথা নামিয়ে দু টেবিলপরে একটি মাঝবয়েসী পুরুষের পাশে কোলঘেঁষে বসে বিনা কারণেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।
আমারও নেশা তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। তবুও ওয়েটারকে আরেকটা স্মল পেগ অন রক্স দিয়ে যেতে বললাম
মাঝবয়সী পুরুষটি যেভাবে জড়িয়ে, চটকে, জামার নিচে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ভোগ করা শুরু করলো, তার একটাই তুলনা মাথায় আসে, হরিণীর মাংসখন্ড পেয়ে হিংস্র হায়েনার ভোজনউল্লাস!
আপনা মাংসে হরিণী বৈরী? সত্যি? কাহ্নপা ভুষুকপা এনারা কি শিকারি শ্বাপদ দেখেননি?
সব দোষ শুধু ক্ষুধার্ত হরিণীরই?
তখন নেশার তীব্র বিষে আমার শরীর বেপথু ও চেতনা উন্মার্গগামী। সামনে বসা নেহার হালকা হাসিমুখটুকু অবধি মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে আসছে। সমস্ত ঘর জুড়ে জেগে উঠেছে মাদকতাময় মায়াবী আলোর বিভ্রম, লাউডে মিউজিকে বাজছে নেশালু গান, 'জানু, আজ রাত কা সীন বানা দে'
এমন সময় দুটেবিল পরে পূজার চোখে চোখ পড়লো।
আমার দিকেই আবছা হাসি দিয়ে চেয়ে আছে সেই মেয়ে, বিহারের কোন অজ্ঞাত গ্রাম থেকে বেঙ্গালুরুতে শরীর বিক্রি করতে আসা সেই মেয়ে, মাথা শক্ত করে তাকিয়ে আছে সে, একটা নোংরা হাত, তার জামার নিচ দিয়ে বুকের ওপর খেলে চলেছে হিংস্র উল্লাসের সংগে , একটা সাপের মতন দীর্ঘ লোলজিহবা গাল আর কান চেটে দেয় তার। হাসি মুখে বিহারের সেই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মেয়ে আমার চোখে চোখ রেখে থাকে, সেই হিংস্র জিহ্বা শুষে নেয় আমাকে দাদা বলে ডাকা সমস্ত অসহায়তা টুকু...
পাঁচশো টাকায় দশ মিনিট ভোগ করা যায় জ্যান্ত নারীমাংস! মানুষ এত সস্তা?
অনেক ছোটবেলার বাজারে দেখা একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেলো, একটা কচ্ছপকে উল্টো করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, সে হাত পা ছুড়ছে, আর একটু একটু করে তার বুক থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে মাংস কেটে শালপাতায় খদ্দেরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কচ্ছপের জান বলে কথা!

মৃতপ্রায় কচ্ছপের বুক কেটে তুলে আনা টাটকা তাজা মাংস, কখনো খেয়েছেন কর্তা?

প্রায় নীট হুইস্কি কাঁচাই গলাধঃকরণ করি। সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে আসে নেহার মুখ। স্খলিত স্বরে জিজ্ঞেস করি 'কেন কর এসব? ভালো লাগে করতে? আর সত্যি করে বলতো তোমাদের কি নাম?'

বিল আসে, ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চিং মেশিনও। নেহা চুপ করে থাকে, বুঝি যে জবাব টা আমাকেই দেবে শুধু।

ক্লান্ত নেশাজর্জরিত হাতে পাসওয়ার্ড টাইপ করি মেশিনে,কার্ড ওয়ালেটে রাখি, দরাজ টিপস গুছিয়ে দিই বিলের ভাঁজে।

ওয়াটার স্পষ্টতই খুশি হয়, মাথা নুইয়ে দরজা খুলে ধরে।

চলে আসবো, টেবিলের ওপার থেকে উঠে দাঁড়ায় সেই মেয়ে, আমার কানে এসে ফিসফিস করে বলে, 'আমার নাম তবাসসুম দাদা, নেহা নয়। আমি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছি'।

টলতে টলতে ভাবলাম একে কি বলবো, এও কি আমার মতনই উদ্বাস্তু?

স্খলিত পায়ে সেই মুঘলাই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াই। বাংলাদেশ থেকে আসা সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি সাবধানে ধরে ধরে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে আমাকে, ব্রিগেড রোডের উচ্ছল হাসিআলোর মাঝখানে আমাকে ছেড়ে দেয়, সস্নেহে বলে 'সাবধানে যাবে'।

আমি ঘুরে দাঁড়াই, জিজ্ঞেস করি, 'এসব কাজ কেন কর বললে না যে?'

'কি বলবো দাদা, বরের ক্যান্সার আছে, শুনলেই তো। বম্বেতে টাটায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। অনেক টাকা লাগবে দাদা, তুমি বুঝবে না'।

এই বলে বিষন্ন আলোয় সেই বাংলাদেশ, আমার চেতনার সাড়ে তিনহাত ভূমি, আমার সবটুকু মাড়িয়ে উঠে যায় নতুন খদ্দেরের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে।

টলতে টলতে একটা অটো ধরি, সীটে বসে শরীরটা এলিয়ে দিই, শ্রান্ত মগ্নচৈতন্য জুড়ে বাজতে থাকে ''কেন চেয়ে আছো গো মা, মুখপানে..''

আমার ভ্যালেন্টাইন

ভ্যালেন্টাইনের দিন আমার কাছে বড়ই দুঃখের দিন, বেদনার দিন। এই দিনটা এলেই আমার শক্তি চাটুজ্জের কথা মনে পড়ে যায়, সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়। আক্ষরিক অর্থেই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে। গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে, পেটের মধ্যে প্রজাপতির ওড়াউড়ি।

মোটমাট দিনটাকে আমি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চাই।

কী জিজ্ঞেস করছেন? ভ্যালেন্টাইন দিবস নিয়ে আমার পুরোন বেদনাটা কী?

সত্যি শুনবেন? আচ্ছা শুনুন তবে।

সভ্যতার ঊষাকালে আমার একটি গার্লফ্রেন্ড ছিল। উঁহু, এতেই এত ফিক ফিক করে হাসার কিচ্ছুটি হয় নি। আপনাদেরপুরো ষোল আনা ইয়ে থাকতে পারে, আর আমার নয়া পয়সা টাইপের একটা গার্লফ্রেণ্ড থাকলেই দোষ?

তিনি ছিলেন এইটে জেনে রাখুন ব্যস।কবে কোথায়, কীভাবে এসব বেত্তান্ত জেনে কাজ নেই। তিনি আপাতত সোয়ামী নে'', চুন্নুমুন্নু নে'' সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করতিছেন, তাতে আপনাদের এত নজর

ক্যান বাপু? এসব আমি মোটেও জানাব না, পাব্লিক ঠিক ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড ধরে পৌঁছে যাবে।

যাই হোক। আমার এককালে একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের একটি বান্ধবী ছিলেন। পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁকে আমি জোটাইনি। তিনিই আমাক জুটিয়েছিলেন। মানে সচরাচর যা হয়ে থাকে, ছেলেরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রীতিমতো সাধ্য সাধনা করে রমণীরত্ন লাভ করে থাকে।আমার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটে নাই। আমি যাকে বলে কোনদিনই ত্যামন বলিয়ে কইয়ে স্মার্ট ছিলাম না (পাশ থেকে গিন্নি বলছেন এখনওনই, হবেও বা!) ফলে আমি সেই বন্ধুদের টপাটপ প্রেমে পড়া, স্কুল কেটে সিনেমা দেখতে যাওয়া এসবদেখে, ঈর্ষায় সবুজ হয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন এক বসন্তদিনে তিনি 'শুনলাম ফাঁকা আছ, আমার সদ্য থার্ড ব্রেকআপ হয়েছে, আপাতত ফ্রি আছি। ইন্টারেস্টেড?' বলে কোলের পাশে জমাটি করে বসলেন।

এই করে আমার প্রথম প্রেমের যাত্রাশুরু।

এখানে বলে রাখা ভালো, মহিলা মানুষ হিসেবে অতি চমৎকার ছিলেন।অত্যন্ত মারকুটে হওয়া ছাড়া আর কোনও দোষ ছিল না। শুধু ইংলিশ মিডিয়ামের ধারালো স্টুডেন্ট বলে কেবলই ঝাঁইঝাকানাকা ইংরেজি গানা শুনতেন।আর মাঝেমধ্যে আমি প্রেমেন মিত্তির কি সুধীন দত্ত আওড়ালে সামান্য বেজার হতেন এই যা। তবে তেনার দৌলতেই প্রথম বব ডিলান শুনি। তিনিই আমাকে প্রথম শোনান বীটলস। আর শুনি ব্যাকস্ট্রীট বয়েজ, এম এল টি আর, বয়জোন, এবং স্করপিয়ন।

যাগগে যাক, সেই সুনয়নী তন্বীটির নাম ছিল, সোমা। আগে পরেও কিছু ছিল বটে। তবে বুইতেই পারছেন যে, সেসব আমি সেন্সরের কাঁচির ওইপারে ফেলে এয়েচি।

যাই হোক, শ্রীময়ী সোমার সঙ্গে আমার একমাত্র অমিল ছিল একটা জায়াগাতেই। তিনি ছিলেন উচ্চতায় চার ফুট এগারো ইঞ্চি, ওজনে চল্লিশ কিলো খানেক, আর আমি? নিজের মুখেআর কি বলি, মানে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি তখনই আশি তে এসে গেছি আর কি, আর উচ্চতাখান তো দেখেছই। জোরে হাওয়া দিলে তিনি বেশ করে আমাকে অঁকড়ে ধরতেন।না না, প্রেমের আবেশে নয়, স্রেফ ভয়ে! উড়ে যাবার ভয়ে! সেই থেকেই 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' বা 'পাগল হাওয়া' কিংবা' আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম' গোছের যাবতীয় ঝঞ্ঝাসঙ্গীত আমার ভারী প্রিয়।

যাই হোক, সেবার আমাদের মোটামুটিরকম প্রেমের বেশ বয়েস হয়েছে, এই ধরুন মাস্ট আটেক এমন সময় এলো সেই কালান্তক ভ্যালেন্টাইন ডে।

তা সক্কাল থেকে মাঞ্জা টাঞ্জা দিয়ে বেরিয়েছি, লতুন জিন্স, লতুন পাঞ্জাবি। বন্ধুর কাছ থেকে পারফিউমের বোতল চেয়ে প্রায় আদ্দেকটা গায়ে ঢেলেছি। সে ছোকরার আবার সদ্য ব্রেকআপ হয়েছে। ফেব্রুয়ারির এমন মন উচাটন বসন্তদিনে সকাল থেক টেপ রেকর্ডারে লুপে 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে' শুনছে। আমার সাজ পোষাক দেখে মোষের মতন ফোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গাঢ় গলায় বললো 'মনে রাখিস ভাই, ভালোবাসা মানেই কিন্তু প্রবঞ্চনা। কবি বলেছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস মারানো চাপ।'

আমি অবশ্য এসব পাত্তা দিইনি। দেওয়ার কথাও নয়। দাড়ি কেটে গাল দুটো বেশ চকচকে। মোকাসিনটাকে আগের দিনই মুচিকে দিয়ে বেশ পালিশ করে এনেছি।শ্যাম্পু করে চুলটায় বেশ একটা উদাস কবি মার্কা জেল্লা এসেছে।

এসব পরেটরে সোজা পার্কস্ট্রীট। না, কিছু কেনার ছিলো না, কিন্তু তিনি সেখানেই দাঁড়াতে বলেছিলেন। তা পাক্কা একঘণ্টা বাদে তিনি উদয় হলেন, লাল কালোতে মেশানো একটা মারকাটারি অফ শোল্ডার ড্রেস (গুরু মুজতবা আলির ভাষায় দেরেশি) পরে। আহা, সমস্ত পার্কস্ট্রীট যেন ক্যায়াবাত ক্যায়াবাত করে উঠলো। তিনি এলেন, এসেই আমার পোশাক দেখে মন্তব্য করলেন 'মোস্ট অর্ডিনারি গাঁইয়া ড্রেস', তারপর হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে বললেন, 'চলো'।

আমিও গলাটা প্রেমে আবেগে ভালোবাসায় গাঢ় করে বল্লুম' কোথায়?'

'হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে'।

বুঝতেই পারছেন মনের কি অবস্থা। গাঁইয়া ড্রেস বুইলুম, তাতে শপিং মল এ চল লো সখী, নতুন দেরেশি কিনবো না হয়। ডাক্তার ক্যানে?

প্রকাশ পেলো তেনার হাতে কিছু স্কিন প্রব্লেম দেখা দিয়েছে কদিন থেকে, ডাক্তারি পরিভাষায় ইহাকে বলে সোরিওসিস। অ্যালোপ্যাথিতে নাকি ইহার ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক হয় না।অতয়েব তেনার কালেজের জনৈকা আগরওয়ালা পদবীধারী বান্ধবীর দিদি, যিনি নাকি হুমোপ্যাথিতে সাক্ষাৎ চরক কি সুশ্রুত, তেনাকে দেখাতেই ম্যাডাম এখানে এসেছেন। পার্ক স্ট্রীটের আশেপাশের কোন একটা গলিতে সেই অশ্বিনীকুমারীর নন্দনকাননটি!

যাই হোক, সেই বান্ধবীর দিদির সকাশে তো দেখা হলোই। 'মাই গুডনেস সোমা, ইউ আর লুকিং সো মাচ প্রিটিইই' বলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ভব্য আদানপ্রদানের পর আমাদের বসতে বলা হলো। তিনি তাঁর বরতনুটি গুছিয়ে স্থাপন করলেন, আমি আমার বপুটি থপ করে রাখলাম।আমার পরিচয় করানো হলো 'স্পেশাল ফ্রেন্ড, ইউ নো, হি হি হি হি' বলে। যাগগে যাক।

তা হুমোপ্যাথির সওয়াল জবাব বড় কড়া শুনেছি আদ্ধেক হুমোপ্যাথ ডাক্তারবাবু একটা বয়সের পর আদালতে পেশাদার সাক্ষীদের ট্রেইন করার ফ্রিল্যান্সিং করেন। প্রথম প্রশ্নেই মালুম হলো, 'দিদিমার ছোট দেওরের কি অর্শ ছিলো?'

বিস্মিত হওয়ার অবকাশ পাইনি মাইরি, পরের প্রশ্ন, 'স্ট্রেসে থাকলে স্ট্রেস রিলিভ করার জন্য কী করো?'

সোমাদেবী সলজ্জ মুখে জানালেন 'আই শাউট অ্যাট হিম'। হিমটি যে হিমায়িত আমি, সেটা বলার জন্যে কোনও পুরষ্কার নেই।

'কি খেতে বেশি ভালো লাগে, টক, ঝাল না মিষ্টি'।

এইবারে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেল্লুম, 'এসব তো পোয়াতী মেয়েদের জিজ্ঞেস করে!'

কলি, ঘোর কলি, নইলে সেইদিনই সেই যুগপৎ অগ্নিদৃষ্টির সামনে আমি স্রেফ মিহি ছাই হয়ে পড়ে থাকতাম, বডির একটা পার্টসও খুঁজে অবধি পাওয়া যেত না। শুধু একবার দাঁতে দাঁত ঘষার মধ্যে শুনলাম, 'পোয়াতী? অবনক্সাস!'

আমি মাইরি নিজেকে চেয়ারের হ্যাণ্ডেলের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা বাজারের ব্যাগের মতন নেতিয়ে রইলুম। সামান্য রাগ হচ্ছিল যদিও।

যাই হোক, বাবার ওজন, মায়ের জুতোর সাইজ, বাড়ির দারোয়ানের কান কটকট করে কি না, পাশের বাড়ির বিড়াল রাত্তির বেলা খাম্বাজ রাগে কাঁদে নাকি বিলাওলে, আমার রাতে ঘুম কিরকম হয়, নাক ডাকে কি না, ইত্যাদির পর ডাক্তারম্যাডাম ফোঁস জিজ্ঞেস করলেন 'হোয়াট ইজ ইওর সোর্স অফ স্ট্রেস?'

তিনি মৃদু হেসে আমাকে দেখিয়ে বললেন 'ইতনা বড়া সাইজ কা সোর্স অফ স্ট্রেস নেহি দিখ রহি হ্যায় দিদি, খি খি খি'।

ট্যাং করে মাথায় কোথায় কে একটা ঘন্টি মারলো। বলি হ্যাঁ লা মেয়ে, সবসময়ই তোর মন যুগিয়ে চলি, পান থেকে চুন কেন, জলের ফেঁটাটা অবধি খসতে দিই না, আজ অব্দি একটা কড়া কথা অবধি বলেছি বলে মনে পড়ে না, তোর সঙ্গে কথা বলার চক্করে আমার যৎসামান্য হাতখরচের টাকায় পাড়ার ফোনবুথ মালিকের দোতলা উঠলো বলে, আর আমিই তোর যাবতীয় স্ট্রেসের সোর্স? বটে?

মধুমাখা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম 'যখন প্রবলেম স্কিনকা হ্যায়, তখন স্ট্রেস লেভেল টাইপকা অপ্রয়োজনীয় চিজ নিয়ে ইতনা জিজ্ঞাসাবাদ কিঁউ?'

ডাক্তার ম্যাডাম উদাস স্বরে বললেন, 'ক্যায়া করে, সোরিওসিস ইজ আ সাইকোসোমাটিক ডিজঅর্ডার...'

আমি চওড়া হেসে বল্লুম 'সে তো হোগাই। এমনিতেই এর নামই সোমা, তার ওপর সাইকো। সাইকোসোমাটিক ডিজঅর্ডার তো হোনেকা কথাই থা।'

তারপর কী হল সেসব জিজ্ঞেস করে আর কাজ নেই। তবে ভালোবাসার ব্যাপারে এতটা কড়া জবাব দেওয়াটা হয়তো উচিত হয়নি বলে এখন মনে হয়।

ভালোবাসার পবিত্রতার ওপর আমার সামান্য হলেও যেটকু বিশ্বাস ছিল তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে এই বছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র হাড়কাঁপানো অভিজ্ঞতাটা। তাহলে মন দিয়ে শুনুন কী ঘটেছিল সেদিন।

সেদিন দুপুর বেলা আপিসে বসে কাজ করছি, মানে মার্চে টার্গেট নামের যে বাঁশটা এরিয়া ম্যানেজারদের প্রীতি উপহারস্বরূপ দেবো, তার লেংথ আর ডায়ামিটার নিয়ে খুবই চিন্তিত, এমন সময় মোবাইলে দেখি অচেনা নাম্বার থেকে ফোন।

ফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই, ওপার থেকে সুরেলা গলায় ভেসে এলো, 'কি ভাই চিনতে পারছো? আমি অমুকদি বলছি।'

পারলাম, মানে পারতেই হলো। পঞ্চাশোর্ধ এই ভদ্রমহিলাকে ফেসবুক সূত্রে চিনি ও দিদি বলে ডাকি। সোল্লাসে বললুম, 'হ্যাঁ দিদি বলো, কি খবর?'

তা চাট্টি আগড়ুম বাগড়ুম বকে, প্রভূত নিন্দেমন্দ করে বেশ চনমনে হয়ে উঠেছি, এমন সময় তিনি বললেন, 'এই শোন না, তোর কোন বন্ধুর নাকি একটা অনলাইন সাইট আছে? বললে তোরা ভ্যা লেন্টাইন ডে''এ গোলাপ ফুল পাঠিয়ে দিতে পারবি না??'

একটু সন্দেহ হলো, বুইলেন, 'কাকে পাঠাবে শুনি?'

'আমার বরকে।'

আপনারা তো জানেন আমি কেমন নরম মনের মানুষ। এই বয়সেও বুড়োবুড়ির ভালোবাসা দেখে মাইরি স্বভাবতই চোখে জল। আহা, একি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা এদের! এই বয়সেও গিন্নি নিজে হাতে তাঁর বরকে ভ্যালেন্টাইন ডে তে গোলাপ ফুল উপহার দিচ্ছেন। জয় হোক এই ভালোবাসার, আহা দুজনে যেন শেষ জীবন অবধি এইভাবেই... রুমাল বার করে চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় জানালাম, 'পাঠিয়ে দেবো দিদি'।

'শোন না, একটু পারফিউম ছিটিয়ে দিতে পারবি ভাই?'

কি বলবো দাদা, শুনে আমারই বুকের মধ্যে কেমন কেমন করতে লাগলো, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, মনের মধ্যে বসন্ত বাহার গেয়ে উঠলো কেউ...

কোনও মতে কান্না চেপে বললাম, 'হ্যাঁ দিদি পারবো'।

'আর পারলে একটা দামি দেখে 'You are my Love' মার্কা একটা দামি গ্রিটিংস কার্ড দিয়ে দিস তো।'

ওরে কে কোথায় আছিস, দৌড়ে আয়, আমাকে ধর। কে বলে ভালোবাসা কেবলই যাতনাময়? ওরে আছে, এখনও প্রেম বেঁচে আছে পৃথিবীতে...গাছে গাছে পাখি, মুখে মুখে হাসি, বাগানে কত ফুল, বাজারে কত ইলিশ...

'আর শোন, লিখবি, 'ফ্রম ইওর লাভ, নয়নিকা'!'

নয়নিকা? এইবারে সামান্য চমকাতে হলো, 'নয়নিকাটা আবার কে?'

'কে আবার, এই ডাইনিটাই তো দাদার মাথা খেয়ে ফেলছিলো আরেকটু হলে।'

আবার সব গুলিয়ে গেলো। ভদ্রলোককে খুবই ভালো করে চিনি। অমন নিরীহ নির্বিরোধী সজ্জন মানুষ আর হয় না! তিনি....আর যদি তাই হয়...আগুনে আবার ঘি ঢেলে.

'কবে?' নিজের গলা শুনে নিজেই ভাবিত হয়ে পড়ি, এ কি আমারই গলা?

'আর বলিস না, সেই ক্লাস এইটে টিউশন পড়ার সময়। তোর দাদা ভালোমানুষ বলে প্রায় মাথাটা চিবিয়ে খেয়েই ফেলেছিলো ডাইনিটা', ফেঁসফেঁস শব্দটা স্পষ্ট ফোনের এপারেও শোনা যায়।

এইবারে কেসটা পুরোটা ঘেঁটে যায় আমার। কেন, মানে এতদিন বাদে কিসের কে কি কোথায় কেন কিভাবে?

'তারপর?' সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করি।

'তারপর আবার কি। দুই বছর ফষ্টিনষ্টি করার পর ভালোমানুষটা বিগড়ে যাচ্ছে দেখে নেহাত বাধ্য হয়েই আমাকে খামচা মেরে লোকটাকে ছিনিয়ে আনতে হলো। আমার আর কি বল নেহাত চোখের সামনে একটা ভালো লোক উচ্ছন্নে যাচ্ছিলো বলেই তো...নইলে ওকে বিয়ে করতে আমার বয়েই গেছিল।'

'তা খামচা মেরে লোকটাকে নিজের চামচা করেছো তা বেশ,' আমার কনফিউশন শেষ হতেই চায় না, 'তা এখন আবার তার নাম নিয়ে লোকটাকে গোলাপফুল আর গ্রিটিংস কার্ড পাঠানোর মানে কি? তাও আবার সেন্ট মেরে?'

'আহা, দেখতে চাইছি, লোকটা এখনও শয়তানি মুটকিটাকে মনে রেখেছে কি না, বুঝলি গাধা?'

মনে হলো আমি একটা পাঁচনম্বরী ফুটবল, বাইচুং এক শটে মোহনবাগানের জাল ছিঁড়ে দিয়েছে, সেখান থেকে ফের লাথাতে লাথাতে আমাকে কে যেন সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছে...

'কিন্তু..কি দরকার কি ওসবের? এমন চমৎকার লোক বিল্টুদা, কারও সাতে নেই পাঁচে নেই, মুড়ি দিয়ে স্কচ খায়, তার সঙ্গে এসব করার মানেটা কি? কোনও বেচাল দেখেছো ইদানীং? '

'আহা তা নয়। অফিস, মোহনবাগান, আর বার্সেলোনার বাইরে বোঝে কি ঘটিটা যে ফুলুকফালুক করবে? তিন চামচ চিনি ছাড়া চা খেতে পারে না, এখনও লুচিকে নুচি বলে, ''পেছনে'' বলতে পারে না, বলে ''পেচুনে'', এমন লোককে কে প্রেম করবে রে? আর করতে এলেও কি, আঁশবঁটি নিয়ে গলা নামিয়ে দেবো না?'

বাঙাল মেয়ে কি পারে আর কি পারে না সে নিয়ে আমার প্রথম যৌবনের যথেষ্ট ভীতিকর অভিজ্ঞতা আছে, সভয়ে বলি 'ইয়ে তাহলে এসবের দরকারটাই বা কি? মানে লোকটা যখন চাইলেও পাচ্ছে না, মানে ইয়ে, গলা না হলে আর চুমু খাবে কোথায় বলো?' আমি মিষ্টি করে যুক্তির অবতারণা করি।

'চুপ কর ছোঁড়া, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। মাঝে মাঝে টোপ ফেলে দেখতে হয়, ঠোকরায় কিনা। একবার ঠুকরে দেখুক দেখি, আমিও রামতারণ মুখুজ্জের মেয়ে। আঁশ ছাড়িয়ে ছাদে টাঙিয়ে রেখে দেবো না?'

বুঝলাম, মা এবারে গোষ্ঠমামা অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিল্টুদার জন্যে মায়াই হতে থাকে। ক্ষীণ গলায় বলি, 'আচ্ছা ১৩৫ টাকা দিয়ে দিও, পেটিএম করে দিলেই হবে বুঝলে? গ্রিটিংস কার্ডের উপর পারফিউম ছড়িয়ে দেব, ওটা আমার পক্ষ থেকে কমপ্লিমেন্টারি'।

'একশো পঁয়ত্রিশ না, দুশো সত্তর পাঠাচ্ছি, পেটিএম নাম্বারটা বল চট করে'

'দুশো সত্তর কেন? এই তো বললাম কম্পলিমে...'

'আহ, বড্ড বকিস তুই। দুটো কার্ড পাঠাবি, বুঝলি? একটা যেমন বললাম তেমন, আরেকটা শিলিগুড়ি যাবে'।

'শিলিগুড়িতে কার কাছে?' আমার বিস্ময় আর বাধ মানতে চায় না।

'প্রিয়তোষের কাছে। আশ্রমপাড়া রোড। ঝটপট লিখে নে...'

'প্রি..প্রিয়তোষ আবার কে?' একটা সারিডনই খাই না কি? নাকি একটা বিয়ারের খালি বোতল নিজের মাথায় মেরে দেখবো সব ঠিকঠাক শুনছি আর বুঝছি কি না!

এইবার ফোনের ওদিক থেকে সলজ্জ হাসি ভেসে এলো, 'আহা, ইয়ে মানে প্রিয়তোষ, বুঝলি কি না, ওই ক্লাস এইটেই, বুঝলি তো...'

আমার হাত থেকে মোবাইলটা ঠকাস করে নীচে পড়ে যায়.

এর পরেও যদি আপনি ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে আমার সামনে আদিখ্যেতা করতে এসেছেন, তাহলে থান ইঁট ছুঁড়ে মারবো, এই বলে রাখলুম, হ্যাঁ!

মার্কেট ভিজিট ৬

মার্চস্য প্রথম দিবসে প্রচন্ড গরমের মধ্যে মুম্বাইয়ের ঘাটকোপার এলাকায় মার্কেট করছি, অবস্থা কহতব্য নয়। বিক্রিবাটার অবস্থা তলানিতে কম বলা হয়। ব্লাডপ্রেশার ক্রমশ গগনচুম্বী, বসের ভ্রুকুটিকুটিল মুখটা মনে করলেই পেটের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। শেষে ঘামটাম মুছে সেলসম্যানকে সরিয়ে আসরে নিজেই অবতীর্ণ হয়ে এক অতীব খচ্চর রিটেইলারকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, যে এই ডাল খেলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে,অমরত্ব গ্যারান্টিড, ইহাতে অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন, ইহলোকে সুখী অন্তে বৈকুণ্ঠগমন, এমন সময় হঠাৎ দেখি কোত্থেকে এক শালপ্রাংশু মহাভুজ সাইজের ছোকরা এসে আমাকে সবেগে জড়িয়ে ধরে বলল' দাদা,আপ ইঁহা? কিতনে দিনোঁ বাদ, ক্যায়সে হ্যায় আপ? ডু ইউ রিমেম্বার মি?'

কোনমতে সেই ভীম আলিঙ্গনের নাগপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে তাকিয়ে দেখি, আরে, এ তো ধ্রুব কাপুর!

নিমেষে মনটা নয় বছর পিছিয়ে গেলো।

আজ থেকে নয় বছর আগে, আমি বিহারে একটি বিখ্যাত পেইন্টস কম্পানীর এরিয়া ম্যানেজার ছিলুম। বছরখানেক হয়েছে বি-স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেলসের ঘাঁতঘোঁত শিখছি। এমন সময়ে এক বৃষ্টিবহুল সকালে একটি কচি গোছের অতি সভ্যভদ্র প্রাণী আমার কেবিনের দরজায় টোকা মেরেই ঢুকে পড়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করলো 'মে আই কাম ইন স্যার?'

কোন কারণে খ'চে ছিলুম, খ্যাঁক করে বল্লুম, ঢুকেই তো পড়েছেন, আবার অনুমতি চাই কিসের?

দেখলুম ছেলে সহবত জানে। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়ে ফের দরজা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বলল, 'মে আই কাম ইন প্লিজ?'

বুঝলুম ছেলে অতি সরল ও বিনয়ী। ডেকে সামনে বসিয়ে আগমনের হেতু জানতে চাইলে অবগত হলাম, যে ইনি কারেন্ট ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি। আমার কাছে পাঠানো হয়েছে সেলসের ট্রেইনিঙের জন্যে!

হা হতোস্মি, একেই বিজনেসের এই অবস্থা, তার ওপর এই বোঝা!

জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলুম আমার কপালে কষ্ট আছে। এমনিতে ছেলে দেখতে এক্কেবারে রাজপুত্তুর। ছ'ফিট হাইট, টকটকে ফর্সা, টিকোলো নাক, গাল দুখানি হিমাচলের আপেল। আরো জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পেলো যে ছোঁড়া বনেদী জমিদার বাড়ির ছেলে, বাপ আর্মির কর্নেল। কাপুরথালায় বিশালাকার পুশত্যায়নি হাভেলি সহ ফার্ম, পয়সার ফাদার মাদার আঙ্কেল আন্টি কেউ নেই। সামার ভ্যাকেশনটা সচরাচর ইয়োরোপেই কাটিয়ে থাকেন। পড়াশোনা দুন স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং অস্ট্রেলিয়াতে, ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটায় এমবিএ'টা আর হাভার্ডে গিয়ে পড়া হয়নি, আই আই এম আহমেদাবাদ থেকেই ডিগ্রীখানি হাসিল করে এখানে জয়েন করেন।

এবং ট্রেইনিং-পরমার্থহেতু আজ সকালে উনি আমার সকাশে এসে দণ্ডায়মান!

বুঝলাম এইচ আর এর কোন এক রসিক বিধাতাপুরুষ এই বিরাটশিশুকে নিয়ে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে খেলাটি রচিয়াছেন!

ছেলে দেখলাম ইঞ্জিরি বলে অক্সফোর্ড টাইপ, মশামাছি দেখলে এমন করে যেন সোঁদরবনের বাঘের সংগে হঠাৎ চারিচক্ষুর মিলন! একদিন পথভ্রষ্ট এক চামচিকেছানাকে আমার কেবিনে দেখে ''মি ঘৎ'' বলে প্রায় চোখ উলটে কেতরে পড়ছিল। তখনো পাটনায় সাবওয়ে বা কেএফসি খোলেনি। সেই শুনে বাবু চোখফোখ

কপালে তুলে জানালো এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ককনো ঘটে না, নেহাত পাটনাতে এখন ঘোর কলি, তাই!

আরও কানাঘুষো শোনা গেলো উনি নাকি পটি করে ধোবার জন্যেও মিনারেল ওয়াটার ইউজ করেন, একদিন নাকি এক্সিবিশন রোডের মোড়ে কোন এক নিরুপায় নিরীহ গরুকে ল্যাজ তুলে পটি করতে দেখে বমি করে ফেলেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছিল না বিশেষ। পার্সোনাল কমোড, পার্সোনাল পটি। তদন্তে ও নিজের পার্সোনাল ইয়ে নিজের পয়সায় কেনা যেকোন ওয়াটার, এমন কি গোলাপ জল দিয়েও ধুতে পারে, কার বাবার কি হে??

মুশকিল হল অন্য জায়গায়। ছোকরার জাগতিক জ্ঞানগম্যি প্রায় শিউড়ে ওঠার মতন। দুনিয়াদারির হাটে প্রায় নাদান সদ্যজাত "সিসু" বললেই চলে। এবং তার সংগে যেটা যাকে বলে সোনে পে সোহাগা, সেটা হচ্ছে দিলতোড় জ্ঞানতৃষ্ণা। সব কিছুই একেবারে গোড়া থেকে তলিয়ে না বোঝা অবধি বাবুর স্বস্তি নেই এক মুহূর্ত।

একবার দায়িত্ব দিলুম ডীলারদের ROI (রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট) নিয়ে স্টাডি করার। উনি খানিকক্ষণ বাদে নালা রোডের সবচেয়ে বড় হোলসেলারের কাছে গিয়ে দাবি জানালেন উনি সেই ব্যবসায়ীকুলপতির ক্যাশবাক্স এক্ষুণি চেক করবেন, তৎসঙ্গে যাবতীয় ব্যাংক একাউন্টস ডিটেইলস। খানিকক্ষণ বাদে দেড়শ কিলোর সেই মাড়োয়ারিতনয় ঘামতে ঘামতে আমার কেবিনে এসেই ধপাস করে পতন ও মূর্ছা, 'আপলোগ কবসে ছাপা মারনে লাগে?' অস্যার্থ, আপনারা, অর্থাৎ কম্পানীগুলি কবে থেকে ইনকাম ট্যাক্স রেইড শুরু করলেন?

নিরুপায় হয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে দিলুম অন্য কাজ, এমপ্লয়ী এনগেজমেন্ট সার্ভে। অর্থাৎ আমাদের সেলস অফিসারাদি দুধেভাতে কেমন আছে তার ছানবিন করার কাজ। দুদিন বাদে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেলস অফিসার সমীর সিনহা কেবিনে ঢুকে আমার হাঁটু জড়িয়ে হাউ হাউ করে সে কি কান্না 'আপনে মেরে সাথ এয়সা কিঁউ কিয়া?' হতচকিতভাব কেটে যাবার পর তাকে ধুলোফুলো ঝেড়ে চোখের জল মুছিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঘটনা কি?

কান্নাজড়ানো শ্লেষ্মাবিঘ্নিত গলায় সিনহাসাহেব জানালেন যে দায়িত্ব পেয়েই শ্রীকাপুর সরাসরি সিনহাসাহেবের ল্যান্ডলাইনে ফোন করে শ্রীমতী সিনহাকে নিষ্কাম যোগীর ঔচিত্যপ্রেরণায় জিজ্ঞেস করেন যে মাস তিনেক আগে মিস্টার সমীর যে লাখতিনেক টাকা ইন্সেন্টিভ হিসেবে পেয়েছেন, শ্রীমতী সিনহা তার কি কি সদ্ব্যবহার করেছেন? প্রসংগত উল্লেখ্য যে এই ইন্সেন্টিভের কথা সিনহাসাহেব ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানান নি। ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

এসব ঝামেলা সামলে তাকে একদিন মোকামা নিয়ে গেছি মার্কেট ভিজিটে, অপার করুণাময় পরমপিতা ঘন্টা কয়েকের মধ্যে আমার সমস্ত মুশকিল আসান করে দিলেন!

আশ্বিনের সেই প্রসন্ন শারদপ্রাতে গঙ্গার ঘাট বরাবর মার্কেট করতে করতে আমার হাওড়ার ইংরেজি দিয়ে এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাটিকে কনজিউমার বিহেভিয়ার বোঝাবার চেষ্টায় ছিলাম। মানে ধরুন ডেটল,এর ব্র্যান্ড পার্সোনালিটি অ্যান্ড ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার কি টাইপের? এর বিশেষ গন্ধ, কালার এবং জ্বলুনির স্মৃতি কনজুমারের মনে কি ধরণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ধারণা তৈরি করে?আর কি কি ব্র্যান্ড অ্যাট্রিবিউট গণমানসে আনুগত্য বা লয়্যালটি তৈরি করে? যেমন ল্যাকমে, কি গুডনাইট, কি লাক্স....

ইত্যাদি সদর্থক আলোচনা করতে করতে কোন এক ঘাটে পৌঁছেছি, হঠাৎ ছোকরা চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, একটা কনজিউমার বিহেভিয়ারের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা এখনই করলে আমি কিছু মাইন্ড করবো কি না।

আমি এখনো স্পষ্ট মনে করতে পারি যে আমি খুব একটা ভেবেচিন্তে 'হ্যাঁ' বলিনি। যদিও সেটা উচিৎ ছিলো খুবই। কারণ পরমুহূর্তেই দেখি সেই মহাপ্রভু তরতর করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে একদম শেষধাপে কিছু স্নানরতা রমণীদের প্রতি দ্রুত ধাবমান!

সেখানে তখন এক প্রৌঢ়া রমণী দুটি কচি সদ্যবিবাহিতার সংগে রাত্রিকালীন প্রণয়অভিসার বিষয়ে কুছু নিষ্পাপ বার্তালাপ করছিলেন নিশ্চিত। থেকে থেকে উচ্চকিত বামাকণ্ঠের লজ্জামিশ্রিত হাস্যরোল ভেসে আসছিল।

এমন সময় আমার ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে, জ্ঞানপিপাসু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিটি নেমে গিয়ে এক হেমেন মজুমদার চিত্রিত সিক্তবসনা রমণীর কাঁধে টোকা মেরে সুকুমারবর্ণিত ন্যাড়ার মতনই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাল্লো ম্যাডাম, গুড আফটারনুন। ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হুইচ সোপ ডু ইউ ইউজ? অ্যান্ড হোয়াই?'

সেকেণ্ডের মধ্যে উত্থিত সেই গগনবিদারী আর্তনাদের মধ্যে দেখি লাঠিসোঁটা নিয়ে কয়েকটি পুরুষ এদিকেই দ্রুত ধাবমান।

বাকি কথা বিস্তারিত বলার দরকার নেই। সারাদিন পুলিশ পঞ্চায়েত সামলে,আমাদের ডিলারের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে যখন পঞ্চায়েত প্রধানের গোয়ালে বেঁধে রাখা সেই জ্ঞানতাপসকে উদ্ধার করলাম, উনি মুক্তি পেয়েই ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে নিজের রিসার্চসমৃদ্ধ মতামতটি প্রকাশ করলেন, 'বিহারি কনজিউমার্স আর ভায়োলেন্ট, ভেরি ভেরি ভায়োলেন্ট।'

এতদিন বাদে সেই ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই রাজেন্দ্রপ্রতিম গোরাচাঁদটির চামড়া এখন ঘোর ভারতীয় তাম্রবর্ণ, চোখেমুখের ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংগে মিশেছে শান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান। স্বভাবজ বিনয় ও ডিগ্রীর সংগে যুক্ত হয়েছে তীক্ষ্ন ক্ষিপ্রবুদ্ধি। সেলসের চাকরিতে বিভিন্ন স্থানকালপাত্রজাতিভাষাবর্ণবহুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাদার ইন্ডিয়া তাঁর এই নাদান সন্তানটিকে ঠিক নিজের মতন করে গড়েপিটে নিয়েছেন নিজের প্রয়োজনেই!

ভারতবর্ষ নামক এই বিচিত্র পাঠশালাটির কাছে ফের নতজানু হলাম।

প্রবাসে মুম্বাইয়ের বশে

দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার সতের, জীবনের তিন তিনটে অমূল্য বছর ভারতবর্ষের বাণিজ্য রাজধানী মুম্বাইতে কাটিয়েছি। বলত নেই, শহরটার প্রতি আমার একটা আশ্চর্য ভালবাসা আছে। আমার এক মুম্বাইবাসী সিনিয়র বলেছিলেন, মুম্বাই গ্রো'জ অন ইউ। সে কথাটা এখন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। কলকাতার পর কোনও শহরকে যদি সত্যি ভালবেসে থাকি তাহলে তার নাম মুম্বাই।

অথচ যখন মুম্বাইতে থাকতাম তখন কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত কলকাতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের উপমা দিতে গিয়ে বড়লোক বাবুর বাড়িতে কর্মরতা ধাইদের উদাহরণ দিয়েছিলেন, যাঁরা পয়সার জন্যে মালকিনের সন্তানদের মাতৃসমস্নেহে পালন করেন বটে, কিন্তু মন পড়ে থাকে গ্রামের বাড়িতে অনাদৃত, অবহেলিত নিজের নাড়িছেঁড়া ধনটির প্রতি। মুম্বাইতে আমার অবস্থাটা ছিল ঠিক এই ধাত্রীদেবীদের মতই। যতই ভালোবেসে হরা চাটনি দিয়ে ভড়া পাও চিবই না কেন, মনটা সদাসর্বদাই পার্ক স্ট্রীটের কাটি রোলের জন্যে হাহাকার করতে থাকে। বন্ধুদের মধ্যে মনোজ্ঞ আড্ডায় কেউ বার্সা বললেই অবধারিত ভাবে আর্সা, মানে আরসালানের কথা মনে পড়ে যায়, রিয়াল মাদ্রিদ উল্লেখমাত্রে রয়্যালের মাটন চাঁপের স্মৃতি হৃদয় আর্দ্র করে তোলে।

শ্রীরাধিকা নাকি পূর্বরাগের শেষ দিকে কালো মেঘ দর্শনমাত্রে ''হা কৃষ্ণ'' বলে ভাবাবিষ্ট হতেন। আমিও ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ফ শুনেই একবার ''হা ফুচকা'' বলে কেঁদে আকুল হতে যাচ্ছিলাম। নেহাত সিইও কড়া চোখে তাকাতে কান্নাটা কেঁৎ করে গিলে নিতে বাধ্য হই।

এতটা পড়েই যে সব মহাত্মনদের মনে এই কুটিল জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে যে ''এত্ত আঠা যখন, তাহলে এই ডিহি কলকেতা ছেড়ে মুম্বাই গেসলে ক্যান বাপু?'' তাদের জন্যেই আসল গল্পটি খোলসা করে বলতে বাধ্য হচ্ছি। তার সঙ্গে রইলো আমার মুম্বাই প্রবাসের কিছু টক ঝাল মিষ্টি সুখস্মৃতি।

দু হাজার চোদ্দর জুন মাস। এপ্রিল থেকেই তৎকালীন বস খুবই উদারভাবে মুম্বাই আসার ঢালাও আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন, আমিও তা না না করে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম। একবার তো স্পষ্ট ভাষায় বলেই দিলেন, 'ভাই, ইস্ট রিজিওনের যা ক্ষতি করেছিস সে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। নসুপনা না করে মুম্বাইতে এসে আমার কেবিনের বাইরে একটা টুল পেতে বস দিকিন, কি কাজকম্ম করিস তার খোঁজপত্তর নিতে হচ্ছে যে। এতগুলো টাকা মাইনে নিস, ঘি টা ভস্মে ঢালছি কিনা সেটাও তো দেখতে হবে রে বাপু'! আমিও 'হেঁ হেঁ হেঁ, কি যে বলেন ছার' বলে ড্রিবল করে বেরিয়ে গেলুম।

এমন সময়ে এলো জামাইষষ্ঠী। তার আগের রাতে অনেক কেঁদেকঁকিয়ে চেষ্টাচরিত্র করে গিন্নির কাছ থেকে তিনটি পেগের অনুমতি আদায় করেছি, দিলটা তরর হয়ে আছে। কি একটা বই পড়তে পড়তে (মনু সংহিতা বা ফিফটি শেডস অফ গ্রে হবে) ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছি। জীবনটা বড় সুমধুর স্বপ্নের মতন লাগছে, এমন সময় কোন একটা উত্তেজক কিছু পড়তে পড়তে... (তাহলে ফিফটি শেডস অফ গ্রে ই হবে। মানে মনুসংহিতা পড়ে তো....)

ইররক..গ্লুলুস..ঘিঁআও...খ্যাঁকখক..

বাপ্পস..ভুল করে একটা পেগ পুরো নীট মেরে দিয়েছি যে! গলা বুক জ্বলে একশা কাণ্ড, মনে হলো একটা ছোটখাটো তরল আগ্নেয়গিরিই যেন গলা বেয়ে নেমে গেলো প্রায়! গিন্নি দৌড়ে এসে ব্যাপার বুঝেই জলের বোতল এনে হাজির। কেঁৎকেঁৎ করে খানিকটা জল গিলে, এসিটা আঠেরোতে নামিয়ে, হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে লাগলাম। পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা দৌড়ে এসে এত কিছু দেখে, 'বাবা কি মরে যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, বাবা কি

মরে যাচ্ছে' টাইপের বেহুদ্দ ঘ্যানঘ্যানে প্রশ্নে শোরগোল আরও বাড়িয়ে তুলেছে, গিন্নি ''মদ্যপানের কুফল ও সমাজের ওপর ইহার অবাঞ্ছিত প্রভাব'' সম্পর্কে কুড়ি নাম্বারের রচনা শোনাবার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে কি ভেবে রোষকষায়িত লোচনে শুধু বললেন 'সবেতে তাড়াহুড়ো করা তোমার স্বভাব। জল ঢেলে খাও নি কেন? নীট খেতে কে বলেছিল তোমায়? সবেতে ওস্তাদি।'

হ্যা হ্যা করতে করতে একবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভাবলুম থাক, দিন হামারা ভি একদিন আয়েগা। সেদিন দুটো কড়া কথা হামভি শুনায়গা, জরুর শুনায়গা।

পরের দিন তো কাজকম্ম সেরে, সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরে, স্নানটান করে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে মেয়ে বউকে নিয়ে রিকশা করে চল্লুম শ্বশুরবাড়ি। জামাই আদরে ঘটিরা আমাদের, মানে বাঙালদের যে গুনে গুনে সাত গোলে হারাতে পারে, এ কথা আমি মাথা নিচু করে স্বীকার করতে বাধ্য। শ্বশুরমশাই অসুস্থ শরীরেও নিজের হাতে দোকানপাট সব করেছেন,এসব দেখে একটু অপরাধী অপরাধী লাগছিলো বটে, তবে কি না রান্নাঘর থেকে চিকেনরান্নার মনকাড়া গন্ধটা ভেসে আসতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বেশ কম্ফর্টেই বল্লুম 'ইয়ে, অনেক্ষণ তো হলো, এবার বসে গেলে হয় না?'

রান্নাঘর থেকে গিন্নি বেরিয়ে এসে একটা কাঁসার বগি থালার ওপর ইয়াব্বড়বড় খান পাঁচেক ফুলকো লুচি রেখে গেলেন, সঙ্গে বড় জামবাটিতে কুচো নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল। ফলে হাসিমুখে গিয়ে বসতেই হলো,কারণ লুচি ঠাণ্ডা করে খেলে কুম্ভীপাক নরকে পার লুচি একশো বছর করে এক্সট্রা খাটতে হয় বলে শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে না? গিন্নি রান্নাঘরে চলে যাবার আগে গলদার মালাইকারির কথাটা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করাতে উনি চাপা গলায় 'হ্যাংলা বাঙাল' টাইপের কিছু একটা বলে গেলেন বলে মনে হলো, তবে কি না সেটা আমার শোনার ভুলও হতে পারে। যাগগে যাক... খাওয়াদাওয়াতে, যাকে বলে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে মন দিলাম।

তা ঘন্টাখানেক বাদে, যখন সেই চিংড়ি-চিকেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে মুখ তুল্লুম, আমার স্নেহময়ী শাশুড়ির মুখে একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি, যেন রেমব্রাঁ ওনার আঁকা ''নাইটওয়াচম্যান'' দেখে অভিভূত এক গুণমুগ্ধ কলারসিকের অভিবাদন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করছেন। থালার দিকে তাকিয়ে দেখি গলদার খোসাটা, আর চিকেনের ঠ্যাঙগুলো ছাড়া থালা পুরো আয়নার মতন চকচক করছে। বেগুনভাজার খোসাটার চিহ্ন অবধি নেই। লুচির কথা ছেড়েই দিন। আড়চোখে দেখলুম গিন্নি থমথমে মুখে রান্নাঘরে ময়দা মাখতে বসেছে!

ইত্যাদির পর পরিতৃপ্তি সহকারে ড্রয়িংরুমে এসে বসেছি। শ্বশুরমশাই ভারি খুশি হয়ে আমার খাওয়াদাওয়ার প্রশংসা করছেন, 'বুঝলে হে, আমরা যকন ইয়াং, ছিলুম, রোজ হেদোতে সাঁতার কেটে, বুইলে কি না, কারবালা ট্যাঙ্কের বাড়িতে ফিরে অ্যাই একধামা নুচি স্রেপ কাঁচানঙ্কা দিয়ে মেরে দিতুম, বুইলে কি না? তাপ্পর রাত্তিরে....'। শুনেই বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো, শুধু হেদোর বদলে ষষ্ঠীপুকুর, কারবালা ট্যাঙ্কের বদলে শিবপুর, একধামা নুচির বদলে একথালা ভাত আর কাঁচানঙ্কার বদলে গিমা শাক ভাজা, এইটুকুই যা তফাৎ!

এমন সময়ে গিন্নি ময়দামাখা হাত ধুয়ে বড় একটা রূপোর বাটিতে পায়েস এনে হাজির। হালকা বাদামী ক্ষীর দিয়ে বানানো পায়েস, ওপরে পেস্তা আর কাজু কিশমিশ বেশ আমন্ত্রণমূলক ভাবেই শুয়ে আছে। আমার তো মনে হলো ওখানেই গিন্নিকে কোলে তুলে ট্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো জিঙ্গো জিঙ্গো গাই আর কি। নেহাত ব্যাপারটা শউরমশাই ততটা পছন্দ করবেন না হয়তো... বলে আনমনে ভাবতে ভাবতে এক চামচ মুখে দিয়েই...

ইররক..গ্লুলুস..ঘিঁআও...খ্যাঁকখক..

পুরো আগুনে গরম! মনে হলো একটা মিষ্টি লাভাস্রোত যেন জিভের ওপর খেলে বেড়াচ্ছে! পুরো শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা, ফেলতেও পারছি না, গিলতেও পারছি না। সবাই বিলক্ষণ শশব্যস্ত হয়ে পড়লো, হ্যা হ্যা করছি, গিন্নি একটা খবরের কাগজ নিয়ে দ্রুত হাওয়া আর দাঁত কিড়মিড় কচ্চেন, শাশুড়িমা খুবই উদ্বেগের সঙ্গে 'আহা, একটু রয়েসয়ে খাবে তো' টাইপের কিছু একটা বলার চেষ্টা কচ্চেন, এমন সময়ে

আমার কন্যারত্নটি ন্যায্য উদ্বেগে ফেটে পড়লেন, 'সবেতে তাড়াহুড়ো করা তোমার স্বভাব। জল ঢেলে খাও নি কেন? নীট খেতে কে বলেছিল তোমায়? সবেতে ওস্তাদি'।

পরের কথা এহ বাহ্য। সেদিনই ফিরে এসে গভীর রাতে আমার বসকে মুম্বাই যাবার ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিই। জামাইষষ্ঠী চুলোয় যাক, ইজ্জতে গ্যামাক্সিন না পড়লেই হলো।

যদ্দিন না এ মেয়ের জ্ঞানগম্যি হচ্চে, তদ্দিন হেথা নয়, হেথা একদম নয়, অন্য কোথাও, অন্য যে কোন খানে!

তবে মুম্বাই এসেই বুঝেছিলাম যে এ ভারি ভালো শহর।

আগেই বলেছি যখন নিতান্তই দৈবদুর্বিপাকে এই মহাদ্রুমের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই, তখন যা মনের অবস্থা ছিল সে কহতব্য নয়। সে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, রানী পদ্মিনীর জৌহরব্রত আর নেতাজী সুভাষের মহাভিনিষ্ক্রমণ একসঙ্গে মিলিয়ে তার সামান্য আইডিয়া হলেও হতে পারে। যাবার সময় এয়ারপোর্টে বসে ঠিক ক'মাস অন্তর অন্তর কলকেতা শহরে একবার ঢুঁ মারলে কলজেটা ঠাণ্ডা হবে সেই হিসেব কষতাম। বসের মুখটা মনে পড়লেই মনে 'ধনুর্দর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা, এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে' গোছের কুচিন্তা মনে উদয় হত। আরসালান, দুর্গাপুজো আর ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মুম্বাই যায় কোন আহাম্মক?

কিন্তু কবি বলে গেছেন দৈব, দৈবই সর্বত্র প্রবল। নইলে যে লোকটা বস হিসেবে দিব্যি তিন বছর শরিফ মেজাজে আমার দেখভাল করেছে, প্রোমোশন দেওয়ার নামে এমন লেঙ্গিটা সে আমাকে মারবে কেন?

তবে মুম্বাই যে আগে আগে আসিনি তা নয়। তবে কি না সে ছিল নেহাতই দীঘির পাড়ে জল তুলতে এসে নির্দোষ আঁখমিচোলি খেলা, প্রাজ্ঞজনেরা ম্লেচ্ছ ভাষায় যাকে বলেন ফ্লার্টিং। সকাল সকাল আর্লি মর্নিং এসে, মিটিং সেরে রাতের ফ্লাইট ধরা।

কিন্তু সেইবারই মুম্বাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেঁড়েমুষে সংসার করতে আসা!

প্রথমে এসে উঠলাম কম্পানির গেস্টহাউসে। এমনিতে গেস্ট হাউসে টানা এক সপ্তাহের বেশি থাকার নিয়ম নেই। কিন্তু হেড অফিসে অ্যাডমিন দেখতেন এক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কাজলনয়না সুতনুকা। আর আমি যে কিরকম হ্যাণ্ডসাম, হেঁ হেঁ, বলতে লজ্জাই লাগছে আর কি, সে তো আপনারা জানেনই! ফলে সাড়ে তিনমাস দিব্য কাটিয়ে দিয়েছিলুম সেখানে। শেষে অবশ্য একদিন বলপ্রয়োগের আভাস পেয়ে ঠাঁইনাড়া হতে বাধ্য হই, কিন্তু সে আরেক গল্প।

যে এলাকায় শেষ পর্যন্ত ডেরাডাণ্ডা বাঁধি তার নাম পাওয়াই, সেন্ট্রাল লাইনে।

এখানে এই সেন্ট্রাল লাইন বিষয়টা ভালো করে না বোঝালে বাকিটা প্রণিধান করতে অসুবিধা হবে।

মুম্বাইতে এই সেন্ট্রাল লাইন, ওয়েস্টার্ন লাইন, ইস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে, ইত্যাদি হচ্ছে বর্গীজীবনের অর্গি, চলাচলের পক্ষে এগুলি ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতেহনায়ঃ। শাস্ত্রে বলে মহাজন যেন গতঃ স পন্থা, মহাজন (ক্রেডিট কার্ড কম্পানি নয়, মহৎ জন) যে রাস্তায় গেছেন সেটাই রাস্তা। মুশকিল হচ্চে মুম্বাইতে মহাজন, হীনজন, বজ্রজন সব্বার গতি ওই এক, তিনটি রেল লাইন, আর দুটি এক্সপ্রেসওয়ে। এদের নিয়ে না হয় আরেকদিন গপ্প করা যাবে। আজকের টপিক অন্য।

মুম্বাই শহর কখনও থামে না, এ কথা শুনে শুনে আপনারা হেজে গেছেন। তবুও আরেকবার শুনুন, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমরা যারা ''পেনসনার্স সিটি'' কলকাতা থেকে আসি, তারা প্রথমে এই অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহ দেখে ঘাবড়ে যাই। এখানে বাজে কথা, বাজে সময় নষ্ট, এসব নিষেধ। এর সুফল কুফল দুইই আছে, বারান্তরে প্রকাশ্য।

যে কোনও শহরে নেমে সেই শহর সম্পর্কে প্রথম ধারণা হয়ে সেই শহরের ট্যাক্সি আর অটোওয়ালাদের আচরণ দেখে। 'চেন্নাই কেমন লাগছে' জিজ্ঞেস করুন চেন্নাইতে প্রথমবার পা রাখা যে কোনও লোককে, প্রথমেই চেন্নাইয়ের অটোওয়ালাদের উর্ধতন চৌদ্দ পুরুষের গুষ্টির তুষ্টি করে দেবে, বক্তার অপভাষা প্রয়োগে

কিঞ্চিৎ প্রারব্ধ সঞ্চিত ব্যুৎপত্তি থাকলে সেই অটোওয়ালাদের উর্ধতন চৌদ্দ নারীর উদ্দাম লিবিডোর কাহিনীও শুনে ফেলতে পারেন। এককালে কলকাতার এয়ারপোর্টের আর হাওড়া রেলস্টেশনের ট্যাক্সিওয়ালাদের এই দুর্নাম ছিল। গত বছর পাঁচেক ধরে অবিশ্যি দেখছি ব্যবস্থাটা অনেক শুধরেছে।

এ বিষয়ে মুম্বাইয়ের অটো বা ট্যাক্সিওয়ালারা একশোতে একশো দশ পাবে। এমন ভদ্র, বিনয়ী, সৎ জনসেবক চট করে দেখা যায় না। বাকি দেশ তো ছেড়েই দিলাম, বিদেশেও এর জুড়ি মেলা ভার। না না, ব্যাজস্তুতি করছি না, ঘডনা পুরাই হইত্য!

পুরো মুম্বাই শহরেই একটি ব্যবহারিক সততা কাজ করে। এ জিনিস কলকাতা বা দিল্লিতে হয় না। ছ্যাঁচড়াপনা জিনিসটা খুব সম্ভবত পূর্ব ও উত্তরভারতের একচেটে। তিন বছর হয়ে গেলো মুম্বাইতে, সর্বত্র দেখেছি একটি স্বাভাবিক ন্যায়ের সার্বিক ধারণা সর্বদা ক্রিয়াশীল। দু চার টাকা অবৈধ উপার্জনের জন্যে জালিয়াতি বা চোখরাঙানি এখানে ভাবাই যায় না, না আছে লোকের প্রবৃত্তি, না সময়! অটো চড়লেও আপনি এ জিনিস দেখতে পাবেন। মোটামুটি ভালো থেকে বেশ ভালো সিট, ব্যবহার অতি ভদ্র, মিটারও একদম ঠিক, আজ অবধি মুম্বাই অটোর কোনও বেচাল পাইনি। যেখানে বলবেন সেখানে নিয়ে যাবে, 'আজ আমার পেট খারাপ/ ওদিকে জুজু আছে, যাবো না/ আজ মাসির ননদের সেজোমাসির ভাশুরপোর বিয়ে, আমি নিতবর সেজেছি' গোছের অপযুক্তি দেবে না। পঞ্চাশ টাকার ভাড়া উঠলে পাঁচশো টাকা দিন, তৎক্ষণাৎ খুচরো পাবেন, কলকাতার অটোমহাত্মনদের মতন প্রাকৃত ভাষায় অতি উচ্চাঙ্গের খেদোক্তি শুনতে হবে না। এই কাস্টমার সেন্ট্রিসিটি বা উপভোক্তামুখিনতায় মুম্বাই শহর কলকাতা সহ দেশের বাকি সমস্ত মেট্রোকে বলে বলে দশ গোল দেবে। এ জিনিস আপনি আপনার আদ্যন্ত কলকাতা প্রেমরসে ভিজিয়ে তার সঙ্গে মার্কের ক্লাস স্ট্রাগল আর গৌতম বাবুর সাব অল্টার্ন থিওরি পাঞ্চ করেও এক্সপ্লেইন করতে পারবেন না, কারণ কলকাতার অটো/ট্যাক্সিওয়ালা আর মুম্বাইয়ের অটোওয়ালাদের আর্থিক অবস্থা, সমাজ সচেতনতা, ক্লাস আইডেন্টিটি কিন্তু একই। তফাৎ এই যে আইন ভাঙ্গলে আপনি কারও পেছনে পার্টিশাসনের বরাভয় হস্ত উদ্যত করেছেন, আর কারও পেছনে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের ডাণ্ডা। ফলাফল দেখতেই পাচ্ছেন।

মুম্বাইতে এক্স্যাক্ট কত অটো চলে বলা মুশকিল। মোটামুটি দেড় লাখ মতন অটো তো চলেই। কল্যাণ অ্যান্ড নভি মুম্বাই ধরে নিলে সংখ্যাটা ২ লাখের কিছু বেশি দাঁড়ায়। আর এখানে শেয়ার অটো বলে কিছু নেই, সবই মিটারে চলে। প্রথম আট কিলোমিটার আঠেরো টাকা, পরে প্রতি চার কিলোমিটারে দু টাকা। একটাকাও হতে পারে, ঠিক মনে নেই। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে দেখেছি যে মুম্বাইয়ের অটোওয়ালারা একটাকা দুটাকা কিছু মান্য করেন না। প্রথম প্রথম কলকাতা থেকে গিয়ে এটা খুব অদ্ভুত লাগতো। কলকাতায় অটো/ট্যাক্সিওয়ালারা যেমন যাত্রীরা একটাকা দুটাকা না দিতে পারলে বা বড় নোট দিলে যে ভাষায় যাত্রীর মা ও বোনের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার বাসনা প্রকাশ করতে থাকেন, সেসব এখানে ভাবাই যায় না। মুম্বাইতে এসব তুচ্ছ বিষয়ে কেউ ঝগড়া করে না, ব্যস্ত শহর, সবারই সময়ের দাম আছে। বাহান্ন টাকা বিল হয়েছে, পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললেন দুটাকা খুচরো নেই, অটোওয়ালা কিচ্ছুটি মাইন্ড করেন না, 'কোই নেহি' বা 'ঠিক হ্যায়' বলে কেটে পড়েন। একজন দুজন নয়, তিনবছরে দেখা প্রতিটি অটোওয়ালাই তাই। এটা আমরা যাত্রীরাও করি, আটচল্লিশ টাকা বিল হয়েছে, পঞ্চাশ দিয়েছি, অটোওয়ালা কাঁচুমাঁচু মুখে জানালো 'দো রুপেয়া নেহি হ্যায় সা'ব', আমরাও 'ঠিক হ্যায়, কোই নেহি' একটা উদার ভঙ্গিমা করে কেটে পড়ি, আজ অবধি কাউকে হল্লা জুড়তে দেখিনি।

মুম্বাইয়ের অটোওয়ালাদের একটি বৃহৎ অংশ বিহার ও ইউপির অধিবাসী। অতি দরিদ্র, অরাজক ও জনবহুল এই দুটি প্রদেশ থেকে অনেক কর্মহীন মানুষই ভাগ্যান্বেষণে অন্যান্য শহরে খেটে খান, এখানেও তাই। কিন্তু কলকাতার আপামর বাঙালিদের মতই সাধারণ মারাঠিরাও এঁদের খুবই সন্দেহের চোখে দেখেন। আমরা যেমন এঁদের খোট্টা বলে গাল দিই, মারাঠিরা বলে 'ভাইয়া'। ভাইয়া শব্দটি মারাঠি জনজীবনে অসম্মানসূচক শব্দ। মারাঠিরা মনে করেন তাদের সমস্ত জীবিকার্জনের উপায়ে অবৈধ ভাগ বসাচ্ছে এই

'ভাইয়া'রা, তাদের সস্তা শ্রম দিয়ে। আর মারাঠিরা অতি পরিশ্রমী, প্র্যাকটিক্যাল এবং নো ননসেন্স জাত। নিজের ভাতের হাঁড়িতে লাথি মেরে আন্তর্জাতিকতাবাদ, শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য ইত্যাদি নিয়ে গল্পদাদুর আসর বসায় না, আগে নিজের পেটের ভাতের যোগানটা ভালো করে সমঝে নেয়। ফলে এখানে প্রো-মারাঠি রাজনৈতিক শক্তি খুবই সিংহবিক্রমসহ বিদ্যমান। আর তাছাড়া জাতি হিসেবে মারাঠিদের একটু অহংও আছে। তারাই যে একমাত্র জাতি যারা প্রবলপ্রতাপ মোঘল সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, এবং বারংবার পর্যুদস্ত করে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের আগে অবধি অখণ্ড হিন্দু পাদপাদশাহী স্থাপন করেছিল, সে ব্যাপারটা সমস্ত আচরেকর থেকে যাবতীয় যোশি ইয়াদ রেখেছেন। ফলে মারাঠি অহং এ সামান্য আঁচড় পড়লে ফোঁস করতে দ্বিধাবোধ করেন না। রাস্তায় বিহারি অটোওয়ালার সঙ্গে মারাঠি যাত্রীর বিবাদ হলে যাত্রীটি সেই শিকড়ছেঁড়া অটোচালকটিকে, 'তু ঝা শহরাত পুনহা পরত কা নেহি যাত?' বলে সজোরে ডেঁটে দেন, অস্যার্থ, তুই নিজের শহরেই ফিরে যা না ড্যাকরা মিন্সে! একেনে জ্বালাতে এইচিস ক্যানে?

তবে সে যাই হোক, মুম্বাইয়ের অটোচালকদের কাস্টমার সার্ভিস....মাই ঘড! জাস্ট দুটো ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করে দাঁড়ি টানবো।

ঘটনা একঃ সদ্য মুম্বাই এসেছি। অগাস্ট মাস। মুম্বাইয়ের বৃষ্টি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। এ যে কি প্রলয়ঙ্করী জিনিস কি বলবো! যাই হোক। এমনই সময়ে আমি এক কলেজী বন্ধুর সঙ্গে কলেজি ফ্রাই (মেটে ফ্রাই) দিয়ে বিয়ার পানের আসর বসিয়েছে দাদরে। শনিবারের রাত, তখন এগারোটা বাজে, বেশ টইটুম্বুর হয়ে বাইরে বেরিয়ে উরিস্লা..... এ কি বৃষ্টি রে? এক হাত দূরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আকাশ পুরো ভেঙে পড়েছে, ঘনঘোর বরিষণ কি একেই বলে? তা বেশি বিহ্বল হওয়ার আগেই আমার সেই বন্ধুটি দৌড়ঝাঁপ করে একটি অটো ধরে দিলো। আমিও গুন্নাইট বলেটলে অটোতে উঠে পড়লুম।

নির্জন ইস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ করেকেটেঘ্যাচাং! অটো চলে না, চলে না, চলে না রে...

এখন গান গাইছি বটে, তবে স্পষ্ট মনে আছে সেইসময় কিরকম আতান্তরে পড়েছিলুম। চারিদিকে যা বৃষ্টি, লাস্ট বোধহয় হয়েছিল নোয়া''র সময়ে। অটোর বাইরের দৃশ্যমানতা কিলোমিটারের বদলে মিলিমিটারে নেমে এসেছে। মাঝেমধ্যে একটা একটা গাড়ি দ্রুতবেগে সাঁৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর দুনিয়ার নোংরা জল ছইছাঁপাছই করে ছিটকে অটোর মধ্যে! এছাড়া এই নিভৃত নির্জন চারিধারে জনমনিষ্যির চিহ্ন, আলোর আভাস, কিছুতেই কিছু নেই।

হঠাৎ মনে কুচিন্তা এলো, এখন এইখানে যদি লোকটা আমাকে মেরেই ফেলে? হয়তো এখানেই অটো থামে পরিকল্পনামাফিক। হয়তো ওর দলবল এক্ষুণি বাইক ফাইক চড়ে আসছে, অন দ্য ওয়ে আর কি! যদিও পকেটে কয়েকটা খুচরো নোট ছাড়া আর কিছু নেই। তবে কার কিসে কি পছন্দ বলা যায় না। দামী ঘড়িটা আছে, আর.... ভাবতেই ভাবতেই দেখলাম লোকটাকে নিজেই জিজ্ঞেস করছি, 'ইয়ে, বোল রাহাথা যে কেয়া হুয়া? পার্টসগুলা সব ক্ষয় হো গ্যায়া নাকি ইঞ্জিনমে ময়লা জম গ্যায়া?'

সে বাবু ঋষিতুল্য নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত গলায় বললো ' ইঞ্জিনমে পানি ঘুস গ্যায়া।'

'তাহলে এখন উপায় কি হোগা?'

'থোড়া বৈঠ যাইয়ে, ঠিক হো যায়েগা'

সেই প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টির মধ্যে, নিশ্ছিদ্র, বিরামহীন ধারাপাতের মধ্যে, অটোর মধ্যে কাটানো নীরব আতঙ্কের মুহূর্তগুলি অনেকদিন মনে থাকবে।

তা সব দুর্ভোগেরই শেষ থাকে, নইলে মানুষ পরের দুর্ভোগে পড়ে কি করে? ফলে মিনিট পাঁচেক পর বরুণদেব সামান্য ক্ষান্তি দিলে রাস্তার ওপর জলের লেভেল কিছু কমলো। স্টার্টের হ্যাণ্ডেল টানাটানি করে অনেক পরিশ্রমে অটো স্টার্ট নিলে কণ্ঠাগতপ্রাণ খানিকটা স্বস্তি পেলো। আরো পঁচিশ তিরিশটি উদ্বিগ্ন মিনিটের পর অটো আমার বাসস্থানে ঢুকলে টের পেলুম হাতে পায়ে সাড় ফিরে এসেছে।

তখন বৃষ্টিও গেছে থেমে আর ভাড়া উঠেছে দেখলাম একশো সাতাশ টাকা।

এইবার মনে মনে প্যাঁচ কষতে লাগলুম ব্যাটাচ্ছেলের সঙ্গে কতটা দরাদরি চলবে। বৃষ্টির মধ্যে দাদর থেকে পাওয়াই এসেছে, অনেকখানি রাস্তা। আড়াইশো তিনশো তো চাইবেই, পাক্কা। কলকাতার ট্যাক্সি হলে তো এরকমই চাইতো। আমি দেড়শো থেকেই শুরু করি, না কি? পকেটে দেখি দৈবাৎ একটা একশো টাকা আরেকটা পঞ্চাশের নোট রয়ে গেছে। মানে আমাকে পাঁচশো বা দুশোর নোট দিতে হচ্ছে না, অর্থাৎ নেগোশিয়েশনের রাশ আমার হাতেই রইলো, কেমন?

এতটা ভাবতেই, বুঝলেন, বুকে দুনো বল এলো। নিজের এলাকা, সিকিওরিটি আছে, আলোকোজ্জ্বল পাওয়াইয়ের রাস্তায় আমি কি নেপোলিয়নের চেয়ে কম কিছু, অ্যাঁ? আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?

খুব স্টাইলে তার দিকে দেড়শো টাকা এগিয়ে দিয়ে বীরদর্পে ওয়েট করতে লাগলাম। দেখি, লোকটা কোথা থেকে শুরু করে।

তা লোকটা শুরু করলো বটে। টাকাটা নিজের ওয়ালেটে ঢোকালো। তারপর একটা কুড়িটাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তিন রুপেয়া দে রাঁহা হুঁ'!!

ঘোর কাটতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিল!

না, যতটা পাষণ্ড আমাকে দেখায় ততটা আমি নই। সেই তেইশ টাকা তাকে দিয়ে এসেছিলাম, টিপস হিসেবে। নিজে যা লজ্জা পেয়েছিলুম সে কথা না হয় থাক!

ঘটনা দুইঃ এটি আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা। ইনি একটু অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ বলে কুলোকে এঁকে চালবাজ, ঢপমাস্টার, বখতিয়ার খিলজি ইত্যাদি নানাবিধ অন্যায্য আখ্যায় ভূষিত করে থাকেন। গল্পটা তাঁর জবানীতেই বলি। বাই দ্য ওয়ে এতে কিন্তু মুম্বাই অটোর গুণগান নেই, নেহাতই গল্প।

'থার্টি ফার্স্টের নাইট বুঝলি। বিকেল নাগাদ আমার গাড়িটা নিয়ে তিন বন্ধু বেরিয়েছি। প্রথমে গেলাম মেরিন ড্রাইভ, সেখানে চৌপাট্টিতে বসে একটা ফুল বিপি নামালাম। তারপর সেখান থেকে কোলাবা, প্যারামাউন্ট বার। সেখানে তিনজনে তিন তিরিক্কে ন'টা ট্যাকিলা শট মেরে খানিকক্ষণ উদমা নাচলাম। তারপর আবার ড্রাইভ করে আন্ধেরি, সেখানে আহলুওয়ালিয়ার বাড়ির পার্টিতে। সে ব্যাটা আমার জন্যেই নাকি ভালো স্কচ আনিয়ে রেখেছিল, আর তুই তো জানিস স্কচ আমার একমাত্র দুর্বলতা। তবে বেশি না, পাঁচ পেগের থেকে এক ফোঁটা বেশি খাইনি, একথা আমি হলফ রেখে বলতে পারি। যাই হোক, তারপর ঘাটকোপারে নাইট ক্যুইন ডিস্ক।

সেখানে কার সঙ্গে গেসলুম আর কি কি খেয়েছি, সত্যি কথা বলতে কি ভাই একদম মনে নেই। ইন ফ্যাক্ট কি কি করেছি তাও যে মনে আছে বিশেষ তাও নয়। শুধু খেয়াল হলো যে রাত প্রায় বারোটা বাজে, আর ঠিক এইসময় মুম্বাই পুলিশ সবকটা মোড় নাকাবন্দি করে আর মাতাল ড্রাইভার ধরে। একবার ধরতে পারলেই চিত্তির। ব্রেদ অ্যানালাইজার নিয়েই দাঁড়ায়, আর সুমুন্দির পো'দের কোনও মায়াদয়া নেই। কোনও পলিটিকাল দাদাকে ধরে কিছু করা যায় না, স্রেফ শ্রীঘর। আর আমার যা অবস্থা, ব্রেদ অ্যানালাইজারের দরকার নেই, দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি এখন উড়ছি। পা দুটো যে এখনও মাটিতে লেগে আছে সেটা কিঞ্চিৎ স্বকৃত পাপের ফল বৈ আর কিছু নয়।

এসব ক্ষেত্রে রিস্ক নেয় আহাম্মকরা। অনেক ভেবে দেখলাম যে আমি অনেক কিছু হতে পারি, কিন্তু আহাম্মক নই। ফলে একটা অটো নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

রাস্তায় যেতে যেতেই বুঝলাম আমার অনুমান কত নির্ভুল। প্রতিটা মোড়ে মোড়ে মামু দাঁড়িয়ে, প্রাইভেট কার দেখলেই 'থাম্বা রে থাম্বা' করে এগিয়ে এসে খপাৎ করে জাল ফেলছে আর ড্রাঙ্ক ড্রাইভার তুলছে। অটো, বা ট্যাক্সি বা হায়ার্ড ক্যাবগুলোকে অবশ্য কিছু বলছে না, জানে যে সওয়ারি মাতাল বলেই গাড়ি বা অটো ভাড়া করেছে।

আমি তো ভাই দেখেশুনে বুঝলাম কি বাঁচান বেঁচে গেছি। এই অটো না থাকলে আজ আমি এতক্ষণে থানায় বসে হাপু গাইছি।

মুশকিল হলো সকালে, বুঝলি। খোঁয়াড়ি কাটার পর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে অটোটাকে দেখে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না যে অত রাতে অটো চালিয়ে আমি এতটা রাস্তা এলাম কি করে?

আর তার থেকেও বড় কথা, অটোটা কার!'

মুম্বাইয়ের অটো নিয়ে তো শুনলেন। এবার শুনুন মুম্বাইয়ের লাইফলাইন, লোক্যাল ট্রেনের কথা।

মুম্বই মহানগরীর প্রাণভোমরা হচ্ছে তার লোকাল ট্রেন সার্ভিস। দুরন্ত গতিময় এই শহর কখনও থামে না এমনিতে, সে সন্ত্রাসবাদী হামলাই হোক আর অতিবর্ষণ। কিন্তু যদি লোকাল ট্রেন থেমেছে, তো ব্যাস,আকা মুম্বই বন্ধ, বিড়ু ! লোকাল হলো মুম্বইএর লাইফলাইন, সাতরাজার ধন এক মাণিক, অন্ধের যষ্টি, বুকের পাঁজর। মুম্বাই লোক্যালের স্পিরিটভোমরা ধরা আছে এই বিজ্ঞাপনী প্যারডির মধ্যে,''ডর কে আগে জিত হ্যায়/ দাদর কে আগে সীট হ্যায়''

ঢাকার আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় দেখে নাকি জনৈক বিবসনা সাধু অত্যাশ্চর্য একটি মন্তব্য করেছিলেন, 'অ্যায়সা কাম সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে কোঈ নেহি কিয়া', এই ঘোর কলিতেই প্রথম। মুম্বই লোকালের মতন এমন বহুবর্ণ বিচিত্র প্রতিষ্ঠান দেখে তিনি কী বলতেন সে ভাবতেও রোমাঞ্চ জাগে। মুম্বাই লোকাল ট্রেন নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায়। চলমান ভারতবর্ষ বলতে যদি কিছু বোঝায় তো তার নাম মুম্বাই লোকাল।

ইতিহাসের জানকারি রাখনেওয়ালা প্রাজ্ঞ জনগণ নিশ্চয়ই জানেন ভারতবর্ষে প্রথম ট্রেন চলে মুম্বইতে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস বা ভিটি (তখন নাম ছিল বোরি বন্দর) থেকে থানে অবধি। অবিশ্যি সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। ভিটির নাম পালটে হয়েছে সিএসটি, ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস। কুলোকে অবশ্য বলে এটাই ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সেক্স চেঞ্জ অপারেশন, তবে সে কথায় কান না দেওয়াই মঙ্গল। এই লাইনটি বর্তমানে সেন্ট্রাল লাইন বলে পরিচিত।

আগেই বলেছিলাম, তিনটি লোকাল লাইন আর দুটি এক্সপ্রেসওয়ে, এই পঞ্চপাণ্ডব মিলে মুম্বইয়ের ভূভার বহন করেন। এদের মধ্যে বয়সে ও পদমর্যাদায় সেন্ট্রাল লাইন হলেন নৈকষ্যকুলীন। এর পর আছেন ওয়েস্টার্ন লাইন, মুম্বইয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে। এঁয়ার দৌড় চার্চগেট থেকে ভিরার অবধি। আর নবীনতম সদস্য হচ্ছেন হারবার লাইন, নভি মুম্বইবাসীদের জন্যে। এঁর বিস্তার সিএসটি থেকে পানভেল অবধি।

একটা জিনিস জানিয়ে রাখা ভালো, এই পাঁচটি জনগণপথই উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। মুম্বই শহরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়া অনেক হ্যাঙ্গাম মশাই। ভাইসি ভার্সা পশ্চিম থেকে পূবেও তাই, তবে কিনা আজকাল একবার পশ্চিমে পাড়ি জমাতে পারলে কেউ পূবে বিশেষ ফিরছে টিরছে না দেখে বাহুল্যবোধে আর উল্লেখ করিনি!

তা এই তিনটি লাইনের মধ্যে অবশ্য ভাবভালোবাসার কমতি নেই। ওয়েস্টার্ন লাইন যেখানে সেন্ট্রাল লাইনের বুকে গুগাবাবার শেষে সন্তোষ দত্তের স্টাইলে 'দাদারে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার নাম দাদর। এখানেই লোকে লাইন চেঞ্জ করে ওয়েস্ট থেকে সেন্ট্রাল বা সেন্ট্রাল থেকে ওয়েস্টে যায়। অতি জনবহুল, ব্যস্ত স্টেশন, তার খ্যাতি লেখার শুরুয়াতেই উল্লিখিত স্লোগানটি শুনে হৃদয়ঙ্গম হবে আশা করি। অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ হলো দাদর থেকে কল্যাণ বা ভিরারের জন্যে 'ফাস্ট' ট্রেনে (কলকাত্তাই ভাষায় গ্যালপিং ট্রেনে) যারা উঠতে পারে, তাদের দুএকজনকে ঠেলেঠুলে অলিম্পিকে পাঠাতে পারলে রেসলিং এ দু চারটে গোল্ড মেডেল নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে নেহাত অলিম্পিক ভিলেজে ভড়া পাও পাওয়া যায় না বলেই হয়তো প্রস্তাবটা খাতায় কলমেই রয়ে গেছে।

হারবার লাইন যেখানে প্রেয়সীর মতন সেন্ট্রাল লাইনের গায়ে সাগর জলে সিনান করা মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে, তার নাম কুরলা। এও বেশ জনবহুল স্টেশন বটেক। তবে হারবার থেকে ওয়েস্টার্ন লাইন যাওয়া অবশ্য অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে আন্ধেরি কোথায়, বা কুরলা কোথায় থাকতে পারে।

তারপর দেখতে হবে ওয়াডালা কই। তারপর দেখতে হবে সেই হিসেব মতন যখন আন্ধেরি কি কুরলা থেকে যখন ওয়াডালা গিয়ে পৌঁছবে, তখন ট্রেন কোথায় থাকবে...

পাতি কথা বলছি দাদা, নেহাত বাধ্য না হলে লোকে অটো নিয়ে নেয়!

মুম্বই লোকালের খ্যাতি অবশ্যই তার ভীড়ের জন্যে। মুম্বই লোকালের ভীড় আধুনিক ভারতের একটি আর্বান লিজেণ্ড বিশেষ। প্রায় আড়াই হাজার লোকাল ট্রেন সর্বসাকুল্যে রয়েছে মুম্বইতে, ভোর চারটে থেকে রাত একটা অবধি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। রোজ কত লোক যাতায়াত করেন জানেন? মাথাটা চেপে ধরুন, বাঁই করে ঘুরে গেলে কম্পানী দায়ী নহে!

পঁচাত্তর লাখ!

মানে এক বছরে আড়াইশো কোটির একটু বেশি, পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ!

যাকগে, এসব নাম্বারের কচকচি বাদ দিয়ে মুম্বই লোকালের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের গল্পটাই না হয় বলি।

প্রথম যখন এই মহানগরীতে পদার্পণ করি, সেটা ছিল দশ বছর আগে, দুহাজার ছয় সালে, সামার ট্রেনিং নিমিত্ত। তা প্রথম দিন তো এয়ারপোর্ট থেকে নেমে সোজা অফিসে গেছি। আমাকে আমার তদানীন্তন বস তথা গাইড বললেন যে 'ভাইটি, কাল সকাল দশটা নাগাদ ঘাটকোপার থেকে ট্রেন ধরে সিএসটি এসো। কোলাবা মার্কেট ভিজিটে যাবো'। তা আমিও তো সুবোধ বালকের মতন পরের দিন ছানটান করে চুল আঁচড়ে খেয়েদেয়ে, ঘাড়েমুখে পাউডার বুলিয়ে স্টেশনে গিয়ে তো হাজির।

গিয়েই দেখি, উরিত্তারা! ই কি? সারা স্টেশন জুড়ে থিকথিক করছে লোক, কিলো কিলো প্যাসেঞ্জার মশাই ! দুর্গাপুজোয় অষ্টমীর দিন সুরুচি সঙ্ঘ আর একডালিয়া এভারগ্রীনের মিলিয়ে যা ভীড় হয়, তার চারগুণ বললেই চলে। অফিস টাইমে শ্যালদা দেখেছি, এ তো তার এককাঠি নয়, রীতিমতো একবাঁশ ওপরে!

তা ভাবলুম হয়তো কোথাও কোনও জনসভাটভা আছে। এই ট্রেনটা ছেড়ে দিই, পরেরটায় বেশ আয়েশ করে যাবো না হয়।

তা তিনি এলেন। আগমন নয়, আবির্ভাব বললেই চলে। তিনি আসছেন এই খবর চাউর হতেই লোকজন দেখি সব স্ট্র্যাটেজিক পজিশন নেওয়া শুরু করেছে। সে কি একাগ্র লক্ষ্য, সে কি একরোখা তেজী ভাব, সে কি ভীতিপ্রদ চাউনি, দেখলে ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা তিনটেই জাগে।

তা তিনি যখন এলেন, ও হরি দেখি তিনিও তদ্রুপ! ট্রেনের কামরার ভেতরে থিকথিক করছে লোক। বেশ কয়েকজন বাইরেও ঝুলছে। দুএকজনকে স্পষ্ট দেখলুম কোনও অবলম্বন ছাড়াই ঝুলতে, ভেতর থেকে কেউ কলার ধরে টেনে রেখেছে, তাই বাঁচোয়া!

এইবারে আমার মনে গূঢ় চিন্তার উদয় হলো। সহৃদয়া পাঠিকা জানেন, চিরকালই পরের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে। ভাবলাম, তাই তো, এইবার এই এত লোক যাবে কি করে? অনেকেরই তো আর্জেন্ট কাজও থাকতে পারে। ইনটারভিউ, হাসপাতাল, মিটিং, ইলেক্ট্রিক বিল, বসের বাড়ির বাজার করে দেওয়া, মায় গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে ডেটিং অবধি, কিছু না কিছু তো আছেই।

ও মা, ভাবতে ভাবতেই দেখি মিনিটের মধ্যে সেই এক প্ল্যাটফর্ম লোক দিব্যি ট্রেনের মধ্যে সেঁধিয়ে প্ল্যাটফর্ম পুরো ফরসা, ট্রেনও দেখি সেই কলারের ওপর ভরসা করে ঝুলতে থাকা ছোকরাকে নিয়ে ধাঁ! যদি ওই এক প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোক যদি ট্রেনের মধ্যে সেঁধুতে পারে তাহলে ট্রেনের ভেতর কারা ছিল? যদি ওই ট্রেনে ভর্তি লোকই থাকবে তো প্ল্যাটফর্মে কারা ছিল? তিনকেজির বিড়াল যদি এককেজি মাংস খাওয়ার পরেও যদি তার তিনকেজি ওজন হয় তাহলে মাংসটা গেলো কই? ডিমনির পরেও যদি সেই পুরো পনেরো হাজার কোটিই ফিরে আসে তাহলে ব্ল্যাক মানি....

খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে চেয়ে থাকার পর বুকে একটু নিশ্চিন্দির ভাব এলো। যাক, প্রায় ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম, পরের ট্রেনে উঠতে কষ্ট হবে না। কিন্তু...দেড় মিনিট। ঠিক দেড় মিনিট। ফের পিলপিল করে লোক এসে

ঘাটকোপার স্টেশন যেন ব্রিগেডের জনসভা!

কবি লিখেছিলেন আধুনিক জীবনে মানুষের শোকের আয়ু দেড়দিন। মানুষের সুখের আয়ু যে দেড় মিনিট, সেটা কেউ কোথাও লিখে যাননি। লিখে রাখা উচিৎ ছিল! এর পর কি করে অকুস্থলে পৌঁছই তার বিবরণ চেয়ে সুধী পাঠিকা আমাকে বিপদে ফেলবেন না বলেই বিশ্বাস রাখি!

মুম্বই লোকালের প্রতিটি কামরা আদতে এক একটি মিনি ভারতবর্ষ। সুবেশ টাইধারী বাঙালি কর্পোযুবার পাশেই দেখবেন প্রৌঢ় গুজরাটি শেয়ার ব্রোকার, মালয়ালী দোকানদারের পাশে আধঘুমন্ত বিহারি ড্রাইভার, মারাঠি গৃহপরিচারিকার কোল ঘেঁষে পাঞ্জাবী উঠতি অভিনেত্রী। ভাষা, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি, জীবিকা সবকিছু দিয়ে সঞ্জীবিত বহুবিচিত্র ভারতভূমির এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর কোথাও পাওয়া যায় না বলেই বিশ্বাস। কার ঘাম কার ঘাড়ে, কার আঙুলের ওপর কার পা, কার কাঁধে কার মাথা বোঝা দায়। আর মুম্বই এর যা বৈশিষ্ট্য, কেউ কারো পারসোনাল স্পেসে হানা দেয় না। কলকাতার মতন এখানে সম্পূর্ন অনাত্মীয় সহযাত্রীর সঙ্গে ধোনির রিটায়ারমেন্ট টু ডিমনিটাইজেশন, সারদা টু শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ভাবাই যায় না! ওই প্রচণ্ড চাপাচাপি গরমে বেশিরভাগই মোবাইলে গান শুনছে, বা গেম খেলছে বা ফেসবুক করছে দেখতে পাবেন। বৃদ্ধারা হয়তো বাবা রামদেবের জীবনচরিত পড়ছেন, তার পাশের উদ্ভিন্নযৌবনা খুকিটি হয়তো পেন্টহাউস লেটার্স, কারোরই কিছুতে কিছু এসে যায় না! বিগতযৌবন লোকটি হয়তো খবরের কাগজে মন দিয়ে শেয়ারের ভাও দেখছেন, সেই পেপারেরই পাশের পেজে মল্লিকা শেরাওয়াতের স্বল্পবসনা ছবিতে মগ্ন এক ইউপি'র যুবক, এ খুবই স্বাভাবিক দৃশ্য। এহ বাহ্য, আমি নিজে স্বচক্ষে চিঁড়েচ্যাপটা ভীড় ট্রেনে এক স্থূলাঙ্গী মারাঠি মহিলাকে সিটে বসে বাড়ির আনাজপাতি কাটতে দেখেছি, অন্য পরে কা কথা! মোটমাট মুম্বই লোকালে পূজা-নমাজ, শৌচকার্য আর নিজ পার্টনারের সঙ্গে ঝিঙ্কুলুলুটুকুই যা করা যায় না আর কি!

মুম্বইয়ের জীবনযাপনের এক অন্যতম লক্ষণ হলো নন-ইন্টারফেয়ারেন্স। কেউ কারও বিষয়ে আগ বাড়িয়ে উদগ্র কৌতূহল প্রকাশ করতে যায় না। লিভ অ্যান্ড লেট লিভ, তুমি কি আমার পর? এই হচ্ছে মুম্বইয়ের আত্মার মূল কথা। মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনও তার ব্যত্যয় নয়। এই প্রসঙ্গে পড়ে গেলো, আমার এক মুম্বইবাসী বন্ধু কর্মব্যপদেশে একবার কলকাতা যান, ডেরাডাণ্ডা বাঁধেন পিয়ারলেস ইনে। তা কোনও এক মিটিঙে তাঁকে যেতে হবে সল্টলেকে, এদিকে শখ কলকাতার মেট্রো চড়বেন। আমি মশাই ভারি পরহিতৈষী মানুষ, একবার জিগাতেই এসপ্ল্যানেড থেকে মেট্রোতে শোভাবাজার, আর তারপর সেখান থেকে অটো ধরে উল্টোডাঙা হয়ে কি করে সল্টলেক যাওয়া যায় বাতলে দিলুম।

তা সন্ধ্যেবেলা যখন তত্বতালাশ নিচ্ছি, তিনি ভারী গোমড়ামুখে বললেন 'তোমরা বাঙালিরা কার্টেসি জানো না।'

এই রে! হঠাৎ এহেন অভিযোগ?

জিজ্ঞাসাবাদের পরে প্রকাশ পেলো, তিনি এসপ্ল্যানেডে উঠেই দরজার পাশে একটা সিট পেয়ে সেখানে জমিয়ে বসে নিজের প্রেয়সীকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি রগরগে মেসেজ করছিলেন। অনেকটা লিখে ফেলার পর হঠাৎ কাঁধে একটা টোকা পেয়ে চমকে দেখেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন। 'ইয়েস, হোয়াট হ্যাপেন্ড' এর উত্তরে সেই ভদ্রলোক জানান যে তিনি একজন প্রাইভেট টিউটর এবং বন্ধুবর এতক্ষণ যা যা লিখেছেন তার গ্রামারে নাকি গণ্ডাখানেক ভুল! আর ম্যাস্টারবেশন শব্দটার স্পেলিং কি করে এক নব্যযুবা ভুল করতে পারে সেটা উনি ভেবেই পাচ্ছেন না! হতভম্ব বন্ধুটি কিছু জবাব দেওয়ার সুযোগই পাননি, কারন এর পরই নাকি আরেক ভদ্রলোক, যিনি নিজেও লেখাটা ওঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে পড়ছিলেন, তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ওল্ড ইংলিশ স্পেলিং অ্যান্ড নিউ ইংলিশ স্পেলিং নিয়ে কামরাতে ধুন্ধুমার বেঁধে যায়! শেষে দুজনেই পরস্পরের দিকে যথাক্রমে নেসফিল্ড এবং রেন অ্যান্ড মার্টিন ছুঁড়ে মারলে সেদিনকার মত ঝগড়ার ইতি হয়!

মুম্বইতে আর একটি ভারী ভালো অভ্যাস আছে। চট করে এখানে রাস্তা, স্টেশন ইত্যাদির নামকরণ করা হয় না। একেবারে যে হয়না তা নয়, তবে কলকাতায় যেমন আপনি রাত্তিরে কলু মিস্ত্রি লেনে ঘুমোতে গেলেন, আর সকালে উঠে দেখলেন তার নাম বদলে হয়েছে দেশবরেণ্য লোকনায়ক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সরণি, এখানে তেমন এপিডেমিক হারে হয় না। রাজনৈতিক নেতাদের হুঁশপর্ব কিছু আছে, বেকার অপ্রয়োজনীয় কাজে ত্যানা প্যাঁচান না। সাকি নাকা বোধহয় সেই আদি অনন্ত কাল থেকেই সাকি নাকা। মালাড বা ভিরার অথবা পাওয়াই এর নাম বোধহয় গত একশো বছরে বদলায় নি। কোলাবা কি মালাবার হিলসের উল্লেখ তো বোধহয় ঋকবেদেও পাওয়া যাবে বলে আমার সন্দেহ! মুম্বই বোঝে এসব ফালতু কাজে দিমাগ না লাগিয়ে শেয়ার বাজারে লাগালে বরং দুটো পয়সা ঘরে আসে। নইলে নিদেনপক্ষে অন্তত মাটুঙ্গার নাম বদলে কি বালাসাহেব ঠাকরে ধরণী করা যেত না?

তা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোন নামই বজায় আছে, মাঝেমধ্যে একই স্টেশনের নাম তিনটে বিভিন্ন ভাষায় শুনলে চমক লাগে। যেমন যে স্টেশনের নাম ইংরেজিতে স্পষ্টাক্ষরে ঙ্কাত্বন্ডননখ লেখা আছে, ও আপনি বাইকুল্লা বাইকুল্লা জপতে জপতে বলে নামবেন বলে রেডি হচ্ছেন, তার নাম অ্যানাউন্সড হলো 'ভায়খালা', ওটাই আদত মারাঠি উচ্চারণ কি না! তারপর ধরুন সায়ন। ইংরেজিতে বলে সিয়ন, হিন্দিতে সায়ন, মারাঠিতে শীন! আর তো আর, বহুখ্যাত বান্দ্রা স্টেশনের নামই তিন আলাদা উচ্চারণে শুনতে পেয়ে রীতিমতো আমোদ পেয়েছিলুম মনে আছে, বান্দ্রা, ব্যান্ড্রা, ওয়ান্দ্রে!

আবার অনেক অদৃশ্য স্টেশনের অস্তিত্বও মুম্বইয়ের শতাব্দী প্রাচীন ট্রেনলাইনে বর্তমান। দাশনগর থেকে হাওড়া ঢোকার মুখে যেমন 'একটু দাঁড়া', 'আবার দাঁড়া' এবং 'দাঁড়া ** ' নামের তিনটি আধিভৌতিক স্টেশনের জন্ম দিয়েছেন ডেলি পাষণ্ডরা, ইহারাও তেমনি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অবশ্য, বোরিভিলি আর কান্দিভিলির মাঝের অনির্দেশ্য স্টেশনটি, রসিক মারাঠি যার নাম দিয়েছে থাম্বিভিলি!

যাকগে, অনেক প্যাচাল পাড়লাম। কি করি, বয়েস বাড়ছে, পেটে দুপাত্তর পড়লেই কথায় পেয়ে বসে। তা মুম্বই লোকাল নিয়ে নানা কিসসা মুম্বইয়ের অলিগলিতে উড়ে বেড়ায়। তারই দুয়েকটা উমদা নমুনা রসিকজনের খিদমতে পেশ করে দাঁড়ি টানবো।

ইউপির গ্রাম থেকে এক 'ভাইয়া' এসেছেন মুম্বইতে রিস্তেদারের সঙ্গে মোলাকাত করতে। তারপর যথারীতি বেরিয়েছেন মুম্বই দর্শনে। ভিকরোলি থেকে ট্রেন ধরেছেন, কুরলা নামবেন। তা ইনি মুম্বই লোকালের বীভৎস ভীড় নিয়ে নানা সত্যিমিথ্যে মনগড়া গল্প শুনে তো যথেষ্ট নার্ভাস। সব্বাইকে বারবার বলছেন কুরলা এলেই যেন ওঁকে বলে দেওয়া হয়। তা দেহাতি ভাষায় নানাবিধ কাতর অনুরোধ শুনে দয়ার্দ্র হয়ে লোকজন ওঁকে ঠেলেঠুলে দরজার কোণে এনে সেট করে তো দিলো। এরপর নানাবিধ উপদেশ, যেই ট্রেন স্টেশনে ঢুকে একটু আস্তে হবে, তক্ষুণি যেন ইনি আলতো করে প্ল্যাটফর্মে নেমেই যেদিকে ট্রেন যাচ্ছে সেদিকে ছুটতে থাকেন, নইলে মুখ থুবড়ে পড়বেন, ইত্যাদি প্রভৃতি।

এবার ট্রেন যেই কুরলা স্টেশনে ঢুকে একটু স্লো হয়েছে, ভদ্রলোক নেমেই দৌড়তে লাগলেন, একদম ট্রেনের সঙ্গে, প্যারালাল করে। খানিকটা দৌড়ে থেমে গেলেই হতো, কিন্তু ভদ্রলোক খুব সম্ভবত নানা উদ্বেগ আর উপদেশে সামান্য ইয়ে হয়ে গেছিলেন, তিনি সমান তেজে দৌড়তেই থাকলেন। এদিকে ট্রেন ক্রমশ আরও স্লো হয়ে আসছে। ভদ্রলোক যেই দৌড়তে দৌড়তে পরের কামরার কাছে পৌঁছেছেন, সেখানকার লোকজনের দয়ার শরীর, ভেবেছে লোকটা ট্রেন ধরতে দৌড়চ্ছে, সক্কলে মিলে হাত বাড়িয়ে টুক করে ফের কামরায় তুলে নিয়েছে!

তারপর সে কি ধুন্ধুমার কাণ্ড! ভদ্রলোক শেষে হাঁউমাউ করে, টিকিট দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ছাড়ার জন্যেই দৌড়চ্ছিলেন, ধরার জন্যে না। শেষে কামরাভর্তি হো হো হাসি, ক্যাটকল ও হুইসলধ্বনির মধ্যে তাঁকে পরের স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয়।

ট্রেন সম্পূর্ণ থামলে!

পরেরটা আমার এক বন্ধুর চোখে দেখা। তার জবানীতেই বলি।

'থানে থেকে বিদ্যাবিহার যাবো, ট্রেনে চেপেছি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছি, এমন সময় মুলুন্দ থেকে এক ব্রাউন সাহেব উঠলেন। ধোপদোরস্ত জামাকাপড়, স্যুটটাই পরিহিত, চোখে দামি গগলস, চকচকে জুতো। তিনি উঠেই আমার উল্টোদিকে দাঁড়ালেন। কানে একটা ব্লুটুথ লাগালেন তারপর পকেট থেকে মোবাইল বার করে কাকে কল করে মোবাইলটা পকেটে রেখে 'হ্যালো, হ্যালো' করতে লাগলেন।

মুলুন্দ থেকে ভাণ্ডুপের মাঝে সব অপারেটরেরই সিগন্যাল খুব উইক থাকে। তা ইনি বোধহয় সেটা জানতেন না। তিনি হ্যালো হ্যালো করে চেঁচিয়েই যাচ্ছেন, ওদিক থেকে নো উত্তর অ্যান্ড অল।

এমন সময় উলটোদিক থেকে এলো সিএসটি থানে ফাস্ট লোকাল। এখন কেসটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল লাইনের ট্র্যাকগুলো পুরোনো বলেই একটু কাছেকাছে। ফলে দুটো ট্রেন বিপুল বেগে পাশাপাশি চললেই প্রবল হাওয়ার উৎপত্তি হয়, উলটোদিকে চললে তো কথাই নেই! এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না, এবং সেই প্রবল বায়ুবীচিমালায় অনেক কিছুই আন্দোলিত হইতে দেখিয়াছি, চাচার অসংবৃত লুঙ্গি হইতে মামণির স্কার্ট অবধি। তাতে যে কথাও উড়ে যায় তিনি বোধহয় খেয়াল করেননি, যথারীতি হ্যালো হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি, করে চলেছেন। গলার পর্দা ক্রমশ ওপরে চড়ছে। শেষে সেই হ্যালোনাদ যখন সমস্ত কামরা প্রকম্পিত করতে লাগলো, তখন তেনার পার্শস্থ এক প্রৌঢ় আধোঘুম ভেঙে তাঁর কাঁধে টোকা দিলেন, এবং কানের দিকে ইঙ্গিত করে ঋষিতুল্য নৈর্ব্যক্তিক সুরে জানালেন,

'বস, উড় গ্যায়া!'

মার্কেট ভিজিট ৭

সে বড় সুখের ভিজিট নয়, সে বড় আনন্দের ভিজিট নয়!

আগেই বলেছি, এমবিএ করে বেরিয়েই আমার প্রথম পোস্টিং ছিল বিহারে, একটি বিখ্যাত পেইন্টস কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার হয়ে।

তখন বিহারে লালুর জঙ্গলরাজের শেষ লগ্ন, কয়েকদিন বাদের নির্বাচনে বিপুলভাবে জিতে আসবেন কুর্মিপুত্র নীতিশ কুমার। দেওয়ালে দেওয়ালে সে লিখন স্পষ্ট। ''যব তক রহেগা সামোসেমে আলু'' এই ঘোষণা করে যিনি নিরবধিকাল নিজেকে বিপুল মগধ সাম্রাজ্যের আমৃত্যু একচ্ছত্রাধিপত্যের মৌরসিপাট্টা দিয়েই রেখেছিলেন, বোঝা যাচ্ছিলো তার ক্যারিশমামিশ্রিত কমিক ম্যানারিজম আর কাজ করছে না। ইন্ডাস্ট্রি বলতে সুপারি কিলিং আর কিডন্যাপিং। সন্ধ্যে সাড়ে ছটার পরে পাটনার বোরিং রোডের মতন ''পশ'' এলাকাতেও কেউ আর বাইরে বেরোয় না। আত্মরক্ষার জন্যে সব বাড়িতেই খুঁজে পেতে দেসি কাট্টা, বা দোনালিয়া মজুত। চূড়ান্ত অরাজক মাৎস্যন্যায়।

উত্তর-পূর্ব বিহার আক্ষরিক অর্থেই 'যাদবপুর'। মাধেপুরা, সুপৌল, সহরসা, পূর্ণিয়া, কিষণগঞ্জ, এই বিস্তীর্ণ কোশি বেল্ট জুড়ে যাদবজাতির অপ্রতিহত দাপট। লালু থেকে শরদ, যাবতীয় যাদবকুলপতি আজও এই এলাকা থেকেই ভোটে জিতে আসেন। কিন্তু সেইবারেই বুঝেছিলাম লালুর পতন আসন্ন। গ্রামেগঞ্জে ''বারগত পেড়'', অর্থাৎ বটগাছের নিচে গাঁওবুড়াদের হুঁকো মীটিংএ শামিল হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওনারাও এই ''পঢ়ালিকখা'' কচিসাইজের ''বংগালি মানিজার বাবু''টিকে বসিয়ে ঘন সরওয়ালা দুধ (''কিতনা দুবলা হোরে বাবুনা'') খাইয়ে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন কেন এই সমগ্র যাদবকুল এইবারকার 'ইলেকসনওয়া মে' কুর্মিহৃদয়সম্রাট নীতিশ কুমারকে ভোট দেবেন। আর এই লালুশাসিত ''রাকশস রাজ'' যাদবদের মধ্যে কি সাংঘাতিক মৌষলপর্ব এনে দিয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ উত্তরভারতে এখনো ধর্ম, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও স্থানিক বিশ্বাসের দাপট দেখলে মলশোভিত, পণ্যফেটিশাক্রান্ত শাইনিং আরবান ইন্ডিয়া আর গাঢ় জাতিভেদপ্রথার নিগড়ে বাঁধা গ্রামীণ ভারতের দুস্তর ব্যবধান স্পষ্ট হয়। আমাদের শৌখিন শহুরে রাজনীতি আর এই রংরেজ দেশের রঙিলা ''পরজা-তন্তরের'' মধ্যে কি আকাশপাতাল তফাৎ সে আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

তা সেই টালমাটাল দিনগুলির মধ্যে এক পড়ন্ত ফেব্রুয়ারিতে মার্কেট ভিজিট ঠিক হল বেতিয়াতে। বেতিয়া হল পশ্চিম চম্পারণের ডিস্ট্রিক্ট টাউন, উত্তর পশ্চিম বিহারে। সেখানে দুদিন আগেই জয়েন করেছিলো হিমাংশু কুমার নামের এক নবীন সেলস অফিসার। তার সংগে মোলাকাত করাও জরুরী ছিল খুবই।

পটনা থেকে বেরিয়ে উত্তর এবং পশ্চিম বিহারে যেতে গেলে সবার আগে পেরোতে হয়, একটি দ্রষ্টব্য বস্তু,তার নাম গঙ্গাপুল।

গঙ্গাপুল হচ্ছে পাটনা থেকে উত্তর এবং পশ্চিম বিহারে যাবার একমাত্র সেতু। ব্রিটিশ আমলে বানানো মাল, লম্বায় এগারো কিলোমিটার। সেতুর দু অংশের মাঝের স্ল্যাবগুলি নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে সদাসর্বদা আঁখমিচোলি খেলতেই থাকে। ফলে সর্বক্ষণ আপনি ব্রিজের ওপরে গাড়িতে চলাকালীন গাড়ির চাকার নিচে মা গঙ্গাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে সুরধুনী গঙ্গাস্তোত্র আউড়ে পুণ্যার্জন করে ফেলতে পারেন। পড়ে গেলে ডাইরেক্ট বৈকুণ্ঠ, আর ভয় পেলে কিন্তু খেলবো না!

পটনা থেকে প্রথমে গেলাম মুজাফফরপুর। তখন সময় লাগতো ঘন্টাতিনেকের ওপর, (মানে গঙ্গাপুলের ওপরে জ্যামে না আটকালে। আটকালে নো টাইমলাইন। আমার চেনা এক এরিয়া ম্যানেজার একবার এই

গঙ্গাপুলের জ্যামে সন্ধ্যে সাতটায় আটকে পরের দিন সকালে পটনায় ঢুকেছিল)।

মুজাফফরপুরে দুদিন উস্তমকুস্তম ম্যানেজারগিরি করে, স্থানীয় ডিলারকে স্যাক করে, ("দেখ লেঙ্গে দাদা, আপ ক্যায়সে হঁহা ধান্দা করতে হো"। ছোঃ। আমিও শালা বাঙালবাচ্চা বে। কার ইয়েতে কত দম দেখে নেবো), ইত্যাদি ঝামেলা সামলে রওনা দিলুম বেতিয়ার প্রতি।

প্রায় সারা সন্ধ্যে ধরে সাত ঘন্টার জার্নির পর যখন ভাড়া করা এসইউভিটি বেতিয়া ঢুকলো, তখন রাত দশটা।

তখন সারা বেতিয়া টাউনে একটাই হোটেল ছিলো, তার "স্যুইট রুম" বুক করা ছিলো আমার নামে।

স্যুইট রুমের সুইট বন্ননা দিয়ে আপনাদের ঈর্ষা উদ্রেক করবো না। এসি দূরস্থান। সাদামাটা ঘরে একটা ক্ষীণজীবী বালব আর একটি দুর্গমগিরিকান্তারমরু রিকেটি পাখা ঝুলছে। জল চাইলে নিচের টিউবওয়েলে ক্যাঁচক্যাঁচ করে আওয়াজ তুলে জল তুলে দিয়ে যায়, খাওয়া, স্নান, আর ইয়ে, মানে বাকি সবকিছু ওতেই!!

তবে হ্যাঁ, দারুর বন্দোবস্ত যবরদস্ত। ইলেকশনের আগের টাইম। তৎকালীন আরজেডির "এম্লেসাহিব" উদারহস্তে টাকাদারুমাংস বিলোচ্ছেন। আমার হোটেলওয়ালা এসে এক বোতল ব্ল্যাক ডগ, দেহাতিস্টাইলে ভাজা ঝাল ঝাল দেশি মুরগির মাংস ভাজা আর স্টিলের বাটিতে বরফের টুকরো দিয়ে গেলেন। সেই সব খেয়ে, তারপর দুর্ধর্ষ ভালো চিকেন কলেজা (মেটে)র ঝাল তরকারি, উরৎকা দাল (অড়হর ডাল) আর ফুলকা রোটি খেয়ে "হোগা উব্বুত কইর‍্যা" ডীপস্লিপ নিদ্রাযাপন।

পরের দিন সকালে সোজা মার্কেট।

সাদামাটা মার্কেট। নবীন সেলসকিশোরটিও দেখলাম ভুবনডাঙার মাঠে খেলুড়ে পাবলিক। ফলে বিশেষ কিছুই শেখাবার নেই। চৌখস ছেলে।

দিনের শেষে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে হিমাংশু, কাছেপিঠে কোন অপকান্ট্রি মার্কেট আছে?

ছেলে খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে রইলো। তারপর বলল, হ্যায় এক, হরণাটাঁড় বলে, তবে সেখানে কি আমার না গেলেই নয়?

সে কি রে পাগলা? শেয়ালকে তাও ভাঙা বেড়া দেখানো যায়, বাঙালকে তো একদম না! একবার যখন সন্দেহপ্রকাশ করেছিস, তাহলে তো যেতেই হচ্ছে!!

অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে সে বলে গেলো, "ঠিক হ্যায়, চলিয়ে"।

পরের দিন সকালে স্নান করে, খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ডোবানো লিট্টি আর চোখা খেয়ে, পার্ফেক্ট স্যুটেডবুটেড বাবুটি হয়ে রেডি, এমন সময় হিমাংশু এসে আমাকে দেখেই বলল, উঁহু, এসব চলবে না।

কি চলবে না?

এই সাহেবি ড্রেস।

কেনো?

বলবো না। কিন্তু প্লিজ এসব ধড়াচূড়া ছেড়ে শস্তা দলামোচড়া শার্ট, নোংরা শাল আর হাওয়াই চপ্পল পরে যেতে হবে।

টং করে মাথাটা গরম হয়ে গেলো। তুই জানিস আমি কোত্থেকে এমবিএ করে এসেছি? আই আই এম। নাম শুনেছিস বে? তোর চোদ্দ পুরুষ শুনেছে? আমি তোর বস না তুই আমার বস? কে কার কথা শুনে চলবে র‍্যা ? আমি এই পরেই যাবো।

সে ছেলে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, চলুন তবে।

খুব যে দূরে জায়গাটা তা নয়, চল্লিশ কিলোমিটার মতন, কিন্তু রাস্তা বলে কিছু না থাকলে তো আর তার জন্যে গাড়িকে দোষ দেওয়া যায় না। ফলে ঘন্টা দুয়েক বাদে যখন হরণাটাঁড় পৌঁছে মাটিতে পা রাখলাম, তখন নিজেকে অমিতাভ বচ্চন কম, কাঞ্চন মল্লিক মনে হচ্ছিল বেশি!

আধা জঙ্গুলে আধা মফস্বল হরণাটাঁড়ে আমাদের বড় ডিলার একজনই। তার কাছে বসে ঘন্টাখানেক কথা বলে পরের জনের কাছে যাবো, রাস্তায় একটা দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় লক্ষ্য করলাম দুই মাঝবয়েসী মক্কেল আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে খৈনি টিপছে, আর মৃদুস্বরে আলোচনা করছে 'এ হে সেঠওয়া হ কা, হোরা চিট্টা, নয়া নয়া কাপড়া জুতা পহনল বা। বৈঠও একরা কে। পাঁচ দস লাখ কে কাম এয়সেহি হো যাই'। অস্যার্থ, এই কি শেঠ নাকি রে ভাই, দিব্যি ফুলবাবুটি, লতুন লতুন জামা জুতো চড়িয়ে এসেছে। ধরে বসিয়ে রাখ মালটাকে, পাঁচ দশ লাখ তো এমনিতেই এসে যাবে!

শোনামাত্র আমার ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেলো। বলে কি?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি দুটি প্রায় চল্লিশ ছোঁয়া মুশকো টাইপের লোক, সাদা ফতুয়া আর খাটো ধুতি পরা, মাথায় গামছা বাঁধা, খৈনিটা দু আঙুলে তুলে, বাঁ হাতে নিচের ঠেঁটটা একটু টেনে খৈনিটা দাঁত আর ঠেঁটের মাঝে চালান করে হাত দুটো ঝাড়তে ঝাড়তে এদিকে এগিয়ে আসছে।

দূরে দেখি আমার গাড়ির পাশে অলরেডি একটা জটলা, মানে দৌড়ে পালাবার পথও বন্ধ।

সেই দুটি খৈনিপুরুষ কাছে এসে ভারী বিগলিত হেসে বলল 'রাম রাম সেঠজি, কঁহা সে আয়েল বানি? পটনা সে?'

জীবনের সেই সংকটতম মুহূর্তে প্রথম বুঝলাম ঈশ্বর কখন কি রূপ ধরে কোন ক্যাবলাকাত্তিককে কেন কৃপা করেন তা বোঝা সত্যিই দায়।

আরও বুঝলাম, সেলস হয়তো অনেককেই ট্রেইনিং দিয়ে শেখানো যায়, কিন্তু জাত সেলসম্যান জন্মায়, তৈরি করা যায় না।

তড়িৎগতিতে হিমাংশু এগিয়ে এসে খ্যাঁক করে হেসে বলল 'আরে নাহি নাহি চাচা, ই তো নয়া সেলসম্যানওয়া হামার। বহাল ভ্যইল বানি আজ সে। ই লইকা নয়া বা। বংগাল সে আয়িল রহল। আভি তো ই হারামি টেরনিংওয়া লেত বা'।

তৎক্ষণাৎ তাদের একজন দ্রুত ঘুরে ধূর্ত কুটিলস্বরে জিজ্ঞেস করলো 'তোহার বাপু কা কর লেতানি?'

আবারও সংকটত্রাতা শ্রীমধুসূদন। হিমাংশু গভীর আক্ষেপের সংগে মাথা নেড়ে বলল 'ই কা বাবুজি তো কিসানি করেলান। নোকরি ভ্যয়ল হ তো একঠো কাপড়া সিলওয়া দেলান হ'।

তবুও জগাই মাধাইয়ের সন্দেহ যায় না, 'তোহার কিতনা তংখা মিলেলা হ?'

সর্বক্ষণ নোয়া নিজেই নৌকার হাল ধরে অবোধ অপোগণ্ডগুলিকে এই ক্ষুরস্য ধারা, নিশিত দুরত্যয়া পার করাবেন, এ আশা অত্যন্ত অনুচিত। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিংএর চারটি বছর স্রেফ নাটক আর নাট্যচর্চা করেই কাটিয়েছি, সে কথাটাও টক করে মনে পড়ে গেলো। ফলে অত্যন্ত করুন কাঁদোকাঁদো স্বরে বললাম 'মাহিনা সাড়ে চার হাজার, অউর রোজ কি খোরাকি শ'' রূপেয়া তক মিল যাতা হ্যায়। আজ তো আভি তক কুছ নেহি খায়া'।

তবু কিডন্যাপিঙের ভবী কি অত সহজে ভোলে কাকা? পরের পাক্কা এক ঘন্টা ধরে নানাবিধ ভব্য আলাপচারিতার পর প্রভুরা যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে এ ভোলানাথ সে ভোলানাথ নয়, তখন দেঁতো হাসি হেসে '' গুড বাই বাডি, কাম ব্যাক এগেইন '' টাইপের শুভাশিস ও আশির্বাণী আউড়ে আমাদের ''যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভোলেনা মোরে'' ঘেঁষা মুক্তি দিলেন।

রাতের জঙ্গুলে মেঠো রাস্তায়, ভাড়া করা গাড়ির হেড লাইটের সেই ঝিমধরা অ্যান্ড মায়াবী আলো আঁধারিয়ামোহিত ঝিঁঝিঁবহুল নিশ্চুপ সান্ধ্যজার্নিতে, আমি সন্তর্পণে সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করলাম যিনি লিখেছিলেন,

''অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।''

অথ বারমঙ্গল কাব্য

নাহ্, এ বার আদালতের বার নয়, জিমন্যাশিয়ামের প্যারালাল বার নয়, ক্যাডবেরির চকোলেট বার তো নয়ই, সাপ্তাহিক দিনের হিসেবও নয়, বুঝতেই পারছেন এখানে কোন বারের কথা বলতে চলেছি। আমার মতন অনেক অভাগার জন্যেই জীবনমরুতে এইসব মরূদ্যান হল যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী এবং জীবনান্তে ক্যাওড়াতলা। আমার এই গল্পরাজি শুধুই তাহারে লক্ষ্য করে!

ইহাতে কেহ ঘটনা খুঁজিবেন না, কারণ উহা নাই। শুধুমাত্র কিছু ভালোলাগা আপনাদের সহিত শেয়ার করিয়া লইলাম।

দুহাজার চোদ্দর প্রখর মধ্যফেব্রুয়ারি। গ্রীষ্মস্যপ্রথমদিবসে সল্টলেকের অফিসে বসে থম মেরে বসে আছি। খানিকক্ষণ আগে মোহমুদগরসম তিতিক্ষায় রিজিওনাল ডেটাধর্মাধিকরণ জানিয়ে গেছেন যে, যেভাবে সেলপত্তর চলছে,তাতে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের টার্গেট হবে না, হতে পারে না। কা তব টার্গেট, কস্তে ইন্সেন্টিভঃ ইত্যাদি ইতাদি....

শুনেই চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো।এদ্দিন ধরে ক্রেডিট কার্ডে যে চল্লিশ ইঞ্চি এলইডি টিভি,দামি মাইক্রোওয়েভ আভেন, তিনশো আশি লিটারের ফ্রিজ, এসবই কিনলুম ইন্সেন্টিভের আশায়, সে কি সবই গাধার ইয়েতে যাবে নাকি? ইল্লি আর কি!

কেবিনের দরজা বন্ধ করে এরিয়া ম্যানেজার দের কনফারেন্স কলে ধরলুম।

চল্লিশ মিনিট বাদে উদ্দাম উস্তুমকুস্তুমের পর যখন পষ্ট শুনলুম ওড়িশার এএসএম মহাপাত্র 'হায় জগঅন্নাথঅ' বলে দমাস করে পড়ে মূর্ছা গেলো, নর্থ ইস্টের ম্যানেজার আশিষ ঝা যথেষ্ট শ্রবণবোধ্য রেঞ্জে বিড়বিড় করতে লাগলো যে এমন হারামি বস হবে জানলে এমন কোম্পানিতে ও জয়েনই করতো না, বিহারনরেশ বৈদ্যাধিপতি সেনগুপ্তবাবু স্থিরস্বরে প্রশ্ন করলেন যে এমুহূর্তেই রেজিগনেশন লেটার জমা দেবেন না কাল, তখন খুবই গম্ভীরস্বরে সব্বাইকে ''গুড নাইট ফোকস, কীপ পারফর্মিং হার্ড'' বলে টেলিফোন রেখে দেবো, এমন সময় সাউথ বেঙ্গলের ম্যানেজার শ্রীমান শ্রীযুক্ত সুজন বসু মহোদয় হাসিমুখে আমার কেবিনে ঢুকে দাঁত কেলিয়ে গ্যালগ্যালে হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো,' বস, সন্ধ্যেবেলায় ফ্রী আছো?'

বিশ্বাস করবেন না মাইরি, ইচ্ছা করলো ঠাসিয়ে কানের গোড়ায় চড়িয়ে দিই দুটো। একে তুই সবচে বড় টার্গেট নেওয়ার পর দায়িত্ব নিয়ে ধ্যাড়াচ্ছিস, আগেকার দিন হলে তোর নামে সুপারি দিয়ে ভাড়াটে ঠ্যাঙাড়ে লেলিয়ে দিতুম, কি কুচিকুচি করে কেটে ডাকাতে কালীর পুজোই কত্তুম কি না কে জানে, তার ওপর এত্ত ইম্পর্ট্যান্ট কলে তোকে পেলুমই না, কি না, ''বস, দুর্গাপুর থেকে ফিরচি, নেটওয়ার্ক বহুত খারাপ'', এই অজুহাতে, সে তুই কিনা ঘন্টা দুয়েকবাদে এসে দাঁত ক্যালাচ্ছিস আমি সন্দেবেলা ফ্রী আচি কি না জানতে? কেন বে? মুজরো করবি? আমি বাঁহাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে হাত ঘুরিয়ে প্যালা দোব?

যাই হোক, শীতল স্টিলের মতন গলায় 'বলো কোথায় নিয়ে যেতে চাও' শুনেই সে ভদ্রলোক 'আহা চলই না', বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কেনা লঝঝড়ে গাড়িখানা চালিয়ে আমাকে হাজির করলে এফডি ব্লকের এক বারের সামনে।

বারের নাম দেখলুম গোল্ডেন সিটি। লাল রঙের নিওন সাইনবোর্ডে একটি অত্যন্ত রোগাসোগা নিরীহ গোছের ড্র্যাতগন এঁকে খুবই ভয় দেখাবার চেষ্টা করে হয়েছে দেখে বুঝলুম যে ইটি একটি চাইনিজ বার কাম রেস্টুরেন্ট বটেক।

ভেতরে ঢুকে বুঝনু যে বেশ ছিমছাম ঘরোয়া পরিবেশ। বেশি লোকজন ছিল না, শুধু ততটা-আলোকিত-নয় এমন কোণে বসে প্রায় পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক কিছুতেই-তিরিশের-বেশি-নয় এমন এক হাহাহিহি কন্যার সংগে খুবই ঘরোয়াভাবে ঘষাঘষি করছিলেন। আপনারা তো জানেনই যে আমার শিশুর মত পবিত্র মনে কোন পাপ নেই, আমি গুটিগুটি পায়ে ওদিকেই যাচ্ছিলুম পাশে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে। সুজন মাঝখান থেকে 'ন্না ন্না, ওদিকে নয় বস, এদিকে' বলে অন্যদিকে টেনে নিয়ে বসেই বলল 'কি খাবে? রেড লেবেল বলি?'

শুনেই, বুইতেই পারছেন, দিল পুরো গার্ডেন গার্ডেন, মনটা দিব্যি ফুরফুরে হয়ে উঠলো। প্রাণপণে উচ্ছাস চেপে গম্ভীর মুখে বল্লুম 'ঠিকাচে ঠিকাচে, অত ব্যস্ত হতে হবে না, কিচুমিচু একটা হলেই হল'।

ওয়েটার প্রসেনজিত দেখলুম চালু মাল, ঠক করে একসঙ্গে ছ'পেগ টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেলো, আদা বিটনুন আইসবক্স ইত্যকার সহিত।

এবং ঠিক প্রথম পেগ শেষ হবার মুখে এলো অর্ডার করা স্পেশাল দুটি ডিশ, কুমপাও চিকেন, আর চিলি শ্রিম্প।

হাল্কা করে ভাজা উজ্জ্বল বাদামী রঙের চিকেনের টুকরো, অল্প মশলা দিয়ে বানানো, গ্রেভির মধ্যে মন ভালো করে দিয়ে ভাসছে। প্রতি কামড়ের পরতে পরতে শুধু অপার্থিব ভূমানন্দ। ঝালটা কাঁচা লংকার, ফলে তীকষ্নতার মধ্যে শুকনো লংকার তীব্র ''দিলজ্বলে'' ব্যাপারটা নেই, কিশোরীর সদ্যপ্রেমের রাগের ঝাঁঝটুকু মাত্তর আছে, ঝালও বটে, মধুরও!

তবে যেটা খেয়ে পুরো বাওরা হয়ে গেলুম, সেটা হচ্ছে চিলি শ্রিম্প।

ঘটিদের আমি যেকটি জিনিসের জন্যে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা করি তার একটি হচ্ছে চিংড়ি। স্বাদে ইলিশের কাছাকাছি যায়না বটে, কিন্তু রান্নার এপ্লিকেশনের বৈচিত্রে চিংড়ি ইলিশের চেয়ে একটু এগিয়েই আছে। অন্তত ইলিশ দিয়ে কোন মুখোরোচক চাইনিজ রান্নার কথা আমি আজ অবধি শুনিনি। তাছাড়া ছোট ইলিশ তত ভালো হয়না খেতে, কিন্তু চিংড়িকে দেখুন, একদম গুঁড়ো কাদাচিংড়ি থেকে শুরু করে বাঘাটে প্রমাণ সাইজের জাম্বো প্রণ অব্দি, সব্বাই কেমন জন্ম হইতেই আমার মতন হ্যাংলাদের জন্যে বলিপ্রদত্ত!!

চিলি শ্রিম্প। আহা, সত্য, ত্রেতা দ্বাপরে এই জিনিস হয়নি, ঘোর কলিতে এই প্রথম। পুরো বৌলের মধ্যে হাল্কা সোনালি হলুদ ঝোল, কিছু কুচোন কাঁচা লংকা, আর বুড়ো আঙুলের সাইজের মনোমোহিনী, চিত্ততোষদায়িনী কিছু চিংড়িমাছ।

সে সোয়াদের বন্ননা করি এমন জোর আমার কলমে এখনো হয়নি। সুদ্দুমাত্তর ঝোলটুকুন চামচে করে মুখে দিতেই সারা শরীর জুড়ে বেজে উঠলো বেথোফেনের নাইন্থ সিম্ফনি ''ওড টু জয়'', শরীরের প্রতিটি রোমকূপ জুড়ে সোয়ান সং এর অপার্থিব উল্লাস। যেন ''আপনি কেত টাকা চান'' এর জবাবে ফেলুদা ঠাঁই ঠাঁই করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে অশ্লীল টাকার অহংকার, যেন এইমাত্তর কোনি নামের জলপরীটি প্রথম হবার বিনয়ী গৌরবে উজ্জ্বল চোখে তাকালে ক্ষিদ্দার দিকে, যেন এই মাত্র পরিত্যক্ত স্তালিনগ্রাদের মাথায় বিজয়ীর পতাকা তুলল রেড আর্মির কোন কমরেড, যেন শিবার শেষ মোক্ষম আপারকাট টুকু আছড়ে পড়লো প্রতিদ্বন্দ্বীর থুতনিতে,যে এই মাত্র রেডিওতে ভেসে এলো কারও ভাষণ, 'লং ইয়ার্স এগো, উই মেড আ ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি,', যেন আহত টিনটিনকে জড়িয়ে দেড়েল মাতাল সেই ক্যাপ্টেন কান্নাভেজা গলায় বলে উঠলেন, 'তুমি বেঁচে আছো?', যেন প্রথমবার সামান্যক্ষণের জন্যে হলেও আবেগার্ত হয়ে সেভেরাস স্নেপ ডাম্বলডোরের 'আফটার অল দিস টাইম?' এর উত্তরে চোখে চোখ রেখে বলে উঠলেন ''অলওয়েজ''...

তিন পেগের পর আর কি কি করেছিলাম আজ আর মনে নেই। শুধু দুহাতে বৌলটা তুলে ঝোলটা চুমুক দিয়ে খাবার সময় যখন গাল বেয়ে শার্টে গড়িয়ে পড়ছিল, মনে আছে সেই সময় আড়চোখে দেখেছিলাম সুজন প্লুরো মাতাল হয়ে রাঁধুনি ওয়াং বুড়োকে ডেকে ঝোল, কান্না, শিকনি, মাল সব জড়িয়ে মড়িয়ে দুগালে চুমু খাচ্ছে। চকাম চকাম শব্দে সেই ক্ষুদ্র বারটি সচকিত ও মুখরিত!

মালের সঙ্গে সাইড ডিশের কথাই যখন উঠলো, তখন আরেকটা অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করে ফেলা যাক।

আমার এই তের বছরের সুদীর্ঘ মদ্যপ জীবনে অনেক বিচিত্র বস্তু দিয়ে বিচিত্রতর লোকজনকে মদ্যপান করতে দেখেছি। আজকাল আর কিছুতেই বিশেষ অবাক হই না। কিন্তু লাস্ট বার স্লাইট চমকে গেসলুম একদিন।

বইমেলা থেকে ফিরে আমার ফেভারিট বার কিক্সে গিয়ে বসেছি, সল্টলেক সিটি সেন্টারে, সামনে এক বেহেড মাতাল ক্যালাকান্তিক তার কণ্ঠলগ্না ততোধিক মাতাল ছম্মকছল্লুটির সংগে কিঞ্চিৎ নির্দোষ আঁখমিচোলি খেলছি, এমন সময়ে আমার পাশে বিশাল আড়ম্বরে এক মহাত্মা এসে অধিষ্ঠান হলেন। মহিষাসুরের সাক্ষাৎ বড়ভাই টাইপ দেখতে, গলায় জাহাজের রশি বাঁধার মতন মতন মোটা সোনার চেন, হাতে তদ্রূপ হৃষ্টপুষ্ট ব্রেসলেট, হাবেভাবে লবাব খাঞ্জাখাঁ। চেনা ওয়েটার প্রণবকে জিগালুম ইনি কে? ইশারা ঈঙ্গিতে বোঝাল ইনি রাজারহাট এলাকার একজন নির্মাণশিল্পী। আগে "তাপসদা" র ডানহাত ছিলেন, এখন "সব্বো" দার।

ভদ্রলোক এসেই রাজার হালেই তিনটে ব্ল্যাক ডগের অর্ডার দিলেন, ফেঁত করে নাক ঝাড়লেন,বিপুল নাদে বাঁদিকে হেলে বায়ুত্যাগ করলেন, নরম সোফায় গা এলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানালেন যে ওয়েটার গুলো ব্যাপক হারামি হয়ে উঠেছে, আমিও কাষ্ঠহাসি হেসে "সে তো বটেই, সে তো বটেই হেঁ হেঁ কত্তে লাগলুম, এমন সময় ওনার স্নেহের ব্ল্যাক ডগ তিনটি এসে হাজির!!

ভদ্রলোক চুমুক মেরেই, বিশ্বাস করবেন না, বরফ চুষতে লাগলেন!! জিজ্ঞেস করলুম "কিচু নেবেন না? আমার পিনাট মসালা থেকে এট্টু বাদাম নিতে পারেন কিন্তুক"। উনি ওই রাবুণে হাতে আমার পিঠে স্নেহের থাপ্পড় মেরে জানালেন যে, থ্যানকস, কিন্তু উনি লাস্ট চল্লিশ বছর ধরে এইভাবেই মালঝাল খেয়ে এসেছেন।

বরফের টুকরোই ওনার চাট!

আপাতত এইখানেই শেষ করলুম। ভালো থাকবেন, আর, ওঃ, সত্যের খাতিরে জানিয়ে রাখা ভালো যে সেই বছর এনুয়াল আপ্রেইজালে সুজন সবচে" ভালো স্কোর করে বেস্ট এএসএমের এওয়ার্ড পায়। এখন কেউ যদি সেই গোল্ডেন সিটির ঘটনাকে এর পিছনে কারণ হিসেবে দেখাতে চায়, তবে আমি নেহাতই নাচার!

মার্কেট ভিজিট ৮

এখনো মে মাস আসেনি, তাতেই মুম্বাইতে যা ফাটিয়ে গরম পড়েছে মশাই,সে আর কহতব্য নয়। বেশি বকাঝকাও করতে পারছি না ছেলেগুলোকে, মুখ খুললেই গলা শুকিয়ে কাঠ। আর সেই শুকনো গলা ভিজোতে গেলে যা করতে হয়, সেসব আবার অফিস টাইমে করলে বস স্রেফ একটা সাদা কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলবে, ''নিচে জাস্ট সইটা করে দিয়ে পাগলা, বাকিটা আমরা লিখে নেবো''!

এমন দিনে এই চাঁদিফাটা গরম টাকে নিয়ে মালাড এসেছি মার্কেট ভিজিটে। এই প্রবল বৈশাখে বাধ্য হয়ে পুরো মৌনী তাপস হয়ে আছি, হুঁ হাঁ করেই কাজ চলছে আপাতত। ছেলেগুলো ভয়ে কাঁটা, জনান্তিকে একে আরেকজনকে বলছে 'স্যার বহোত গুসসে মে হ্যায় আজ, কুছ বোল তক নেহি র‍্যাহে হ্যায়'। গরমে রাস্তার পিচগুলো অবধি গলে উঠেছে, রাস্তায় কুকুর বিড়াল আর সেলসের গুটিকয় অবোধ ছাড়া জনমনিষ্যি নেই।

তা ঘন্টাচারেক বাদে মার্কেট শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, এমন সময় সেই মলয় সমীরণক্যালানো বিকেলে সেলসম্যান ছোকরাটি খুবই বিনয়ের সংগে হাত কচলাতে কচলাতে নিবেদন করল প্রভু যখন দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে আবির্ভূত হয়েই পড়েছেন, সংকটমোচন বিপত্তারণ হওয়ার একটু ইচ্ছে কি এই বিশাল হৃদয়ের কোন কোণায় ঘাপটি মেরে আছে, অ্যাঁ?

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্লুম, 'খুলে বল, কেসটা কি?'

খবরে প্রকাশ, পাশের মার্কেটে জনৈক বড় হোলসেলার, বালাজী ট্রেডার্স, ইনি নাকি ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে মিষ্টি অভিমানপূর্বক ব্যাবসাপত্তর বন্ধ করে রেখেছেন গত মাসদুয়েক ধরে। খুবই বড় হোলসেলার, পার মান্থ বিল ভ্যালুও খুব বেশি। রাজায় রাজায় এই যুদ্ধে এই উলুখাগড়াসম কচি সেলসম্যানটির ইন্সেন্টিভের ইয়ে মারা যাচ্ছে নিয়ম করে। ফলে উপস্থিত পালনহারের সকাশে এই করুণ আর্তি, তুমরে বিন হামরা কোঈ নেহি!

এসব আমার ডিউটির মধ্যেই পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আচ্ছা, চল। দেখি কি করা যায়'।

গিয়ে যা বুঝলুম, কেস অতি সামান্য। একটি ড্যামেজ গুডস রিটার্ন নিয়ে ফালতু বাওয়াল। রিজিওনাল ম্যানেজারের বা আমার অতি সামান্য অ্যাপ্রুভালেই কাজ হয়ে যায়। ফলে কেস জমে ক্ষীর। চা এলো, ফুটপাথের তিন ফুটিয়া চা নয়, অন্দরমহল থেকে ঘন দুধের এলাচ আদা দেওয়া চা। অনেক সুখদুঃখের গল্প হল মালিকের সংগে, প্রায় অশীতিপর এই প্রাজ্ঞ লোকটির নাম অশোক কেবলরামানি। অনেক দুঃখ করলেন, একমাত্র ছেলে নিউ ইয়র্কে ফোটোগ্রাফির দোকান খুলে বসেছে, ব্লাডি ইন্ডিয়ার এই নোংরা বাজারের অন্ধকার দোকানে বসে, ঘেমো ফতুয়া পরে, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে থাই চুলকোতে চুলকোতে ডাল আর শুকনো লংকা বেচতে তার বয়েই গেছে। তার ওপর ওনার নিজের হাই কোলেস্টেরল, শুগার। তার মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল দুটো চোখেই ছানি, শুগার বলে কাটাতেও পারছেন না। তারপর আজকালকার ছেলেছোকরাদের মতিগতি,আইপিএলে টাকার খেল, মমতা ও মোদীর তুলনাত্মক রাজনীতি, ভারতের অর্থনীতি কোনপথে, হিন্দি সিনেমাতে সংস্কৃতির অবক্ষয় ইত্যাদি অনেক মনোজ্ঞ আলোচনার শেষে নমস্কার করে উঠবো, ভদ্রলোক বললেন চলুন, রাস্তার মোড় অবধি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

যথারীতি ভদ্রতা করে বলতেই হল, 'আরে না না, হেঁ হেঁ, তার আর দরকার হবে না।'

তিনি স্মিত হেসে বললেন 'আরে চলুন চলুন, আমারও কাজ আছে ওদিকে।'

খুব সিরিয়াস কাজ নাকি? কোথাও নামিয়ে দিয়ে যাই?

জানা গেলো তা নয়, কাছেই বাবুলালের লেড়কা নতুন ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান খুলেছে, একটা মোবাইল না কিনলে খারাপ দেখায় খুবই, তারপর একটু লোকাল রেলস্টেশনে যাবেন, পরের সপ্তাহে আমেদাবাদ যাবার ট্রেনের টিকেটটা কনফার্ম হয়েছে কি না জানতে, তারপর ইলেক্টিসিটি আর গ্যাসের বিল জমা দিতে আসবেন পাড়ার মোড়ের মোবাইলের ক্যাশকার্ডের দোকানটায়, যেটা ওনার ছেলের ছোটবেলার ল্যাঙ্গোটিয়া ইয়ারবন্ধুটি এই রিসেন্টলি খুলেছে। দশ টাকা পার বিলের বিনিময়ে ওরাই সব টাকা জমা করে দিয়ে আসে। কিছু সবজি ওগ্যায়রাহ ওগ্যায়রাও কিনতে হবে, তাই...

একটু অবাক হলাম। আজকালকার দিনে এসব কিনতে বা করতে কেউ আবার বাইরে বেরোয় নাকি মশাই? আপনার হাতে দিব্যি দেখছি দামি মোবাইল ("লেড়কানে ভেজা, বাহোত কিমতি হ্যায়"), আরে অ্যাপ ডাউনলোড করুন, অর্ডার দিন, বাড়িতে এসে পৌঁছে দিয়ে যাবে যে! তার ওপর ডিসকাউন্ট, ক্যাশব্যাক, বোনাস ফ্রিবিজ, এই আনন্দবাজারে লোকে লুটেপুটে নিচ্ছে যে দাদা। আপনি এখন হেঁটে চললেন এদ্দুর এই সব করতে? বাড়িতে দুদুটো কাজের লোক থাকতেও?

ক্যায়সে হোতা হ্যায়? অ্যাপ জিনিসটা তো মালুম হ্যায়, কিন্তু...

কিন্তু আবার কি স্যার? মোবাইল কিনবেন,আরামসে কিনুন না! অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট বাদ দিয়েও আরও একশোটা অ্যাপ আছে সস্তায় মোবাইল কিনবার, হেবি ডিসকাউন্ট, বাবুলালের লেড়কার সাধ্যই নেই ওই প্রাইস অফার করে। দুমিনিটের মামলা কাকা, ঘরে বসেই। আর টিকেটের স্টেটাস জানতে সেই স্টেশন যাবেন?? হ্যা হ্যা হ্যা হাসালেন কর্তা। ইরেইল ডাউনলোড করুন, তাছাড়াও আইআরসিটিসিরও সাইট আছে, বেফিকর আঙুল টিপবেন, দুমিনিটে স্টেটাস জ্বলজ্বল করে আপনার স্ক্রীনে, হেঁ হেঁ...ট্রেন তো বাদই দিন, ফ্লাইট বুক করুন, ট্রেন বুক করুন, ট্যাক্সি বুক করুন, হোটেল বুক করুন...অ্যাপ আছে গন্ডাগুচ্ছের এদিকওদিক... কয়েকমিনিটের ওয়াস্তা, স্মুদলি আপনার সব জরুরত, সব মুশকিল আসান করে দেবে চুটকি মেঁ। আর ইলিট্রিরির বা গ্যাসের বিল জমা দিতে এত কান্ড? খ্যাঁক খ্যাঁক খৌয়া খৌয়া ও হো হো হো, উফফফ হাসালেন দাদা। পেটিএম আছে, মোবিকুইক আছে, তিরিশ সেকেন্ডে পেমেন্ট শেষ। নো হ্যাসলস ডিয়ার স্যার। তার ওপর ক্যাশব্যাক, মাই গুডনেস, ক্যাশব্যাক! মানে হাজার টাকার কথা বলে হাজার টাকার বিল দিলেন, টুক করে দেখলেন একশোটাকা আপনার কাছেই ফিরে এলো, কি মজা, না? আর আপনি চললেন কেঁচড়ে ক্যাশ নিয়ে ছেলের বন্ধুর দোকানে, ছ্যা ছ্যা। আরে অশোকজী, অওর ছোড়ো, আজকাল তো সবজি অবধি ডেলিভার করে দিচ্ছে এই স্টার্টাপ গুলো। ঘরে বসে ডাল, সবজি, দুধ, মাখন...

আমার ওয়াইফের কচি পালং ভালো লাগে, কচি পালং, একটু শক্ত লাল কুমড়ো আর ছোট ভিন্ডি। বড় ভিন্ডি খেলে ওর শরীর খারাপ করে। আপনার অ্যাপওয়ালারা ওসব বেছে নিয়ে আসবে? আমি যেমন করে দেখেশুনে বেছে আনি, আমার গিন্নির জন্যে?

ইয়ে, বোধহয় না। তবে কিনা....

বাবুলাল বহুত আচ্ছা দোস্ত ছিল, গত বছর পারেল যাবার সময় লোকাল থেকে পড়ে যায়। বাচ্চা ছেলে ওর, এখনো গ্র্যাজুয়েশন দেয়নি,দোকান খুলেছে...

হেঁ হেঁ, সে তো বটেই.... তবে কি না,

আর স্টেশনের মাস্টার পারভেজজী অনেক দিন ধরে আছেন, অবরে সবরে হেল্প করেন, বুকিং ফুল থাকলেও একটা সীটের ব্যবস্থা করেই দেন। উনি ফাঁকা থাকলে একটু বসেও আসি। উনি অনেকটা ছোট যদিও আমার থেকে, একটু গল্পগুজবও করি। পারভেজজীর একটাই মেয়ে, শাদির পরে কি হল কে জানে, উও পাগলি গায়ে আগ লাগিয়ে মরে গেছে, বিবিও পাগল হয়ে গেছে, একটু কথা বললে ভালো লাগে, এই আর কি।

আর বন্ধুর ছেলে, আমার ছেলের মতই, ব্রাইট বয়, বাপ মিউনিসিপালিটির গেটকীপার ছিল। খেটে খাচ্ছে, দশটাকা দিলুম না হয়। চাচা চাচা বলে, চা খাওয়ায়, লোকজন আসে, দুটো কথা হয়, হালহকিকত জানতে

পারি সব।

আহ, সে তো বুঝলুম, কিন্তু টেকনোলোজির এই দুনিয়াতে....

আমার ভালো লাগে দাদ্দা। দুকানে যাই, মার্কেটে যাই, দরাদরি করি, ঝগড়া করি, আমার ভালো লাগে, সমঝে? লোকজনের সংগে কথা বলি, হাসি মজাক হয়, আমার খুব ভালো লাগে। এত লোকজন, এত আলো, এত হাসি, এত মানুষ। আমার ভীষণ ভালো লাগে। আজকালকার নওজোয়ানদের সবাই দেখি মাথা নিচু করে মোবাইলে টুকটুক করে চলে, পাশের মানুষের সংগে বিলকুল বাতচিত করে না। আমার খারাপ লাগে দাদা। এত কিসের কামকাজ তোদের হামেশা?

আরে অশোকজী, আজকাল টেকনোলোজি এত এগিয়ে গেছে, সব কিছু অ্যাপের দৌলতেই হাতের মুঠোয়, আপনি বেকার বেকার সেন্টিমেন্টাল হচ্ছেন...

আচ্ছা? সব কিছুরই অ্যাপ আছে বলছেন দাদা?

আছেই তো, অলমোস্ট অল। আপনার এখন কিসের অ্যাপ লাগে বলুন, অ্যাঁ?

বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ ব্যাবসায়ীটি ছোখ কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে, আলতো করে চোখ টিপলেন, আই অ্যাম সেভেন্টি ফাইভ দাদা। যে কোন দিন উপর থেকে বুলাওয়া আসবে, আসবেই। একটা কথা বলুন তো, সেই দিন আমার আরথি ওঠাবার জন্যে চারটে কাঁধ লাগবে। আছে নাকি দাদা এমন কোন অ্যাপ যে আমি মরলেই আশেপাশের থেকে জান পেহচান চারটে কান্ধা জোগাড় করে দেবে?

আমি মূক ও স্থবির!

আছে নাকি দাদা? আমার বউ, আমার ছেলে এরা আমার বডির ওপর কেঁদে পড়লে একটু শান্ত করার অ্যাপ? নেই বাবুমশাই, নেই। আমি বলছি নেই। তাই আমি এদের কাছে যাই। কথা বলি, হাসি মজাক করি, জরুরত পড়লে দেখি। এরাও আমাকে দেখে। এক হপ্তা বাজারে আমাকে না দেখলে আমার খোঁজ করতে আসে। অ্যাপ আসে না দাদা, মানুষ আসে। এখন বলুন, আছে নাকি কোন অ্যাপ, আমার আরথি ওঠাতে চারটে কান্ধা দেবার জন্যে?

বাজে বুড়ো, খচ্চর বুড়ো, নিজেকেই মনে মনে বললাম এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ফেরার সময়। আমাকে তাহলে শুরু করতে হবে নাকি এখন থেকেই? চারটে বন্ধু ফিক্স করে রাখতে হবে?

আমি মরে গেলে চারটে কাঁধের জন্যে???

ও মশাই, আছে নাকি এমন অ্যাপ, মরে গেলে চারটে কাঁধ দেবার জন্যে? কাছের লোকের চোখের জল মোছাবার জন্যে? অ্যাঁ? আছে?

কর্পোবাবুর পুজোদর্পণ

আমাদের ছোটবেলায়, বিশ্বকর্মা পুজো শেষ হলেই বেশ একটা পুজো পুজো ভাব ছড়িয়ে পড়া মাত্র আমরা, অর্থাৎ কচিকাঁচারা বইপত্তর তাকে তুলে দিতাম। বড়রাও পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিতেন, পুজোর মাস মানেই খরচের মাস। কেনাকাটা, দেওয়া থোওয়া ইত্যাদির প্ল্যানিঙের পর আরেকটি ছোট্ট বাজেট এন্ট্রি লিখতেন, "চাঁদা"!

কয়েকদিন বাদেই পাড়া এবং পাশের পাড়ার দাদারা ভারি লাজুক মুখে মুখে চাঁদা তুলতে আসতো। তারপর শুরু হতো দরাদরি। তারা হয়তো পঞ্চাশ টাকার বিল কেটে এনেছে, এদিকে বাড়ির কর্তা কিছুতেই আড়াই টাকার ওপর উঠতে রাজি নন। শেষে বহু কাকুতিমিনতি করে, 'আপনাদেরই তো পুজো কাকু, হেঁ হেঁ, আপনারা না দেখলে আর কি করে চলবে বলুন 'ইত্যাদি বলেকয়ে, ছলছলে চোখে যথেচ্ছ বাৎসল্য রসের উদ্রেক করে শেষে তেনারা কুড়িটাকা মত আদায় করে বিদেয় হতেন। যে বাড়ির সুন্দরী কন্যাটি আশেপাশের দশ কিলোমিটারের মধ্যে তাবৎ উঠতি যুবকের মনোবেদনার কারণ, সেই বাড়িতে চাঁদা আনতে যাবার জন্যে সবার সে কি উৎসাহের ধুম! সুবেশ যুবকদের পল্টন দেখে লোকজন ধন্ধে পড়ে যেত, ঘোষবাড়িতে আজ স্বয়ংবরসভা নাকি? তারপর সুযোগ বুঝে 'মাসিমা, একটু জল খাওয়াবেন?' তো ছিলই! আর ছিল পাড়ার যশোপ্রার্থী সম্পন্ন গৃহস্থটিকে 'এ বছরে কিন্তু আপনাকেই প্রেসিডেন্ট হতে হবে কাকু, না বললে কিন্তু শুনছি না একদম' বলে পেড়ে ফেলা, বাজেটের সিংহভাগ ওইখান থেকেই আসতো কি না!

ছবিটা পালটে গেল মায়ের পুজো যবে থেকে থিমের পুজো হয়ে উঠলো। থিমবাবু শৌখিন লোক, দশ কুড়ি টাকার চাঁদায় তেনার শখ মিটবার কথাও নয়। আর নব্বই দশকের শেষে এসে বাঙালি হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে প্রতিবাদী, বিশ্বনাগরিক বাঙালির এখন কলকারখানায় তালা, পেটে খিদে এবং হাতে হ্যারিকেন! ফলে তার পক্ষে আর শুধু চাঁদা দিয়ে আড়েবহরে বাড়তেই থাকা পুজোর বাজেট ঘাটতি মেটানো সম্ভব নয়। কিন্তু বীর বাঙালিকে আটকানো কি অতই সহজ দাদা? হুজুগে জাতের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা আবিষ্কার করলো পুজোর বাজেট যোগাড় করার আরেক উপায়, কর্পোরেট স্পনশরশিপ!

আমার গপ্প সেই নিয়েই।

আমি ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্র পাঠান্তে একটি বিখ্যাত পেইন্টস কম্পানিতে জয়েন করি, প্রথমে বিহারের ম্যানেজার হিসেবে ও তারপর কলকাতার। অধুনা পুজোর বাজারে সেরা পুজো বেছে নেবার যে হিড়িক, তার শুভসূচনা করে এই কম্পানিটি, "শারদসম্মান" ট্যাগলাইন দিয়ে। যদিও পুরো ব্যাপারটাই মুম্বাইয়ের হেড অফিস থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। আমাদের, অর্থাৎ লোকাল টিমের কাজ ছিল সপ্তমীর সন্ধ্যায় কয়েকজন বাছাবাছা ডিলারদের নিয়ে গাড়ি বুক করে বেরিয়ে, কলকাতার সেরা পুজোগুলো (বাগবাজার থেকে বড়িষা, বেলেঘাটা থেকে বাদামতলা) সারা রাত ধরে দেখে সকালে বাড়ি ফেরা। বুঝতেই পারছেন, লাইনটাইন দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভি ভি আই পি হিসেবে খুবই গম্ভীর মুখে ঢুকে, কতই যেন বুঝছি টাইপ মুখ করে মাথাটাথা নেড়ে, পুজো উদ্যোক্তাদের এনে দেওয়া সন্দেশ কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদি গলাধঃকরণ করে, 'হেঁ হেঁ, আমাদের পুজোটা একটু দেখবেন স্যার' টাইপের হাত কচলানো মাতব্বরদের দিকে প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি হেসে বেরিয়ে আসা, এটুকুই যা কষ্ট!

এর পরে অন্য কম্পানিতে আমাকে দীর্ঘদিন কলকাতা ও দক্ষিণ বঙ্গ, এবং তদপরবর্তী সময়ে সমগ্র পূর্ব ভারতের দায়িত্ব সামলাতে হয়। এবং তখন এই কর্পোরেট স্পনসরশিপের পুরো ব্যাপারটিকে, যাকে বলে পরিপূর্ণ রূপে অবলোকনের সুযোগ পাই।

এখানে একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দেওয়া ভালো যে এতে কিন্তু বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ও ক্লাবগুলির মধ্যে রীতিমতো ''ডিল'' হয়। চমকানো ধমকানোর বা জোরাজুরির কেসই নেই। অনেক ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলি নিজেরাই বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে ডাকে এবং কত টাকার বিনিময়ে কম্পানিগুলি কি কি সুবিধা পাবে তা ফাইনাল হয়। পলিটিক্যাল লিডারদের চিঠি যে আসে না তা নয়, তবে সে সব ছাপা চিঠি, স্যুভেনিরের সঙ্গে আসে, এবং সব কম্পানির কাছেই আসে, পাত্তা না দিলেও চলে। একবারই শুধু আমার কাছে উত্তর কলকাতার একটি ক্লাবের হয়ে তৃণমূলের এক বিখ্যাত নেতার ফোন এসেছিলো, যিনি অধুনা মন্ত্রীও বটে। তিনি যে ভাষায় অনুরোধ করছিলেন, তাকে কাকুতিমিনতি বললেই চলে। আমি নিজেই ভারি অপ্রস্তুত হয়ে যখন বললাম যে ঠিক আছে, অত করে বলতে হবে না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তিনি ঝাড়া পাঁচ মিনিট আমার এবং আমার পরিবারের প্রতি প্রাণঢালা আশির্বাণী শুনিয়ে, পুজোতে অষ্টমীতে কিন্তু ক্লাবে এসে ওঁর সঙ্গে ভোগপ্রসাদ খেতেই হবে দাবি জানিয়ে ফোন রাখেন, বোধহয় ফোনে চুমু খাওয়াটাই বাকি ছিল!

এবার আসল কথা, কম্পানিগুলির এতে লাভ কি? লাভ একটাই, নিজের প্রডাক্টস বা সার্ভিস আরো বড় করে লোকের সামনে তুলে ধরা। এটাও এক ধরণের ব্র্যান্ড বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটি। ঠিক যে কারণে কম্পানিগুলি টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলিতে বিজ্ঞাপন দেয়, ঠিক সে কারণেই দুর্গাপূজাতেও স্পনসরশিপ দেয়।

(জনান্তিকে জানিয়ে রাখি, এই যে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া, একে মার্কেটিং এর পরিভাষায় বলে এটিএল বা অ্যাবভ দ্য লাইন অ্যাক্টিভিটি। কার কেন কিসের লাইন, সেসব বিজৃম্ভণক্লিষ্ট আলোচনায় আর ঢুকছি না)।

কিভাবে? আপনারা নিশ্চয়ই যে কোন প্যাণ্ডেলে ঢোকার মুখে দেখেছেন প্রচুর ব্যানার আর ফেস্টুন বাঁশের ব্যারিকেডে সাঁটানো। বা উঁচু উঁচু বাহারি বিজ্ঞাপনী গেট। বা বিভিন্ন কম্পানির স্টল। ওই গেট বা ফেস্টুন ইত্যাদি লাগানোর জায়গাটুকু ভাড়া নেয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা, এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের পণ্যের বিজ্ঞাপন, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। এসবই হচ্ছে গণমানসে আমার কম্পানির আলালের ঘরের দুলালটিকে আপনার মনে একটু একটু করে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। যাতে পরের বার আপনার তেষ্টা মেটানোর সাধারণ প্রয়োজনীয়তাটুকু যেন শুধুমাত্র কোকা কোলা পানের চাহিদাটি হয়ে ওঠে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রাথমিক ইচ্ছেটুকু যেন একমাত্র ডাভ সাবান দিয়েই শ্রীঅঙ্গ মার্জনের আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা আশা করি জলবত্তরলং বুঝে গেছেন।

এসব কাহিনীর শুরু অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে। তখন থেকেই বিভিন্ন পুজো কমিটির স্যুভেনির পাঠানো ও অফিসে এসে তদ্বির তদারক করা শুরু। স্যুভেনিরে থাকে ওঁদের পুজোর ব্যাপারে ভাবগম্ভীর ব্যাখান (''জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের এই মাতৃবন্দনা আজ বিংশতিতম বর্ষে''), কোন কোন প্রাইজ জিতেছেন গত দশ বছরে তার লিস্টি (''নটিগার্ল'' হাওয়াই চপ্পল কম্পানি থেকে ''অসুরের সেরা জুতো'' পুরষ্কার), এবং শেষ পাতায় কাজের কথা, অর্থাৎ কিসের বিনিময়ে কত কাঞ্চনমুদ্রা এঁয়ারা ধার্য করেছেন। যত বিখ্যাত পুজো এবং যত বেশি 'ভিজিবিলিটি' অর্থাৎ দৃশ্যমানতা, তত বেশি দাম। যেমন গেটের দাম এক লাখ হলে, স্টল পঞ্চাশ হাজার। এক্সিট গেটের সামনে বিশাল ফ্লেক্স হলে ন্য)নপক্ষে পঁচিশ হাজার, আর স্যুভেনিরের কভার পেজ পাঁচ হাজার। আবার সুরুচি সংঘের পুজোর গেট এবং বাবলতলা আমরা সবাই ক্লাবের পুজোর গেটের মধ্যে চাঁদার পরিমাণে আকাশপাতাল তফাৎ।

এসব রেট প্রথমবার দেখে প্রাণান্তকর হেঁচকি উঠলেও পরের দিকে ব্যাপারটা চট করে বুঝে ফেলি। এক্ষেত্রে হাতির খাওয়ার দাঁত আর দেখানোর দাঁতের মধ্যে দুর্গম গিরি কান্তার মরু টাইপের ব্যবধান। একলাখি গেট সামান্য হাসিঠাট্টাতেই পঁচিশে নেমে আসে। এক্সিট গেটের ফ্লেক্স ('ওটা কিন্তু দাদা পঁয়েরোর কমে হবে ন্না ন্না ন্না') এককাপ চায়ের পরই সাড়ে সাতে ফাইনাল হয়ে যায়। 'স্যুভেনিরটা একটু দেখবেন ভাইটি' অনুরোধমত পাঁচহাজারি কভার পেজটি অক্লেশে এক হাজারে বুক হয়ে যায়।

মুশকিল হয় যদি আপনার অফিসের সামনে কোন বড় পুজো হয়। আমার অফিস ছিল পার্ক সার্কাস দরগা রোডে, গলির উলটোমুখেই পার্কসার্কাস সার্বজনীন। সেখানের ক্লাব কমিটির লোকজন সেপ্টেম্বর নাগাদ হানা দিতেন, সবচেয়ে শাঁসালো গেট বা ফ্লেক্সের জায়গাটি আমাদের জন্যে ছেড়ে। তাঁদের যিনি দলনেতা বা সেক্রেটারি ছিলেন, মধ্যচল্লিশের সেই ভারি সুপুরুষ যুবকটির সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতাই হয়ে গেছিলো।

তিনি এসেই ভারি আন্তরিক ভাবে 'অ্যাক্কাপ চা খাওয়ান ভাইটি' বলে বেশ জাঁকিয়ে বসতেন। চা পানান্তে তিনি ভারত ও মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ, আধুনিক বাংলা সাহিত্য কোন পথে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের দুরবস্থা, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধের অভাব তথা সর্বব্যাপী সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়ে খুবই মনোজ্ঞ আলোচনার পর আসল বিষয়ে অবতীর্ণ হতেন। চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে একটা গভীর তৃপ্তির 'আঃ' উচ্চারণ করে ভারী গলায় বলতেন 'আপনাদের পাড়ারই পুজো, বেশি কিছু বলার নেইও, বড় গেটটাই আপনাদের জন্যে রেখেছি। একলাখের বেশি একটি পয়সাও ঠেকাবেন না কিন্তু, এই বলে রাখলুম'। তবে প্রথম যেবার আমার সঙ্গে, যাকে বলে ''নয়নে নয়ান'' হয়, সে অভিজ্ঞতা বোধহয় ভদ্রলোকের জন্যে খুব একটা সুখকর হয় নি। উনি যেই বলেছেন, 'আপনাদের পাড়ারই পুজো ভাই', আমিও ছলছল চোখে গলদশ্রু হয়ে বললাম 'আপনাদের পাড়ারই কম্পানি দাদা, আপনাদের ওপর তো আমাদেরও তো একটা অধিকার আছে, না কি? গেটটাই যখন রেখেছেন দাদা, নিশ্চয়ইই নেবো, কিন্তু দশের বেশি দিতে পারছি না, বিশ্বাস করুন, এর বাইরে আমাদের বাজেটই নেই!' ভদ্রলোক খানিক্ষণ স্তম্ভিত অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'ভাইটি কি বাঙাল?'

বাঙালকে বাঙালই চেনে ভালো!

তবে যাঁরা এতটা পড়ে ভাবছেন এতেই কম্পানির পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির কর্তব্যকর্ম শ্যাষ, তাঁদের সবিনয়ে জানাই, আপনার মতন অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যর কিন্তু ভালো দেখে এক পিস জ্ঞানাঞ্জনশলাকার আশু প্রয়োজন। আরে মশাই এ তো গেলো সাবস্ক্রিপশনের খরচা, আসল কাজ তো এর পর। এর পর যে ফ্লেক্স, ব্যানার, বা দ্রষ্টব্য বস্তুটি উক্ত স্থানে ঝুলিত বা শোভিত হইবেক, তাহারও তো ব্যবস্থা করতে হয়। এর প্রথম পর্যায় হলো ব্র্যাণ্ড ম্যানেজারকে ফোন করে ফ্লেক্স বা ব্যানারের ডিজাইনটি আনিয়ে নেওয়া, এবং এইখান থেকেই আপনার অগ্নিপরীক্ষার শুরু। সচরাচর প্রথম যে ডিজাইনটি আসে তার বাংলা বানান বা বাক্যগঠন দেখলে বাক্যি হ'রে যায়, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে পড়ে, রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে ও ধর্মেন্দ্রবিক্রমে 'কুত্তে, কমিনে, ম্যায় তেরা খুন পি জাউঙ্গা'' বলে ম্যানেজারটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে। অতঃপর সেই কচি ম্যানেজারশাবকটিকে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণাদানের পর ঠিকঠাক ডিজাইন তো এলো, এরপর ভেন্ডর ডেকে বাকি কাজ। এইসময়ে কাজের চাপ এতো বেড়ে যায় যে, দুদিন আগে যে কর্মপ্রার্থী ভেন্ডরভাইটি দুবেলাই কাজের খোঁজে অফিসে ধর্ণা দিতেন, পুজোর আগে তিনি সাক্ষাৎ ঝিলিকের মা! এতদসত্বেও অনেক কষ্টেসৃষ্টে, পুর্বজন্মের অশেষ সুকৃতির ফলে তাঁকে পাকড়াও করে দায়িত্ব সঁপে দিয়ে যদি ভাবি নাহ, এইবার পুজোগণ্ডার দিনে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে কিছু গুষ্টিসুখ অনুভব করবো, তবে দাদা শুনে রাখুন সে গুড়ে শুধু বালি নয়, পুরো চন্দননগর!

মহালয়া থেকে পঞ্চমী অবধি নিত্যি ঝামেলা। রণেবনেবাথরুমে ফোন আসছেই।' অ দাদা, মাঠে ড্যেঁইড়ে আচি তো দুফর থিক্যে, গেটের মাপ নেবু বল্যে, কমিটির লুকজন ত কেউ কথাও নাই গ' শুনে চিড়বিড়িয়ে উঠেই ভাবছি ব্যাটার গর্দান নেবো কি না, এমন সময়ে ভারি সুললিত গলায় 'ইয়ে, স্যার, আপনার কত ইঞ্চি? মানে ফ্লেক্সের পেছনে যে বাটাম দেবো তার ইঞ্চি কত?' শুনে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। তারপর প্রাজ্ঞ ভেন্ডরটি যখন অকুস্থল থেকে ফোন করেন, 'সরকারবাবু, আপনার সঙ্গে পুজো কমিটির কথা হয়েছিল যে এক্সিটের ফ্লেক্সটা আপনাদের। এখন দেখছি ওখানে এগারোটা ফুচকার স্টল নিয়ে হার্বাল ফুচকাজোন তৈরি হচ্ছে, আপনার ফ্লেক্স কিন্তু ঢাকা পড়ে যাবে, ওটা এন্ট্রি গেটে করে দিই?' তখন উপায়ান্তর না দেখে সহমত হতেই হয়। এদিকে ষষ্ঠী এসে গেছে, পুজোর বাজার হয়নি, গিন্নির নৈমিত্তিক গঞ্জনাতে জীবন দুর্বিষহ। ফলে

বেরোতেই হয়, এবং গিন্নির পছন্দের জুতোটি কেনার সময় ফের সেই ফোনার্তনাদ, 'ছ্যার, এয়াগো গ্যাটের বাশখান তো দেহি ব্যাবাক ত্যাড়া, প্যারেকখান সান্ধাইতাসে না, করুমডা কি?' তখন একহাতে বাহারি জুতো নিয়ে আরেক হাতে ফোন ধরে এই জ্ঞানপিপাসুকে বঙ্কিম বংশদণ্ডে পেরেক পোঁতার অ্যালগরিদম বাতলাতে থাকি। আশেপাশের লোকজন শুনেই ছিটকে যায় ! গিন্নির মুখচন্দ্রমা ঘনকৃষ্ণ নবজলধর রূপ পরিগ্রহ করে।

তাতেও রেহাই নেই। সন্ধেবেলা বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ আসবপানে প্রমত্ত। নেক্সট কয়েকদিন মোচ্ছবের যাবতীয় প্ল্যান রেডি। এমন সময়, ফের সেই! ফোন তুলতেই কাতর আর্তনাদ, 'ও বড়দা, অমুক পুজো প্যাণ্ডেলে আর বাঁশ নেই যে, আমাকে কিছু বাঁশ দিন প্লিজ!'

অমন লোভনীয় আমন্ত্রণ থাকা সত্বেও ফোন অফ করতে বাধ্য হই, ষষ্ঠীর দিনে কে কার বড়দা?

রাত্রে গিন্নি বুকে হাত বুলিয়ে দেন, 'খুব কাজের প্রেশার যাচ্ছে, না?' তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরে গিন্নিকে পাশবালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আর আমার পুজো শুরু হয়ে যায়।

মার্কেট ভিজিট ৯

দৈব বা অলৌকিকে আমার কোনদিনই কোন বিশ্বাস ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেইবার ম্যাঙ্গালোরে যেটা হয়েছিল, সেটা বলতে গেলে....

নাহ, ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি না হয়।

তখন সদ্য সদ্য ন্যাশনাল লেভেলে দায়িত্ব নিয়েছি।এর আগে শুধু ইস্ট রিজিয়নেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সেই প্রথম কলকাতার কই ঝাঁপ দিল ভারতসাগরে।

রসিকজন মাত্রেই জানেন, নতুন উত্তেজনাকর বিষয়াদিতে মনুষ্যছানার প্রাথমিক উৎসাহ খুবই তীব্র থাকে। ফলত তখন মহানন্দে ভারতভ্রমন করে বেড়াচ্ছি। দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, ব্যাংগালোর, চেন্নাই এসব লেগেই আছে। সংগে করিম''সের কাবাব, প্যারাডাইসের বিরিয়ানি, থেলাপ্পাকাডির পমফ্রেট ফ্রাই, এসব তো আছেই। ভারতবর্ষকে চোখেও দেখছি, চেখেও।

এমন আনন্দবিধুর সময়ে হঠাত এক ''এমন মধুর সন্ধ্যায়'', বস ডেকে বললেন, 'কি হে, শুধু মেট্রো শহরগুলোতে ট্যুরে গেলেই হবে? একটু অন্য জায়গাটায়গাগুলোও দেখতে হবে তো বাবা। পরশু ম্যাঙ্গালোর যাও তো একটু, মার্কেটটাও দেখে এসো, একটা স্যাম্পল ডিস্ট্রিবিউটর সার্ভেও করে এসো। এই নিয়ে কাজ আছে তারপর'।

শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে ''বসহি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ''। অতএব দুদিন বাদে ম্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি ধরে ডেরাডাণ্ডা বাঁধলুম যে হোটেলে, তার নাম পার্বতী রেসিডেন্সি। সাধারণ ছিমছাম হোটেল। জায়গাটার নাম ছিল উরওয়া।

সারাদিন ধরে মার্কেট ভিজিট চলল। বিকেলে দু চারটে ডিস্ট্রিবিউটরদের সংগে দেখা করে, ভারী গলায় নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে, সন্ধেবেলা জমিয়ে বসলাম এরিয়া ম্যানেজারটির সংগে। সে ভারি চৌখস ছেলে। মার্কেট থেকে হোটেল ঢুকেই বলল ''স্যার, কেয়া লাউঁ আপকে লিয়ে? ব্লেন্ডার্স চলেগা?''। বলা বাহুল্য, এরপর খুশি না হয়ে আর পারা যায় না!

সেদিন কিছু হুইস্কি টেনেছিলুম বটে, এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দুজনে মিলে একটা ফুল বটল শেষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। খাওয়া হচ্ছিল আমার রুমে বসেই।

এইখানে আমার রুমটার বর্ণনা দেওয়াটা একটু জরুরী। রুমটা ছিল ল্ল শেপের। এল এর ছোট হাতটার মাথায় দরজা, সাইডে টয়লেটের দরজা। অন্য বড় হাতটার দিকে খাটপালং, ড্রেসিংটেবিল ইত্যাদি।

আমরা আড্ডা মারছিলাম দরজার কাছে। টুংটাং গ্লাসের আওয়াজ, চমৎকার চিকেন পকোড়া, জমাটি আড্ডা, সবমিলিয়ে নেশাটি যখন পূর্ণমাত্রায় মধ্যগগনে, সে ছোকরা বলল, 'স্যার, লেটস কল ইট আ ডে।'

এই বলে সে টলতে টলতে নিজের রুমের দিকে রওনা দিল। আমিও টলতে টলতে ''গুড নাইট, সুইট ড্রিমস'' ইত্যাদি বলে লাইটের সুইচ নিভিয়ে, এসি টা বাড়িয়ে, একটা চাদর টেনে নিয়ে লম্বা হলাম।

সেদিন নেশাটা বেশ গাঢ় হয়েছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিশেষ কোন সাড় ছিল না। মাথাও ঘুরছিল একটু একটু, যেটা সচরাচর আমার হয় না। মাথাটা আলতো করে বালিশে নামিয়ে রেখে, ধীরে ধীরে নানান কথা ভাবতে ভাবতে তলিয়ে যেতে থাকলাম ....

কটা বাজে খেয়াল ছিল না, কিন্তু তখন বেশ রাত হবে, একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ঘুমটা খানিকটা চটকে গেলো। কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু চেষ্টা করলেও চোখটা পুরোপুরি বোজাতে পারছি না। মানে মনে হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর আমার কোন কন্ট্রোল নেই। নেশাটি কিন্তু তখনো তুঙ্গে।

হঠাত করে শুনি চুড়ির রিনিরিনি শব্দ। কাছেই, ড্রেসিংটেবিল ঘেঁষেই। এখন আমার গিন্নি মাঝেসাঝে রাতবিরেতে উঠলে তেনার হাতের চুড়িতে এই শব্দটা হয়। এক্কেবারে সেই শব্দ। মুহূর্তেকের জন্যে একটা ক্ষণিক নিশ্চিন্ততার ভাব হল, যাগগে, চেনা আওয়াজ।আমি শালা বেকারই ভেবে মরছি। এপাশে কাত হয়ে, কম্বলটাকে টেনে আরেকপ্রস্থ ঘুমোবার উদ্যোগ করছি, ঘুমটা আসি আসি করছে,

এমন সময়, নেশার অঘোরমত্ততার মধ্যেই, কেউ যেন কয়েকটা কথা মাথার পেছনে পেরেকের মতন সজোরে গেঁথে দিল,

বউ এখন কলকাতায়।

আমি ম্যাঙ্গালোরে।

হোটেলে।

একা।

এর পর উঠে বসতেই হয়। শব্দটা নেশার ঘোরেও শুনে থাকতে পারি, সেই সম্ভাবনাই বেশি। তবুও দেখে রাখতে দোষ কি? লাইট জ্বালাতেই চোখটা প্রথমে কুঁচকে গেলো। তারপর দৃষ্টিটা একটু সয়ে এলে বিছানা থেকে নেমে এদিকওদিক দেখলাম। কোত্থাও তেমন কিছু নেই।ভারী পর্দা সরিয়ে দেখলুম, জানলার শার্সি যেমন কে তেমন বন্ধ।

এল এর বাঁকটা ঘুরেও দেখে এলাম। সব কিছু ঠিকই। ঘুমোতে যাবার আগে রুম সার্ভিস ডেকে সমস্ত ভুক্তাবশিষ্ট ফেলে দিতে বলেছিলাম। ফলে পরিষ্কার ঘর। বাথরুম চেক করলাম। একদম ওক্কে। কোথাও কিছু নেই। আবার পেছন ফিরে এল এর বাঁক পেরিয়ে বিছানার কাছে এসে উঠতে যাবো, এমন সময় ড্রেসিংটেবিলে তিনটে জিনিস দেখে আপনা থেকেই থমকে গেলাম।

কিছু জট ছাড়ানো চুল, মেয়েরা চুল আঁচড়ে জট ছাড়ালে যেমন কুন্ডুলিটাইপ একটা গোছ হয়, তেমন,

একটা কালো রঙের চুলের কাঁটা,

আর একটা শুকনো জবাফুল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সিঁদুর লেগে আছে গায়ে। আরো কিছু একটা লেগে আছে ফুলটার গায়ে, শুকনো কালচে টাইপের। সেটা ভালো করে দেখবো বলে এগিয়েছি,

মেঝের দিকে চোখ গেলো।

একটা মুরগীর পায়ের হাড় পড়ে।

শুকনো।

এটা কোনভাবেই আমাদের চিকেন পকোড়ার হাড় হতে পারে না। এক, আমরা এদিকে একবারও আসিনি,

এবং দুই, হাড়টা যে কাঁচা, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এবং তার ওপরেও সিঁদুর লেগে আছে!

স্বাভাবিকভাবেই ভ্রূ কুঁচকে গেলো। এতক্ষণ ধরে রুমে আছি, এসব নোংরা আমার চোখ এড়ায় কি করে? আগে দেখতে পেলে রুম সার্ভিসকে ডেকে পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া যেতো। ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। এখন কি আর কাউকে পাবো? থাক। কাল সকালেই না হয়...

বলতে বলতেই চোখ পড়লো ব্লেন্ডার্সের বোতলটার ওপর। কম করে তিন পেগ তো রয়েই গেছে। আজকে বেশিই হয়ে গেছে সেটা নিজেও বুঝতে পারছি। আর কি খাওয়া উচিৎ হবে? ইত্যাদি দোনোমনা করে ভাবতে ভাবতেই বোতলটা টেনে একটা নীট লার্জ পেগ গলায় চালান করে দিলাম।

দামি হুইস্কি। নিভে আসা নেশাটা তড়াক করে ধরে নিলো। আমেজটা থাকতে থাকতেই লাইট নিভিয়ে,গায়ে ভারী চাদরটা টেনে ফের ঘুমসাধনায় প্রবৃত্ত হলাম।

ঘুমটা এসে গেছিলো তাড়াতাড়িই। বেশ খানিকক্ষণ পরে, আধো জাগরণে, আধো তন্দ্রায় মনে হল, খাটের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কেউ নেই জানি। কিন্তু কেউ দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা তীব্র হয়ে উঠলো।

তার ওপর হঠাত করে মনে হল এসিটা যেন বেশি ঠান্ডা ছড়াতে শুরু করেছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আশ্চর্যজনক ভাবে এসির মৃদু আওয়াজটা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না একেবারেই। কোথাও কোন আওয়াজ নেই, বিন্দুমাত্র আলো নেই, দিকচিহ্ন নেই, কোথায় আছি, কিভাবে আছি, বুঝতে পারছি না। শরীরের নিচে বিছানাটা অনুভব করতে পারছি না। মনে হচ্ছিল যেন গাঢ় নিশ্ছিদ্র অথৈ শূন্যতার মধ্যে কেউ আমাকে গেঁথে দিয়েছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে গলার নিচ থেকে আমার সারা শরীরে কোন সাড় নেই। আরও যেটা অদ্ভুত লাগছিল, যে আমি চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারছি না! মাথা নাড়াতে পারছি না! মানে আমার সমস্ত জোর দিয়ে চাইছি মাথাটা এদিকে ঘোরাতে, পাগলের মত চেষ্টা করছি, ছটফট করছি, তীব্র একটা জান্তব ইচ্ছে দিয়ে চাইছি মাথাটা ঘুরিয়ে চোখ খুলে দেখতে আদৌ কেউ আছে কি নেই....

কিন্তু একচুলও নড়তে পারছি না।

ধীরেধীরে অনুভব করলাম খুব ঠান্ডা কিলবিলে কিছু একটা চাদরের নিচে দিয়ে আমার পিঠে এসে ঠেকলো। সাপে আমার খুব ভয়, বস্তুত ঘেন্না করি। সারা শরীর যেন ভয়েঘেন্নায়আতংকে কুঁকড়ে উঠতে চাইলো। কিন্তু তাও একবিন্দু নিজেকে নড়াতে পারছি না, একবিন্দুও না। সেই ঠান্ডা সর্পিল অনুভূতিটা কক্সিস বরাবর এসে যেন মুহুর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তারপর যেন সেকেন্ডের ক্ষণভগ্নাংশের বিরতি দিয়ে শিরদাঁড়া বরাবর খুব ধীরেসুস্থে পিঠের মাঝখান বেয়ে উঠতে লাগলো। বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত শরীর ছিটকে উঠতে চাইছে, আর্ত গলায় চিৎকার করতে চাইছে, এই ঘৃণ্য অনুভূতিটাকে গলায় দলা পাকিয়ে ওঠা কফের মতই ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে....

কিন্তু আমি বিন্দুও নিজেকে নড়াতে পারছি না!!!

কত স্থিরশঙ্কিত আতঙ্কমুহূর্ত কেটে গেছে খেয়াল ছিল না, সেন্সগুলোও ঠিকঠাক কাজ করছিল না। হঠাত করে বুঝলাম যে সেই শীতল হিলহিলে শিরশিরানি অনুভূতিটা আমার পিঠে আর নেই। খুব মৃদুভাবে হলেও সামান্য সাহস এলো। ভাবছি আবার নড়াচড়ার চেষ্টা করবো কি না, কেন জানি মনে হচ্ছিল যে এবার পারবো, এবং ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম,

কেউ যেন গায়ের চাদরটা টেনে নিচ্ছে ধীরেধীরে!

খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। খুব ধীরে হলেও গায়েহাতেপায়ে সাড় ফিরে আসছিলো। মুঠো করে চাদরটা ধরার চেষ্টা করে বুঝলাম বৃথা প্রয়াস। চাদরটা যেন কোন এক অলৌকিক ম্যাজিশিয়ানের অলক্ষ্য নির্দেশে পৃথিবীর সমস্ত ভার নিয়ে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সরে যাচ্ছিল নিচের দিকে। এবং পায়ের দিকে চোখের তারা নাড়িয়ে দেখলাম, সেই চাদরটিকে যেন খাটের পায়ার কাছে এক অতলান্ত আঁধারসমুদ্র গিলে খাচ্ছে। ধীরে, খুবই ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে যেন আমার সমস্ত সুস্থতার আব্রু ওই চাদরের সংগেই অন্তর্লীন এক নিঃসীম শূন্যতার মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন এক যাদুকর যেন আমার সমস্ত অস্তিত্ব হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতই ওই চাদরে জড়িয়ে অগাধ হাহাকারের মধ্যে...

ততক্ষণে আমার হাতে পায়ে সাড় ফিরে এসেছিলো অনেকটাই। চাদরটা তখন আমার হাঁটুর কাছে। ক্রমশ সরে যাচ্ছে। আধো মগ্নচৈতন্যে ঠিক করলাম ঝটিতি ঘুরে, মাথার কাছে বেডস্যুইচটা অন করে দিই। তাহলে এই অতর্কিত মুভমেন্টে অপ্রস্তুত আমার এই প্রতিপক্ষটিকে দেখতে পারবো। আমিও বাঙাল। যা হবে সামনাসামনি হোক। দেখাই যাক না, কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি?

ফলে আমি বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরার চেষ্টার শুরু করার আগেই চাদরের সরে যাওয়াটা আরও দ্রুততর হল।

এর পরের ঘটনাটা স্রেফ সিনেমায় ফ্রেম বাই ফ্রেম দেখানোই সম্ভব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেলো যেন। মানে আমি সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ডানদিকে ফিরছি, এক এক ক্ষণসেকেন্ড যেন অনন্তসময়কাল মনে হচ্ছে, এবং চাদরটা ততোধিক দ্রুতবেগে হাঁটুর আরও নিচে সরে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে

আমি বাঁ হাত দিয়ে স্যুইচটা ছুঁলাম, বুঝলাম যে চাদরটা আমার ডান পায়ের নখের ডগা থেকে সেই নিঃসীম অন্ধসমুদ্রে মিলিয়ে গেলো...

জাস্ট এক সেকেন্ডের মধ্যে আলো জ্বলে উঠলো।

চাদর আমার গায়ে নেই।

মেঝেতেও নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসলাম। বুঝলাম যে কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমে আছে। হাত দুটো তখনও থরথর করে কাঁপছিল। বেডসাইড টেবিলে জল ছিল, এক নিঃশ্বাসে প্রায় পুরোটা শেষ করলাম। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা বেধড়ক লাফাচ্ছিল। একটু শান্ত হলাম বসে।

তারপর ভাবলাম চাদরটা গেলো কই?

ধীরেধীরে বিছানা থেকে পা নামিয়ে এদিকওদিক দেখে বুঝলাম চাদরের নামগন্ধ নেই। সামান্য এগোতে এগোতে এল এর বাঁকে এসে পৌঁছলাম।

ধীরে ডানদিকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি,

চাদরটা এল এর অন্যদিকে, দরজার কাছে পড়ে!

মনে হল আতঙ্কে গলা চিরে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে আসবে। বাকি সব কিছু আমার নেশা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু যে অলৌকিক উপায়ে কিছুক্ষণ আগেও আমার গায়ে থাকা চাদর, একটা নব্বই ডিগ্রি বাঁক পেরিয়ে সুদূর দরজার কাছে পড়ে থাকে, সেটা কি ভাবে বুঝবো ভেবে পেলাম না!!

আমি আর দেরি করিনি। বালিশ নিয়ে সোওওজা নিচে রিসেপশনে। বাকি রাতটা ওখানেই কাটাই। অনেক উপরোধেও আর রুমে ঢুকিনি। সকাল হলে রুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি করে, চেক আউট করি। দুপুরেই ফ্লাইট ছিল মুম্বাইয়ের।

শুধু বেরোবার আগে বৃদ্ধ রিশেপশনিস্টটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইজ দেয়ার সামথিং রঙ উইদ দ্যাট রুম'?

লোকটা শুধু ঘোলাটে চোখ তুলে মৃদু হেসেছিল।

হাসিটা ভুলবো না। কারণ হাসিটা দেখে আমার ঠিক সেই অনুভূতিটা ফিরে এসেছিল।

নিশ্চুপ নিস্তব্ধ রাত্রে পিঠের শিরদাঁড়া বরাবর হিলহিলে সর্পিল কিছু একটা হেঁটে যাওয়ার শীতল অনুভূতিটা!!!

আগের স্টেশন

-'এই নীরন্ধ্র তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রি। আমার বোধ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এ কোন মৃত্যু উপত্যকা? এ কোন অমানিশা? এ কোন নির্বান্ধব পুরী?'

-'এই তো কত্তার ঘুম ভেঙেছে দেকচি। ওরে কে কোথায় আছিস, গরম দুধে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে নিয়ে আয় দিকিন। আস্তে আস্তে কত্তা, সাবধানে গা টা তুলতে হচ্চে যে। ধকল তো কম গেলনা কদিন।'

-'তুমি কে হে অর্বাচীন? আর এ কি ধরনের ভাষা প্রয়োগ? এই স্থানের নামই বা কি?'

-'আমি, হেঁ হেঁ, তেমন কেউকেটা নই কত্তা। আপনাদের মতন পুণ্যাত্মাদের কাচে তো অ্যাক্কেরে তুশ্চু। উদিকে আমারে ফেরেশতা ডাকে, ইদিকে দেবদূত। আপনি যা খুশি ডাকতে পারেন। গ্যালো বেস্পতবার দুক্কুরবেলা, এই আপনারই মতন এক মহাপুরুষ এসেছিলেন, হিন্দু হৃদয়সম্রাট মোহন বাবু, আমাকে তো দেকেই বললেন, আমাকে নাকি ওনার খুড়শাশুড়ির মেজছেলের বুজুম ফ্রেন্ড এর মতন দেকতে। উনি আমাকে তকাই বলে ডাকবেন। তা ধরুন এই হপ্তায় আমার নাম তকাই। নাম হিসেবে খারাপ কিচু নয় তো '।

-'আ আ আ আপনি, আপনি....'

-'এই দ্যাকো, আবার আপনি আজ্ঞে করে। আরে আপনারা হলেন ধর্মচক্রবর্তী ধর্মকূলতিলক ধর্মাধিকরণ ধর্মবেত্তা। স্বয়ং পরমপ্রভু সকাল থেকে কেবলই ঘরবার কচ্চেন আপনি কখন আসবেন ভেবে। আপনি কি সামান্য লোক কত্তা?'

-'কিন্তু আপনার ভাষা'....

-'ক্যানো কত্তা, খারাপ কিচু? হেঁ হেঁ , মিঠে শান্তিপুরি বাংলা, খারাপ লাগার তো কতা নয়'।

-'কিন্তু এই জায়গাটা কোথায়? আমিই বা এখানে কেন? আমার তো এখন....'

-'হ্যাঁ হ্যাঁ বুয়েচি বুয়েচি। একটু ক্ষমাঘেন্না করে ধইয্যি ধরতে হবে বই কি। এতটা পরিশ্রম করে এয়েচেন। একটু আরাম করে নিন। উফফ কম পরিশ্রম, বোমা বানাও রে, নুকিয়ে নুকিয়ে শরীলের সঙ্গে বেঁধে বাজার বা ইস্কুল কিংবা সেনাঘাঁটিতে নিয়ে যাও রে। কি ঝক্কি বলুন দিকিন। তারপর ধরা পরলে তো পিতৃদেবের নাম বদলে শ্রীমান খগেনচন্দ্র... আমি হলে কিন্তু পারতুম না কত্তা, পষ্ট স্বীকার যাচ্চি।'

-'হেঁ হেঁ, বলছেন? পরমপ্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন তো? যা করেছি ওনার প্রীত্যার্থে, ওনার নামেই। আমার এই আত্মত্যাগ ওনাকে তুষ্ট করতে পেরেছে তো?'।

-'তুষ্ট মানে? হাসালেন কত্তা। উনি তো কাল সকালেই বলছিলেন, ''বুঝলি তকাই, পুরুষসিংহ কেউ হয়ে থাকে তো এই। য্যামন তেজ, ত্যামন সাহস। মা বাবা,বউ, শ''দেড়েক স্কুলের বাচ্চা, কিছুই খোকাকে আটকাতে পারে নি। আহা আহা, কতদিন বাদে দেখলুম রে তকাই, সিংহের বিক্রম আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বুদ্ধি। এ কি সহজ কাজ ভেবেছিস পাগল? একা হাতে শ''দেড়েক বাচ্চা কতল করা কি সহজ কাজ? উল্টে ওইটাই সবচে কঠিন। দয়ামায়া নামের কতগুলো কুফরি সেন্টিমেন্ট ফালতু ফালতু হাত পা টেনে ধরে। তারপর কোমরের বেল্টে বাঁধা বোমা উড়িয়ে, উফফ ভাবলে চোখে জল আসে রে তকাই, এত আনন্দাশ্রু কোথায় রাখি বলতো?'

-'সত্যি বলছেন? উনি প্রীত হয়েছেন? আমার এই শাহাদত ওনার নজরে পড়েছে? হে প্রভু, হে পরমপিতা, দীনদুনিয়ার মালিক, আমার এই আত্মত্যাগ আপনার শ্রীচরণকমলে অর্পন করলাম'

-'এই তো কত্তা বেশ চনমনে হয়ে উটেচেন দেখচি। এবার যে গা তুলতে হচ্চে কত্তা। কিচু সামান্য কাজ বাকি আছে যে।'

-'কাজ? সমস্ত কাজের বন্ধন ছিন্ন করেই তো এসেছি। আমার তো এখন শুধু স্বর্গীয় শরাব খেতে খেতে আয়তচক্ষু চিরকুমারী উদ্ভিন্নযৌবনা বাহাত্তরটি অপ্সরার সঙ্গে লীলাখেলা করার কথা, শেষ বিচারের দিন অবধি।'

-'অপ্সরা সুনে ভালো কতা মনে পড়লো কত্তা, বলি ও মাসি, একটু ইদিকপানে আসুন তো। এই যে ইনি, হ্যাঁ হ্যাঁ ইনিই, আজ এখানে এয়েচেন। এট্টু সেবাযত্ন.... '

-'মানে? এ কি ধরণের প্রগলভ আচরণ? কে এই স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা? কোথায় সেই নীলনয়না বাহাত্তরটি অনন্তযৌবনা অপ্সরী? অধমের সঙ্গে কেন এই ছলনা, হে মহান ফেরেশতা?'

-'হেঁ হেঁ, আপাতত এই দিয়েই কাজ চালান কত্তা। দিনকাল কি বলব স্যার, ভালো মেয়ে পাওয়াই মুশকিল। যারা আচে, ইদিক উদিক ওভারটাইম খাটচে আর কি। আর আজকাল, বলতে নেই কত্তা, শত্তুরের মুকে ছাই দিয়ে আপনাদের মতন মহাত্মারা ইদানীং একটু বেসি বেসি আসচেন কি না, খাটতে খাটতে মেয়েগুলোর কাঁচা সোনার বন্ন অ্যাক্কেবারে কালি হয়ে হয়ে উটেচে,সে নিজের চোখে না দেকলে পেত্যয় যাবেন না কত্তা'

-'আর সেই স্বর্গীয় সুরা?'

-'সব হবে স্যর। আজকাল এট্টু র‍্যাশনিং চলছে কি না। তবে কিনা একবার স্বর্গে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে অবিশ্যি কড়াকড়ি একটু কম..'

-'মানে? এ কি স্বর্গ নয়?'

-'হেঁ হেঁ হেঁ, না কত্তা। এ হল গিয়ে স্বর্গের আগের ইষ্টিশন। দুএকটা খুজরো কাজ একটু এখানে মিটিয়ে যেতে হবে। সে অবিশ্যি তেমন কিচু না। আপনাদের মতন মহাপুরুষ দের কাচে অ্যাগদম বাঁয়ে হাতকা খেলা।এসব ফালতো কাজ না রাখলেই চলে। তবে কিনা নিয়ম হল গে নিয়ম, আর আজকাল অডিটের যা ঝামেলা বোঝেনই তো। হেঁ হেঁ'

-'নিশ্চই মহান ফেরেশতা। বলুন কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে?'

-'কিচ্চু না। তেমন কিচ্চু না। আমি তো ওনাকে বলি, ''এসব নেহাতই বাহুল্য প্রভু। এঁয়ারা সব একএক জন জগতবিজয়ী বীর, এনাদের এইসব তুচ্ছ পরীক্ষা নিতে,বুইলেন কিনা, আমাদেরও বড় ইয়ে লাগে''। তা এখন প্রভুর যা ইচ্ছে, বুইলেন তো! এই তো পৌঁছে গেচি। ইদিকে এই বড় হলঘরটার পানে একটু আসত হচ্চে যে কত্তা, হ্যাঁ মাতাটা একটু নিচে করুন, একটু দরজাটা বাঁচিয়ে, বাঃ বেশ.....'

-'এ কোথায় আনলেন আমাকে, অন্ধকারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওরা কারা? ও ও রা কারা? ওদের ওরকম পাথরের মতন চাউনি কেনো? উঃ, এখানে এত শীত, শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন জমে যাচ্ছে, ওদের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছি না, বর্শার মতন এসে বিঁধছে আমাকে, সরাও ওদের, উঃ, আমার লাগছে , ভয় লাগছে খুব.. ওরে কে কোথায় আছিস? এক্ষুনি সরিয়ে নিয়ে যা এদের...'

-'শ শ শ...আস্তে কত্তা। বেয়াদপি মাপ করবেন, কিন্তুক এখানে আমরা কেউ তেমন চিল্লামিল্লি করি না। আর ওদের কথা জিগ্যেস করচেন? চিনতে পারলেন না? সে কি? ওরা ওই তারা কত্তা, যাদের আপনি ইস্কুলে ঢুকে বন্দুক বোম দিয়ে এক্কেরে সাবাড় করে এয়েচেন,এরা তারাই।'

-'এ এ এ রা এখানে কেন?'

-'একটা ছোট্ট পরীক্ষা বাকি রয়ে গ্যাচে যে। এইটা পাস করলেই, বুইলেন কিনা, ডাঁয়ে বাঁয়ে হেব্বি সুন্দরি সুন্দরি অপ্সরা, রাত দিন খাঁটি দিব্য শরাব, আরও কত্ত কি সুবিধা বিনা ট্যাক্সো তে, ইশশ আমার ই তো ইচ্ছে করে কত্তা পরমপিতাকে বলে ওইদিকে একটা ডেপুটেশন বাগিয়ে নি, আর টিএ ডিএও হেবি ভালো। শুধু যাতায়াতটাই একটু মুশকিল, তবে কিনা.... '

-'আহ, বাচালতা রাখুন। কি করতে হবে ঝটপট বলুন। আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

-'তেমন কিচুই না কত্তা, এই একশো সত্তরজন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক কি অপরাধে আপনি এদের ওপর গুলি চালালেন। মানে এরা ঠিক আপনার কি কি ক্ষতি করেছিল। সব্বাইকে ইন ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করতে হবে, বুইলেনএইটাই আপনার শেষ পরীক্ষা, তেমন শক্ত কিচু নয়, না? আমি তো আগেই কয়েচিলুম আপনাকে'

-'মা...মা...মানে?'

-'মানে আবার কি স্যার? এই ধরুন ওই যে বাঁ দিকে মাঝের সারিতে ছ'বছরের ছেলেটা দাঁড়িয়ে, ওর নাম ইমরান। ওর তিন বছরের চুন্নুমুন্নু বোনটা রোজ রাতে খাবার সময়ে কাঁদে, ভাইয়াকে ছাড়া খাওয়ার অব্যেসটা তেমন রপ্ত হয়নি কি না। একদম পেচুনে এগারো বছরের ছোঁড়াটা? ওর নাম হলো তারিক। বাপ ফৌত হয়েচে বহুদিন, বেধবা মায়ের এক লওতা আর কি, সে মাগি একনো, কি আস্পদ্দা দেকুন, একনো রোজ রাতে ছেলের জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে থাকে, সুনলে কার না রাগ হয় বলুন দিকি? আর ডানদিকে মাঝের সারিতে মিষ্টি গোলগাল ছেলেটা? ওর নাম সুলতান। এর কতা সুনলে তো আপনি হেসেই খুন হবেন। এর আবার এক বুড়ি দাদি ছাড়া তিনকূলে কেউ নেই, এর জানাজার ওপর আছাড়িপিছাড়ি করে বুড়ির কান্নাটা যদি দেকতেন কত্তা, হি হি হি, আমারই ত ভসভসিয়ে পেটের ভেতর থেকে হাসি উটে আসচে। সে বুড়ি অবিশ্যি পরে গলায় দড়ি দেয়, কি অন্যায় বলুন দিকিন। তারপর একদম সামনে বছর পাঁচেকের মেয়েটা, নার্গিস। বাপ আবার শখ করে ডাকতো প্রিন্সেস নার্গিস বলে, হুঁ, যত্তসব নেকপুষু, ঢং দেকে বাঁচি নে বাপু, সে মিনসে নাকি রোজ রাত্তিরে ছাতে উটে আকাশে তাকিয়ে এই এক আকাশ তারার মদ্যি মেয়েকে খোঁজে। গা জ্বলে যায় না এই সব আদিখ্যেতা দেকলে অ্যাঁ? নিজেই বলুন?'

-'আ আ মি পারবো না, পারবো না, কিছুতেই পারবো না। ওদের যেতে বলুন, ওরা এগিয়ে আসছে কেন আমার দিকে। বারণ করুন, ওদের বারণ করুন। এই কে কোথায় আছিস, এদের সরিয়ে নিয়ে যা, আমার দম আটকে আসছে, দূর হ, দূর হ তোরা আ আ আ আ......'

-'কত্তা, বলি ও কত্তা, মুচ্ছো গেলেন নাকি? সাড়াশব্দ নেই যে।

নাহ, এও দেখছি সেই একই ব্যাপার। ওরে কে কোথায় আছিস, এক্ষুণি দৌড়ে আয়। এই বরাহনন্দকেও হাত পা বেঁধে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ কর। জিনা হারাম করে দিলো শয়তানের বাচ্চাগুলো।'

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এলেন বিরক্ত পরমপিতা। তারপর এগিয়ে গেলেন স্বর্গদ্বারের দিকে, কাজ শেষ হয়নি তাঁর।

মার্কেট ভিজিট ১০

পাটনার সবচেয়ে উচ্চবিত্ত ও অভিজাত কলোনিটির নাম হল বোরিং রোড। নাম শুনে নাক সিঁটকোলে কি হবে, পাটনায় ওটিই কিন্তু একাধারে বালিগঞ্জ প্লেস, ডিফেন্স কলোনি এবং মালাবার হিলস, মানে মোস্ট হ্যাপেনিং প্লেস আর কি! ! ওই যে দেখছেন দোতলা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে দাঁতুন করতে করতে থুক করে রাস্তায় থুতু ফেললেন যিনি, তিনি হয়তো রাজস্ব দপ্তরের মহাসচিব। কিংবা বিশাল বাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে যে দেহাতি মহিলাটি দেওয়ালে ঘুঁটে দিতে দিতে পাশেই এলিয়ে থাকা আয়তনয়না গরুটির দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে মৃদুমধুর হাসিতে মাতৃস্নেহের উদ্রেক করছেন, উনি হয়তো তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি। আর ওই যে পুরুষ্ট পুরুষটি হাতের খৈনিটা মুখে ফেলে, কোমরে লুঙ্গির গাঁট থেকে একটা মুঙ্গেরি ওয়ান শটার বের করে বগল চুলকোচ্ছেন, উনি হলেন গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খাস পিএ, বুঝলেন তো? মোটমাট বোরিং রোড হল শহুরে বিহারের আঁভাগার্দ আর কি!

বোরিং রোড কলোনিতে ঢোকার মুখে আরেকটা যে রাস্তা পাটনার এই শঁজেলিজেটিকে আড়াআড়ি কেটে যায়, তার নাম বোরিং ক্যানাল রোড। মন্দির, ষাঁড়, ফুলবেলপাতা, জট লাগানো ট্র্যাফিক, ফর্মুলা ওয়ান বিজেতা রিকশাওয়ালা, মিশন ইম্পসিবল অনুপ্রাণিত পথচারী, জাগতিক ব্যাপারে নিস্পৃহ এক সন্ন্যাসীপুলিশ, ইত্যাদি খচিত সেই বোরিং রোড চৌরাহা থেকে বাঁয়ে মুড়ে থোড়া সা আগে এগিয়ে পাবেন এস কে পুরী কলোনি। আর সেই কলোনি ঢোকার মুখেই রয়েছে,

পাটনা শহরের "ফিরদৌস বররুয়ে", সবচেয়ে বড় অথেনটিক মদের দোকানটি। একমাত্র এখানেই সমস্ত ব্র্যান্ড বলা মাত্র পাওয়া যায়,এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে উটি খাঁটি মাল (পান ইন্টেন্ডেড)। মানে বস্তুটি কঙ্কড়বাগ বা চিতকোহরার কোন খাটা পায়খানা সংলগ্ন গোয়ালে চোলায়িত হয় নাই, এই নিশ্চয়তাটুকু গ্যারান্টিড, এই আর কি।

দুহাজার এগারোর শীতার্ত ডিসেম্বর। পাটনা এসেছি নতুন গো টু মার্কেট, বা জিটিএম মডেল ইম্পলিমেন্ট করতে। মিটিং ফিটিং ঝটপট শেষ করে আমি আর তৎকালীন এ এস এম বিহার, দুজনে হাসিমুখে সেই স্বর্গদ্বারের সমীপে। অনেক গভীর মনোজ্ঞ আলোচনার পর দুজনেই দ্রুত ব্লেন্ডার্স প্রাইডে একমত হয়ে, একটা ফুল বটল হাতে নিয়ে, টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে আসবো, দেখি সামনে এক ঠেলাওয়ালা, বাদাম ছোলা চানাচুর ইত্যাদির পসরা নিয়ে, মদের দোকানের সামনে যেমন হয় তেমন আর কি।

মহেশের হাতে টুক করে বোতলটা দিয়ে বললাম পার্কিঙে গাড়িতে গিয়ে এটা রেখে গাড়িটা নিয়ে আয়, আমি কিছুমিছু নিয়ে নিই। কি খাবি, ছোলা দিয়ে বানাবো না বাদাম দিয়ে?

মহেশ খানিকক্ষণ গভীর চিন্তা করে বলল, বাদাম দিয়েই বানাতে বলিস, হ্যাঁ, একটু বেশি করে পিঁয়াজ দিতে বলতে ভুলিস না যেন, এই বলে তিনি বোতল হাতে নিয়ে দূরে পার্ক করে রাখা গাড়িটির দিকে রওনা দিলেন।

আমি অত্যন্ত পুলকিত হৃদয়ে অনভ্যস্ত ঠোঁটে ওড টু জয় শিস দিতে দিতে সেই ঠেলাওয়ালার সামনে এলাম।

তেনাকে দেখলেই মুক্তসাধক বলে মনে লয়। বসা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে বৈরাগী দৃষ্টি। একটা শতচ্ছিন্ন বিতিকিচ্ছিরি রকমের নোংরা লুঙ্গি পরনে। প্রচুর কোম্পানি নিজেদের প্রচারের জন্যে ফ্রিতে টিশার্ট বিলোয়, তারই একটা গায়ে, পোস্ট কুরুক্ষেত্র কন্ডিশনে। সামনে একটি একটি কেঠো ঠেলা, ওই কুরুক্ষেত্র থেকেই আনা আর কি। তার ওপর বিভিন্ন বয়ামে (বোতল বা শিশি নয় হে, বয়াম,মাইন্ড ইট) বাদাম,ভাজা

ছোলা, মুগডাল ভাজা, চানাচুর ইত্যাদি। সেই বয়ামক্ষেত্রের মধ্যে একটি বৌদ্ধযুগের রিকেটি দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লার পাশে একটা স্টিলের বৌলে ভেজানো ছোলা, পাশের আরেকটা ঐ ঐ বৌলে ভেজানো ও সিদ্ধ কাবলি মটর। দাঁড়িপাল্লার পাশে একরাশ চারটুকরো করে কাটা পিঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা পড়ে। আরও আছে একটা ছোট্ট কিউবয়েড সাইজের কাঠের টুকরো, পিঁয়াজকুচি করার জন্যে।

যাই হোক। আসার আগে দুটো বিয়ার মেরেও এসেছিলুম। মনটা ভারি ফুরফুরে ছিল। এসে উদার মনে একশো গ্রাম বাদাম মাসালা অর্ডার দেবো, (কাঁচা লঙ্কা বেশি করে), ঠিক তক্ষুনি উনি এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন, পরনে সালওয়ার কামিজ, চুল মুঠো করে বাঁধা, একটা স্লিং ব্যাগ কাঁধের একপাশ থেকে ঝুলছে।

সেই ক্ষীনকটি তন্বীশ্যামাশিখরিদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মহিলাটির প্রতি কটাক্ষনয়নপাতমানসে ঘাড়টা ঘুরিয়েই আমি থ!

উনি শি নন, হি!

কিন্তু সে কথা কে স্বীকার করবে? সেই নতনেত্রদৃষ্টিসম্পাতে, লজ্জাপ্রকাশে, ব্রীড়ায়, লাস্যে, হাস্যে, হিল্লোলে, শরীরী বিভঙ্গে এবং কাজলনয়নকটাক্ষাঘাতে উনি সাক্ষাৎ অড্রে হেপবার্ন, রোমান হলিডের সেট থেকে ডিরেক্ট বিহারের এই সান্ধ্যবিহারে!

আশেপাশে অনেকেই দেখলাম একটু সরে গেলো। মদের দোকান থেকে এদিকে উঁকিঝুঁকি শুরু। ''মওসি আ গ্যয়ি '' বলে কে যেন দুই হাতের তালুতে চাপড় মেরে চটাস চটাস আওয়াজ তুলে বিশ্রী ভাবে হাসতে লাগলো। দোকান থেকে নেমে পাশ দিয়ে যাবার সময় একজনকে দেখলাম পানছোপানো দাঁত বার করে একটু চোখ টিপে যেতে।

আমারও, বলতে নেই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ট্রেনে যা অসভ্যতা করতে দেখেছি এদের, রামঃ।

এমন সময় সেই উনি কাংস্যবিনিন্দিত স্ট্রে বললেন 'পাঁচ রুপাইয়েকা বাদাম দিজিয়েগা কাকা, পিঁয়াজ অওর মসালা জ্যাদা'। সেই ঠেলাওয়ালাও অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক স্বরে 'তিখা বানাউঁ?' জিজ্ঞেস করে অভ্যস্ত হাতে বাদাম, পিঁয়াজকুচি আর কাঁচালঙ্কা কুচি একটা পায়খানার মগ টাইপ দেখতে প্লাস্টিকের ইয়েতে ফেলে, তাতে মাথাফুটো ছিপি লাগানো পুরোন প্লাস্টিকের বোতল থেকে টিপে একটু সর্ষের তেল ছিড়িক ছিড়িক করে ছিটিয়ে একটা ছোট্ট সরু কাঠের ডান্ডা দিয়ে নাড়াতে লাগলো। এরপর সেই ঘ্যাঁট একটা ঠোঙায় সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে স্তিমিত স্বরে বললেন 'ইয়ে লিজিয়ে, ছুট্টা দিজিয়েগা'।

সেই মানুষটি ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মেরে পাস শ'রুপেয়া কা নোট হ্যায়, আপকে পাস ছুট্টা হোগা জী?'

প্রায় চমকে উঠেছিলুম, মাইরি বলছি। মানে ইয়ে আর কি, এইর'ম লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে এট্টু কেমন কেমন লাগে না? একটু সামান্য ভয়, অনেকটা ঘেন্না মেশানো একটা ইয়ে ইয়ে টাইপের আর কি। সেই ছোটবেলায় বাচ্চুকাকুদের বাড়িতে বাচ্চুকাকুর ছেলে হওয়াতে এরা ঢোল বাজাতে এসেছিল। বাচ্চুকাকুরা দরজা খোলেনি। কি্ব খিস্তি কি্ব খিস্তি মাইরি, তাও হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে। একজন তো ছ্যাড়ছ্যাড় করে পেচ্ছাপও করে দিলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছিলাম, বাবা এসে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলো, স্পষ্ট মনে আছে।

সেই এদেরই একজন, আমার দিকে হাসিমুখে তাকাতে কেমন যেন মনে হল সেই প্রাচীন পেচ্ছাপের কয়েকটা ফেঁটা চোখেমুখে এসে লাগবে। ত্বড়িতগতিতে বলে উঠলাম ''ন্না, মানে অ্যাগদম খুজরা নেহি হ্যায়, বিশ্বাস কিজিয়ে''। আশেপাশের জটলা থেকে একটা হাসির হররা উঠলো, সিটির আওয়াজে আশপাশ মুখরিত। ইনি সামান্য অপ্রতিভ। এমন সময় সেই ঠেলাওয়ালা খুবই ক্লান্ত নিরাসক্ত স্বরে বললো, 'ইধার দিজিয়ে, শায়েদ মেরে পাস ছুট্টা হ্যায়'। মিনিটখানেক পরে সেই মানুষটি যখন বেশি করে পিঁয়াজ দেওয়া ঝালঝাল বাদামমাখা আর পঁচানব্বই টাকা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছেন, মদের দোকানের সামনে

''লচক মচক চলে জুবনা হামার'' গান শুরু হয়ে গেছে সমস্বরে। মদের দোকানির মুখেও সস্নেহ মৃদু হাসি। প্রভূত অশ্লীল হাসির গরগরাহট স্তিমিত হয়ে এসেছে, এমন সময়ে আমি আমার অর্ডার দিয়ে স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে সেই ঠেলাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম 'এইরকম জ্যায়সা লোগ আপনার কাছে আতা হ্যায়, আপনার খারাপ নেহি লাগতা হ্যায়?'

কোথায় একটু রঙ্গরসিকতা করবে বাকিদের মতন তা নয়, এ বাবু তেমনই নির্লিপ্ত স্বরে বললেন 'কিঁউ? ইসমে খারাব লাগনেওয়ালি কেয়া বাত হ্যায়?'

না মানে, ছেলে না মেয়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, গলাটাও কেমন কেমন, কির''ম বিচ্ছিরি করে হাত্তালি দেয়, আশেপাশে এলে এট্টুস কেমন কেমন লাগে না?

উদাসীন ভাবে প্লাস্টিকের কৌটোয় ডান্ডা ঘোরাতে ঘোরাতে সেই নির্মোহ স্বরে উনি বললেন 'উসমে হামরা ক্যায়া?'

তা নয়, তবে কিনা ঠিক আমাদের মতন ইয়ে, মানে নর্ম্যাল নয় কি না, দেখে এট্টুস গা'' টা কেমন করে ওঠে না, অ্যাঁ?

সে ভদ্রলোক স্থিতধী বুদ্ধের প্রজ্ঞায় নির্লিপ্ততায় জিজ্ঞেস করলেন ' বাবুজি, এক চিজ বাতাইয়ে, আপকো ইয়া হামকো কওন বানায়া?'

সামান্য ঘাবড়ে গেসলুম, ''বানায়া'' মানে? আমি কি, ইয়ে মানে বাদাম মাখা নাকি? তারপর যাকে বলে বক্তব্যটি প্রণিধান হল। হাসিমুখে বললুম 'সব লোক তো বোলতা হ্যায় উপরওয়ালানে বানায়া হ্যায়, হ্যা হ্যা'।

'হাম সবকো উওহি বানায়া, হ্যায় না?'

'সে তো একশোবার হ্যায়'।

'তো ফির উস ইনসান কো ভি উও উপরওয়ালে নে হি বানায়া হোগা। নেহি? আব ইসমে উপরওয়ালে কো কোঈ তকলিফ নেহি হুয়া, তো হামকো ক্যায়া? ইয়ে লিজিয়ে আপকা সামান, পচ্চিস রুপেয়া ছুট্টা দিজিয়েগা'।

টাকা মিটিয়ে চুপচাপ নিজের সামান নিয়ে বেরিয়ে এলুম।

ঈশ্বর যে কখন শিক্ষা দেন, কার হাত দিয়ে দেন, সে শুধু তিনিই জানেন!

একটি বিয়ের গল্প

'নমস্কার'।

'নমস্কার'।

'হেঁ হেঁ, একটু বসতে পারি? আসলে বড় ফ্যানটা এখানেই রেখেছে কি না! নিচে যা ভীড় আর গুমোট গরম, বাপরে। ডিস্টার্ব করলাম না তো?

'আরে না নানা, নট অ্যাট অল, বসুন বসুন। একটু পরেই বিয়ে শুরু হবে, ভীড় তো হবেই এখন।'

'আর গরমটাও পড়েছে মশাই, অ্যাঁ? সবে মার্চ মাস, এখনই যা আগুন ঝরাচ্ছে, মে জুনে তো একেবারে ফাটিয়ে দেবে মনে হচ্ছে। এসব ওই গ্লোবাল ওয়ার্মিং না কি, তার জন্যেই হচ্ছে নাকি ভাই?'

'বলা যায় না, হতেও পারে, তবে গরমটা যে জব্বর পড়েছে, সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, গায়ে পাঞ্জাবি পরে আছি না ভিজে ন্যাতা জড়িয়ে রেখেছি বোঝাই যাচ্ছে না'।

' হ্যা হ্যা হ্যা। বেড়ে বলেছেন মশাই। ইয়ে, আমার নাম জগবন্ধু দাস, এদের প্রতিবেশী হেঁ হেঁ। বুলু, মানে যে কনে আর কি, তার বাপ হরিসাধন আমার সেই ইয়েবেলার বন্ধু বুঝলেন, সেই ভরদ্বাজ শিক্ষাশ্রম থেকে একসঙ্গে....'।

'আমি অভিলাষের, মানে বরের বন্ধু। আপনার থেকে অনেক ছোটই হবো, আমাকে তুমিই বলুন '।

'বাহ বাহ, চমৎকার। আজকাল তো এসব উঠেই গেছে হে, এমন বিনয়ী ইয়ে চট করে দেখাই যায় না, হ্যা হ্যা। তা বাপু তুমি কি বরের ছোটবেলার পাড়ার বন্ধু না স্কুল কলেজের?'

'দুইই বলতে পারেন। আমরাও ওই, ইয়েবেলার বন্ধু আর কি'।

'বাহ বাহ। তাহলে ওদের সব খবরই জানো বলতে হবে ভায়া। তা ছেলের বাড়ি তো শুনলাম বেশ পয়সাওয়ালা, না কি?'

'ওই আর কি। কলকাতা দুর্গাপুর মিলিয়ে তিনটে সোনার শোরুম, কলকাতা শহরে খান চারেক বাড়ি, সাউথ সিটিতে দুটো ফ্ল্যাট, দার্জিলিঙে একটা বাগানবাড়ি... '

'বাহ বাহ, বেশ বেশ, শুনে ভারি খুশি হলুম। তা ছেলে তো এমনিতে ভালোই শুনলাম, তাই তো? লেখাপড়াতে তো ভালোই, না কি?'

'সি ইউ থেকে ফার্স ক্লাস ফিজিক্স অনার্স, আর তারপর ওখান থেকেই এমবিএ। সিটিব্যাঙ্কে বারো লাখটাকার অফার ছিলো, ছেড়েছুড়ে বাবার বিজনেস দেখতে এসেছে। এখন একে যদি লেখাপড়া বলতে চান...'

'বলো কি হে! এ তো রীতিমতো শিক্ষিত দেখছি। আমার তো ধারণা ছিল এইসব বড়লোক বিজনেসম্যানদের ছেলেগুলো একেকটা তেএঁটে বদমাশ হয়। রাতদিন কলেজে লাফাঙ্গাগিরি করে, মেয়েদের বিরক্ত করে আরা সারাক্ষণ মদ গাঁজা খায়'।

'ইয়ে, কাকু বোধহয় খুব বাংলা সিনেমা দেখেন, না?'

'অ্যাঁ? হেঁ হেঁ, তা আর না বলি কি করে ভাই। আজকাল অবশ্য কমই হয়, টাইম কই? এককালে খুব দেখেছি বুইলে, স্বপন সাহার কোনও ছবি বাদ দিইনি। আহা, কিসব হলকাঁপানো ছবি ছিলো রে ভাই, ''বাবা কেন চাকর'', ''সখি তুমি কার?'', ''মানুষ কেন বেইমান'', ''সন্তান যখন শত্রু'', উফফফ। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় ভাই। যাকগে যাক, তা ছেলে ভালোই বলছো? '

'হীরের টুকরো ছেলে কাকু, নিজের বন্ধু বলে বলছি না। ছোটবেলা থেকে তো চিনি। অত্যন্ত সভ্যভব্য, সৎ ছেলে, বন্ধুদের দেখে, গরীবলোক দেখলে দানধ্যান করে, মা বাবার কথা শোনে, লোক ঠকায় না, ভদ্র ব্যবহার। পার্টিতে গেলে এক আধ পেগ মদ খাওয়া ছাড়া আর কোনও নেশাই নেই। আর কাকু কাকিমাকেও তো চিনি, খুবই ভদ্র সজ্জন ফ্যামিলি। পাড়ায় খুবই জনপ্রিয়।'

'বাহ, তাহলে তো ভালোই বলতে হবে।'

'ইয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম নাকি?'

'অ্যাঁ? আরে না রে বাপু। বলি আমাদের বুলু, সেও কি কম নাকি? লেখাপড়া খেলাধূলা সব মিলিয়ে চৌখস মেয়ে। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক না কি একটা বেল্ট, সাইক্লিং আর সাঁতারে স্টেট চ্যাম্পিয়ন। তার ওপর যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে সিভিল সার্ভিস দিয়ে আইপিএস অফিসার, হে হে হে, মেয়ে কিন্তু আমাদের কম নয় বাবা।'

'সে আর আর বলতে? হাড়ে হাড়ে চিনেছি, বাপ রে। যা গরম মেজাজ।'

'তা পুলিশের মেজাজ গরম হবে না তো কি আইসক্রিমের মতন ঠাণ্ডা মোলায়েম হবে, অ্যাঁ?'

'তা নয়। তবে কিনা...'

'হ্যা হ্যা হ্যা। তোমার বন্ধু কিন্তু শক্ত পাল্লায় পড়তে চলেছে ভাই, হ্যা হ্যা। ক্লাস টেন না ইলেভেনে পড়ার সময় বেপাড়ার দুএকটা ছেলে আমার মেয়েকে কিছু টোনটিটকিরি কেটেছিল, বুইলে। আমার মেয়ে হলো গিয়ে আবার বুলুর এক্কেবারে বুজুম ফ্রেণ্ড। তারপরে, বুলু গিয়ে তিনটে ছেলেকে সে কি মার, কি মার! একটার তো হাত ভাঙলো, আরেকটার বোধহয় বাঁ পা, আর শেষেরটার বোধহয় নাক আর তিনটে দাঁত। সে থানাপুলিশ, পাড়া বেপাড়ার ছেলেপিলে নিয়ে কি হুলুস্থুলু কান্ড রে ভাই। থানার ওসি তো শুনে হাসতে হাসতে মরে আর কি। তারপর বুলুকে ডেকে মাথায় হাত রেখে বলে ''বেটা, পোলিস মে আনা হ্যায় তো বাতা'', তারপর ছেলে তিনটেকে কেঁৎকা দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে চলে গেলো। শেষে হরিসাধন নিজে এগিয়ে এসে ছেলেগুলোর চিকিৎসার পয়সা দিতে সব ঠাণ্ডা হয়। উফ, সে যে কি ঝামেলা রে ভাই, কি বলবো। আমার মা তো বলেই দিয়েছিল, এই ধিঙ্গি মারকুট্টে মেয়ের বিয়ে হবে না, হতেই পারে না। শাস্ত্রে যেন কি একটা লেখা আছে না, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম বলে?'

'ভাগ্যিস..'

'অ্যাঁ? কিছু বললে নাকি? '

'না, সে কিছু বলিনি। বলছি এসব অবশ্য আমরা আগেই শুনেছি। তা আপনার মেয়ের জন্যে এত কিছু হলো, সে কিছু বললো না?'

'সে আর কি বলবে? বুলু ওর বুজুম ফ্রেণ্ড বললুম, না! মা আমার ভারি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে, কোনও ঝুটঝামেলার মধ্যেই নেই, সাত চড়ে রা কাড়ে না। তার ওপর বলতে নেই দেখতেও প্রতিমার মতন। ওর মায়ের রঙ আর রূপ পেয়েছে কিনা, হেঁ হেঁ হেঁ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকুরটি। হোম সায়েন্সে বি এ, আর কি ঠাণ্ডা ব্যবহার আর কি বলবো..তবুও....'

'তবুও কি? ও কাকু, ফের একটা ফোঁৎ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যে!'

'এই তো বুলুর মতই বয়েস আমার মেয়ের। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তবুও দেখো, গত একবছর ধরে যে পাত্রই দেখি তাকেই আমার মেয়ে না করে দিচ্ছে, কি কেস জিজ্ঞেস করলেই বলে তার নাকি পছন্দ নয়! কি যে চায়, আইনস্টাইন নাকি প্রসেনজিৎ, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলি বলতো ভায়া? একমাত্র মা মরা মেয়ে, কড়া করে কিছু বলতেও পারি না। বলি অমন মারকুট্টে মাথাগরম মেয়েটার অবধি বিয়ে হয়ে গেলো, আমার মেয়েটাই কি...'

'আরে কাকু, সেসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। বেদে না বাইবেলে কিসে একটা বলেছে না, ম্যারেজস আর মেড ইন হেভেন? সময় হলে দেখবেন, নিশ্চয়ই...

'বলছো, অ্যাঁ? বলছো? জয়ন্তারা! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক হে। নাহ্‌, এইবার মেজাজটা বেশ খোলতাই লাগছে। তা ইয়ে, একটা কথা বলো তো বাপু। আমি শুনেছি এই বিয়ের ভেতরে কি একটা নাকি গল্প আছে? বলি কেলেঙ্কারি কিছু আছে, না? খোলসা করে বলো দিকিন বাপু। আরে না না, এই শর্মা কাউকে বলবে না, ভগবানের কিরে'।

'হেঁ হেঁ, নিজের বন্ধুর গোপন কথা ফাঁস করতে বলছেন কাকু? কথা এদিকওদিক হবে না তো? প্রমিস?'

'আরে, বাবা লোকনাথের নামে প্রমিস রে ভাই। বিশ্বাস হচ্ছে না? হচ্ছে না? ঠিক হ্যায়, না হয় তো শ্রীরামকৃষ্ণর নামে করছি...'

'না না ঠিক আছে। শুনবেনই তাহলে? এক্কেবারে ছাড়বেন না? তবে শুনুন।

অভিলাষদের যে তিনটে যে শোরুম, তাদের মধ্যে সবচাইতে বড় যেটা, সেটা হচ্ছে সল্টলেকে, অভিলাষ ওখানেই বসে। তা ধরুন বছর দেড়েক আগেকার এক অক্টোবর মাস নাগাদ, সেই দোকানে একটা কেলো হয়।

অভিলাষের আরেক বন্ধু আছে বুঝলেন, রজত নামের, রজতশুভ্র মণ্ডল। পাজির পাঝাড়া এক নম্বরের, পাক্কা শয়তান, কম করে তিন তিনটে থানায় ওর নামে এগারোখানা কেস ঝুলছে। আমরা যত বারণ করি ওর সঙ্গে মিশিস না, কে কার কথা শোনে? যাই হোক, সেই অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ, খুব সম্ভবত বুধবারই হবে, অভিলাষ দোকান বন্ধ করে লেকটাউনে রজতের বাসায় গেছিল কি একটা পরামর্শ করতে। পরে শুনেছি রাত দশটা অবধি ওইখানেই ছিলো। হঠাৎ সেখান থেকেই নাকি ওদের দোকানের সিকিওরিটি ওকে খবর দেয় ভেতরের অ্যান্টি বার্গলারি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে, অভিলাষ যেন এক্ষুণি দোকানে আসে।

যা হয়, ওখান থেকেই পুলিশে খবর দিয়ে অভিলাষ আর রজত তো দৌড়ল দোকানের দিকে। এদিকে খবর পেয়ে কাকু, মানে অভিলাষের বাবাও গিয়ে হাজির।'

'বাপ রে। সোনার দোকানে ডাকাতি? খুব ডেয়ারিং ডাকাত বলতে হবে'।

'সে আর বলতে? যাই হোক, তা খবর পেয়ে তো আপনাদের বুলু ম্যাডাম এসে হাজির, তিনিই তখন বিধাননগর দেখতেন কি না, সঙ্গে বিশাল পুলিশ ফোর্স। তা সারা দোকান ঘিরে মাইকে করে প্রচুর ধমকি টমকি দেওয়া হলো, সল্টলেক তো প্রায় ভেঙে পড়েছিল নাটক দেখতে।'

'তারপর? চোর ধরা পড়লো?'

'সেইটেই তো কথা। মাইকিং করে কোনও কাজ না হওয়াতে শেষে চাবি দিয়ে শাটার খুলে দরজা খোলা হলো। কাকু তো অভিলাষকে কিছুত্তেই ভেতরে যেতে দেবেন না। ওদিকে পুলিশ গুলো অবধি ইতস্তত করছে, কটা ডাকাত আছে, তাদের হাতে কি আর্মস আছে হাতে কেউ জানে না। ও মা, ম্যাডাম দেখি সার্ভিস রিভলভার হাতে দরজায় দাম করে একটা লাথি মেরে ঢুকে সোজা ঢুকে গেলেন'।

'বুলুটা চিরকালই ডেয়ারডেভিল। তা বাপু তুমিও ছিলে নাকি? নইলে দেখলে কি করে?'

'উরিত্তারা, কাকুর অবজার্ভেশন পাওয়ার তো সাংঘাতিক! ঠিক ধরেছেন কিন্তু! আসলে ওদের সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির অনেকদিনের আলাপ, তার ওপর এতদিনের বন্ধুত্ব। না গিয়ে পারি বলুন?'

'হ্যা হ্যা হ্যা। অডিটে ছিলাম পাক্কা সাঁইতিরিশ বচ্ছর ভাই। আমার নজর ফাঁকি দেওয়া... হ্যা হ্যা হ্যা। যাই হোক, তারপর? চোর ধরা পড়লো?'

'আরে সেইটাই তো মজা কাকু, গিয়ে দেখা গেলো কেস এক্কেবারে করেকেটেঘ্যাঁচাং।'

'মানে?'

'মানে শর্টসার্কিট কেস। অ্যালার্মের সার্কিট শর্ট হয়ে গিয়ে এই বিপত্তি!'

'বোঝো কাণ্ড! তারপর? পুলিশ নিশ্চয়ই খুব হম্বিতম্বি করলো? বুলু কিন্তু খুব শর্ট টেম্পার্ড মেয়ে, মুহূর্তেই মেজাজ গরম হয়ে যায়। আর হাত পা চলে তো...'

'আরে না না, তেমন কিছু বলেনি। অভিলাষের বাবা তো লজ্জাটজ্জা পেয়ে মাফ চেয়ে নিলেন। তারপর অত রাতেই মিষ্টি আর কোল্ড ড্রিঙ্কস এনে খাওয়ালেন সব্বাইকে।'

'তারপর নিশ্চয়ই ব্যাপার চুকেবুকে গেলো?'

'যেত, যাওয়ারই কথা। ঝামেলা পাকালো রজত'।

'সেই লেকটাউনের বন্ধু? এর নামেই খুব একচোট গালমন্দ করলে না একটু আগে?'

'হ্যাঁ, সেইই। এক নম্বরের উচক্কা বদমাশ, মিটমিটে ডান একটা, পেটেপেটে খালি কুবুদ্ধি..'

'ওরে বাবা, গুণধর ছেলে মনে হচ্ছে! তা সে কি করলো?'

'রজতের পাক্কা জহুরির চোখ, নিজেও পাক্কা মেয়েবাজ কি না। সে তো অভিলাষের মুগ্ধ চোখমুখ দেখে বুঝেছে কেস খুব ঘোরালো। সে নিজেই গিয়ে ম্যাডামের সঙ্গে আলাপটালাপ করে ম্যাডামের ফোন নাম্বার যোগাড় করে... '

'বাপ রে, বলো কি? মানতেই হবে, ছোকরার এলেম আছে হে। ওইভাবে বুলুকে অ্যাপ্রোচ করা আর বাঘের গুহায় মাথা গলানো একই ব্যাপার। তাহলে বলি শোনো, বুলু যখন ক্লাস এইটে পড়ে, সরস্বতীপুজোর দিনে পাশের পাড়ার কে যেন একজন রিকশা করে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ফুলবাবুটি সেজে এসেছিল বুলুকে প্রেমপত্র দেবে বলে। সে তো রিক্সা দাঁড় করিয়ে সোওজা গিয়ে বুলুদের বাড়ির কলিং বেল টিপে দাঁতটাঁত কেলিয়ে প্রপোজ করে একশা....তারপর কি্ক কান্ড!'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন বাড়িতে হরিসাধন আর বাকিরা কেউ ছিলো না। নইলে সে ছোকরা বেঁচে যেতো। '

'বেঁ..বেঁচে যেতো মানে?

'মানে আবার কি? যে রিক্সা চড়ে এসেছিলো, শেষে সেই বেচারাকে ওই রিকশাই নিজে চালিয়ে ফিরতে হয়, স্রেফ জাঙিয়া পরে। রিক্সাওয়ালা ছোকরা তো সেই রণংদেহী মূর্তি দেখে সোজা পগারপার, বোধহয় সিধে ছাপরা পৌঁছে নিঃশ্বাস নিয়েছিলো। উফফ, সেও আরেক কাণ্ড, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। তা তোমাদের সেই রজত ছোকরা দিব্যি গিয়ে ফোন নাম্বার চেয়ে নিলো?'

'আরে মেয়ে পটাতে রজতের জুড়ি আছে নাকি? বল্লুম যে, এক নম্বরের লাফাঙ্গা! তা সে যাই হোক। রজতের তো জহুরীর চোখ, সে তো দেখামাত্র বুঝেছে, আপনাদের বুলুর বীরত্বে অভিলাষের মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে একেবারে দর্শকদের মধ্যে। সে করলো কি, ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখে, মানে অভিষেকের জন্মদিনে, এক এলাহি বার্থডে পার্টির আয়োজন করে বসলো। বলা বাহুল্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে স্টার অ্যাট্রাকশন বুলু ম্যাডাম স্বয়ং!'

'ইন্টারেস্টিং হে, খুবই ইন্টারেস্টিং। তা বুলু গেলো? ও কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট শুনেছি'।

'তা ম্যাডাম এলেন বই কি। একা নয় অবশ্য, সঙ্গে এক বান্ধবী ছিলেন। ছোটখাটো ফর্সামতন মিষ্টি দেখতে। খুবই কম কথা বলেন যদিও। অলিভিয়া না কি যেন একটা নাম।'

'অ্যাঁ? কি বললে? অ'

'কি হলো, অ বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?'

'ও কিছু নয়, তুমি বলে যাও।'

'যাই হোক, মোটমাট অভিলাষ চেষ্টা করলো অনেক। কিন্তু আদ্যন্ত ভালো ঘরের ছেলে, কড়া শাসনে মানুষ। রজতের মতন ছ্যায়েলছবিলা নাকি? ফলে বুলুম্যাডাম যেমনকে সেই। ঘন্টাদুয়েক শুকনো মুখে বসে থেকে শেষে গুনে গুনে দুচামচ বিরিয়ানি খেয়ে উঠে পড়লেন। কি বলবো কাকু, আরসালানের আসাদৌল্লাহ উস্তাদকে ডেকে স্পেশালি বানানো বিরিয়ানি, দেবভোগ্য জিনিস কাকু, দেবভোগ্য জিনিস! ও জিনিস যে

কেউ হেলাচ্ছেদ্দা করে উঠে আসতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। পাপ, কাকু ও বিরিয়ানি ফেলে আসা পাপ। ইশশ... আমি তো ডাব্বা করে বাড়িতেও.....'

'হুম, তাহলে ভবী ভুললো না?'

'নাহ, কিছুতেই কিছু হলো না। মাঝখান থেকে ওই ক্যারেক্টারলেস রজত অলিভিয়াকে তুলে ফেললো'।

'ক্কি ক্কি ক্কি বললে? তুলে ফেললো মানে কি? মাছ নাকি যে তুলে ফেলবে? অত্ত সহজ?'

'আর কাকু, আপনিও মাইরি। বিদ্রোহী কবি শরৎচন্দ্র বলেছেন প্রেমের ফাঁদা পাতা ভুবনে, এর ওপরে আর কথা হয়, অ্যাঁ? আর তাছাড়া কালো, বেঁটে, মোটা আর টাক হলে কি হবে, রজতের একটা অদ্ভুত মেয়ে পটানোর ক্ষমতা আছে। আর তার ওপর টাকা তো আছেই। তাছাড়া একটা মাচো ইমেজও আছে, সবসময় একটা রিভলভার নিয়ে ঘোরে কি না'।

'রি-রিভলভার?'

'আরে ছাঁট লোহার কারবার না ওদের? এসব লাইনে রিভলবার তো রাখতেই হয়। আর তাছাড়া দুটো ডান্স বারও আছে যে, খুন যখম পুলিশ নিত্যই লেগে আছে। খড়গপুরের মস্তান শ্রীরামুলু আর খিদিরপুরের আসলাম ভাই তো ওর বাবার বুজুম ফ্রেণ্ড! ফলে বুঝতেই পারছেন, আমরা তো পইপই করে অভিলাষকে বারণ করি, ওরে ওর সঙ্গে মিশিস না, মিশিস না মিশিস না। তা কে শোনে কার কথা।লাস্ট বার যখন রজতকে পুলিশে ধরে, অভিলাষই তো বেইল করিয়ে আনলো'।

'থানাপুলিশ? লাস্ট বার? মানে ছোকরার সেখানে রেগুলার যাতায়াত আছে নাকি?'

'আছে তো বটেই। তবে লাস্ট বারে জোর ফেঁসে গেছিলো। ওর আগের গার্লফ্রেণ্ডকে তো পাওয়া যাচ্ছিল কি না! কেউ বলে সোনাগাছিতে বেচে দিয়েছে, কেউ বলে প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছিলো বলে মেরে পুঁতে দিয়েছে'।

'মাই ঘড!!!'

'এতেই মাই ঘড? তাহলে তো কাকু আপনি রজত কে চেনেনই না। ছেলে মাধ্যমিক ফেল করার পরেই বাবার ব্যবসায় ঢোকে, বুঝলেন? প্রথম খুন সতেরো বছর বয়সে, গলায় ছুরি চালিয়ে। স্রেফ প্রূফ নেই বলে ছাড়া পেয়ে যায়। তারপর থেকে এখনও অব্ধি সাতটা খুন নিজের হাতে করেছে, কটা করিয়েছে জানি না। কাকপক্ষীতে টের অবধি পায় নি। হাওড়ার রেলসাইডিঙের সমস্ত গুণ্ডামস্তান গুরু বলতে একজনকেই মানে, শুনে রাখুন। আর তো আর, রজতশুভ্র মণ্ডলের নাম লালবাজারে স্পেশাল ওয়াচ লিস্টে রাখা আছে, জানেন সেটা? এর থেকে আর বেশি কি বলবো? যাক গে যাক, যা বলছিলাম। তা অভিলাষের কাজের কাজ তো কিছু হলো না, এদিকে অলিভিয়া আর রজতের তো প্রেমের ফুল ফুটে ফল ধরে ধরে আর কি'।

'ভাই, জলের গ্লাসটা একটু দেবে? শরীরটা কেমন...'

'এ কি! শরীর খারাপ লাগছে নাকি? আপনার বাড়ির লোকজনকে ডাকবো? য্যাত্তারা, এই নিন জল খান দেখি। প্রেশারটা ফল করলো নাকি? কি জ্বালা, দাঁড়ান দেখি....'

'না বাবা, কাউকে বলতে হবে না। উতলা হয়ো না, আমি ঠিক আছি। তারপর কি হলো বলো।'

'বলছেন? আপনি কিন্তু ঘামছেন কাকু, গলাটাও খুবই নির্জীব মনে হচ্ছে কিন্তু! ঠিক আছেন বলছেন? আচ্ছা, পাখাটা আরেকটু আপনার দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। যাক গে যাক, তা কি বলছিলাম? হ্যাঁ। তা অভিলাষের তো চিঁড়ে ভিজলো না। মাঝখান থেকে আবার এক কেলো'।

'অ্যাঁ? ফের কি হলো? অলিভিয়া কে নিয়ে কিছু...'

'আরে ন্না ন্না, তা নয়। এর পরের মাসেই ফের এক রাত্রে অভিলাষের দোকানে সেই বার্গলার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ফের তুলকালাম কাণ্ড। ফের বুলুম্যাম আর পুলিশ বাহিনী'।

'এবার কি সত্যি চোর?'

'নাহ, এবারেও ফলস, সেই একই কেস। এইবারে কিন্তু বুলুম্যাডাম আর ছাড়লেন না, দুটো গরম গরম কথা শুনিয়ে বিদায় নিলেন।'

'বলেইছিলাম, মেয়েটার মেজাজ বড় কড়া। একবার তো আমার পোষা অ্যালসেশিয়ান ঘুঁচু এমনি এমনি, বুঝলে, মানে এমনি এমনি কামড়াবে বলে বা খেলবে বলে বুলুর দিকে দৌড়ে গেছিলো। না না, ঘুঁচু কামড়াতো না, ভারি সভ্যভব্য কুকুর ছিল কিনা! তা বুলু খুব কড়া করে ঘুঁচুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল, সেই থেকে ঘুঁচু বাইরেই বেরোতো না বুলুর গলার আওয়াজ শুনলে। তারপর?'

'তারপর? একমাস বাদে ফের সেই অ্যালার্ম!!!'

'এবার নিশ্চয়ই বুলু খুব কষে দিয়েছিল? ইশশ, বুলুকে দিয়েই এই রজতের বাচ্চাটাকে...'

'য্যাত্তারা, রজত আবার আপনার কি করলো?'

'না কিছু না। যা বলছিলে বলো'।

'এইবার বুলুম্যাম একা এসেছিলেন, সঙ্গে এক ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি। এসে দেখলেন যে ফের সেই একই কাণ্ড! তবে এইবার কিন্তু উনি কিচ্ছুটি বলেননি। হাসিমুখে সবার সঙ্গে কথা বললেন, অভিলাষের সঙ্গে তো চোখ চোখ রেখে সে কি হা হা হি হি। '

'বাহ বাহ, তাহলে তো হয়েই গেলো। তাহলে তারপরেই কি....'

'তারপরে আবার কি? পনেরো দিন বাদে ফের সেই একই কাণ্ড!'

'উরে বাবারে। এই নিয়ে কতবার হলো? চার? নাকি তিনবার, অ্যাঁ? বুলু এবারও কি..'

'না, এবারে ম্যাডাম একা নয়, টিম নিয়ে এসেছিলেন। ভেতরে গেলেন হাতেএকটা ট্যাব নিয়ে, কিসব দেখলেন। তারপর তো দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে সেকি হো হো করে হাসি!'

'তারপর কি? ইঁদুর নিশ্চয়ই, অ্যাঁ? তারাই নিশ্চয়ই তার কেটে দিচ্ছিলো বার বার? আরে আজকালকার ইঁদুরগুলো সব শালা হাড়হারামি। সে যাই হোক, তা ইয়ে, তারপরেই কি, মানে বলতে লজ্জা করছে যদিও, তারপরেই কি ওদের ব্যাপারটা...'

'তারপর বুলুম্যাডাম অভিলাষকে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে গেলেন।'

'অ্যাঁ? অ্যাঁ?? অ্যাঁ???'

'অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। সে এক বিশশাল কেলো কাণ্ড মশাই। থানা পুলিশ উকিল আদালত নিয়ে তো সে বিশাল হুজ্জোত।'

'উরেশাল্লা। এ তো বিশাল কেস ভায়া। তাই শুনছিলাম বটে, কি যেন একটা কেলেঙ্কারি আছে। তা কি কেস বাবা? পুরো ঘটনাটা কি খুলে বলতো, বেশ চনমনে ফীল কচ্ছি কিন্তু।'

'কি আর বলবো কাকু। বলতে লজ্জাও লাগে, হাসিও পায়। আমাদের অভিলাষ বাবু নাকি দ্বিতীয়বারের পর থেকে ইচ্ছে করে অ্যালার্মে কি সব করে রাখতেন, যাতে টাইম হলেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে আর আর সেই অজুহাতে ম্যাডামকে ডেকে আনা যায় !'

'কেন?'

'আহা, যদি ম্যাডামকে একটিবার চোখের দেখা দেখা যায়। এছাড়া আর উপায় কি?'

'খ্যাঁক খ্যাঁক খৌয়া খৌয়া...উফফফ মাইরি...সত্যি বলছো? আমাদের জামাই এরকম আতাক্যালানে নাকি? হো হো হো হা হা হাহা হা হি হি হি....উফফফ ওরে বাবারে, পেট ফেটে যাবে যে রে। ওরে বাবা রে, জল দে ভাই, উফফফ, ওহহ আহহহ। সত্যি বলছো তো ভাই? বানিয়ে বলছো না তো?'

' নিয্যস সত্যি কথা কাকা। তাই তো ম্যাডাম ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি নিয়ে এসেছিলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পিনহোল মোশন ক্যামেরা না কি ফিট করে গেছিলেন। পরের বার অ্যালার্ম বাজতেই ম্যাডাম তো সবার আগে গিয়ে ক্যামেরা চেক করেছেন, দেখেছেন যে আসল কালপ্রিট কে। ব্যাস, ক্যাচ কট কট। পুলিশকে

হয়রান করা, সরকারি কর্তব্যে বাধাদান, ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি, এইরকম পাক্কা একুশখানা না সাতচল্লিশ খানা ধারায় মামলা সাজিয়ে সোওজা লক আপ'।

'উফফ বাপ রে। বাপস রে....বলি থার্ড ডিগ্রি টিগ্রি দেয় নি তো? মেয়েটার মেজাজ বড়ই গরম, আর কথায় কথায় হাত চলে। একবার তো ওর ছোটবেলায় আমারদের ব্যানার্জিদা, বুঝলে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কি, ওর জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে ওকে একটু বেশি চটকে আদর করছিলেন। মেয়েটা একটা কাঁচি তুলে সটান ব্যানার্জিদার হাঁটুতে। সেই নিয়ে আরেক হুলুস্থুলু কাণ্ড। সেই থেকেই ব্যানার্জিদা খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এই তো সেদিনই বাজারে দেখা হলো, এখন অবশ্য অন্য পাড়ায় থাকেন।'

'তারপর আর কি। অলিভিয়া।'

'অ্যাঁ, ক্কি ক্কি কি করলো সে? তাকে ওই গুন্ডাটার সঙ্গে ইনভলভড হতে, এই ঝামেলা হুজ্জোতের মধ্যে যেতে কে বলেছিল? আনসার মি, হোয়াই?'

'যাহ, সে আমি কি করে বলবো? আমার ওপরে চেঁচাচ্ছেন কেন মশাই? আমি কি করলুম? এ তো মহা জ্বালা হলো। আর গেলেই বা, তাতে আপনার কি? আপনার তো আর কেউ হয় না।'

'হেঁ হেঁ, সরি সরি। আসলে বয়েস হয়েছে তো, মাঝেমধ্যে প্রেশারটা একটু... না না, সে আমার কেউ নয়, আমার মেয়ের নাম মান্তু। যাক গে যাক, তা সেই অলিভিয়া গিয়ে করলো কি?'

'কিছুই না। রজতের প্রেমে তো সে এক্কেবারে দিওয়ানা। একবার গিয়ে রজতের সঙ্গে দেখা করে, তারপর লক আপে অভিলাষের সঙ্গে, তারপর একবার ম্যাডামের সঙ্গে। আর ম্যাডামও বড় কড়া, ছোটবেলার বন্ধু বলে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ করলেন না, স্রেফ হাঁকিয়ে দিলেন, এমনও বললেন যে ফের অভিলাষের হয়ে তরফদারি করতে এলে ওকেই লকআপে রাখবেন!'

'অ্যাঁ? সে কি? কই, এসব তো আমাকে কেউ...উফফ বাপরে বাপ। বুলুর মেজাজ সেই ছোটবেলা থেকেই হেবি গরম, বুঝলেন? একবার কি হয়েছে...'

' আরে ধোর মশাই। রাখুন তো আপনার বুলুর ছোটবেলায় কি করেছে তার ব্যাখ্যান! বাঘা বাঘা উকিল নাকাল হয়ে যাচ্ছে অভিলাষের বেইল করাতে, আর আপনি.... আপনাদের সাধের বুলু যা একগাদা সাংঘাতিক দফা দিয়ে রেখেছিলো না! বোধহয় খুন, ধর্ষণ আর দেশদ্রোহ বাদ দিয়ে বাকই সবই ছিলো, তার ওপর সেই স্পাই ভিডিও। অর্ধেক উকিল তো শুনেই পিছিয়ে আসছিলো। জান কয়লা হয়ে গেছিলো মাইরি!'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! একদিন রজত ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে অলিভিয়াকে আদর করতে করতে...'

'অ্যাঁ ক্ককি ক্কি বললে? রজত ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে...'

'আরে আপনি কাকু এমন চমকে চমকে ওঠেন না, মাইরি, গল্প বলার ইয়েটাই চলে যায়। আরে ফাঁকা ফ্ল্যাটে বয়ফ্রেণ্ড তার গার্লফ্রেণ্ডকে আদর করবে নাতো কি কেনেথ অ্যারোর ইকনমিক্সের থিওরি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করবে? আর রজতের দুটো ফ্ল্যাট আছে শুধু এইসব করার জন্যেই। ওই দুটো ফ্ল্যাটে কত মেয়ের যে সর্বনাশ.....যাক গে সে কথা, তা অলিভিয়া তো আপনার কেউ নয় বললেন। আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন?'

'নাহ। আসলে শরীরটা আসলে একটু...বুঝলে ...মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেলো কিনা! তা বাপু একটু তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় না অ্যাঁ ? না, মানে পরের ঘরের এত কেচ্ছা শোনা কি ভালো? ইয়ে, এতে শরীর মনের ওপর একটা এফেক্ট পড়ে না?'

'দেখুন কাকু, আপনিই কিন্তু শুনতে চেয়েছিলেন, আমি কিন্তু বলতে চাইনি। যদি বলেন, তো এইখানে স্টপ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ'।

'আরে ন্না ন্না। হেঁ হেঁ, এমনি বল্লুম, তা বাদ দাও। তারপর কি হলো?'

'তারপর যা হলো কাকু, কি বলবো, যা হলো ভাবতেই পারবেন না। অলিভিয়া একদিন সোজা অভিলাষের মা বাবাকে নিয়ে বুলু ম্যাডামের বাড়ি!'

'অ্যাঁ? সে কি? মান....মানে ওই অলিভিয়ার এত্ত সাহস? তারপর, তারপর? মারকাট দাঙ্গাহাঙ্গামা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি, না? কিন্তু আমরা টের পেলুম না কেন বলতো? ইশ, হরিসাধন যদি একবার বলতো.. আমার দোনলাটা তো বাড়িতেই ছিল..ইশশ, আগে বললে পালিশ করে....

'ধ্যার মশাই। আপনি কি মিঠুন চক্কোত্তি মার্কা মারকাট ছাড়া কিচ্ছুটি বোঝেন না, অ্যাঁ? আরে সেইদিনই তো ওদের বিয়ের দিন ফিক্স হলো মশাই!'

' অ্যাঁ? অ্যাঁ?? অ্যাঁ??? '

'অ্যাঁ আবার কি কাকু, বলুন হ্যাঁ। সেইদিনই তো ডেট, ভেনু, মায় মেনু অবধি ঠিক হয়ে গেলো।'

'আর...আর... আর অমন মারকুট্টে মেয়েটা সেটা একবাক্যে মেনে নিলো?'

'কাকু, আপনি মাইরি এ লাইনে এক্কেবারে নভিস। ওসব স্বপন সাহা ছেড়ে প্রিটি উয়োম্যান বা নটিং হিল টাইপের সিনেমা দেখুন। বলি লভ ইজ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড ব্লাইণ্ড, এ কথাটা কি শোনেননি? আরে মশাই, হিন্দিতে বলতে গেলে আগ দোনো তরফ বরাব্বর লাগি থি। কিছু টেকনিক্যাল আইনি প্রবলেম ছিলই, বুলুরাণির কর্তব্যপরায়ণতার সাইড এফেক্ট। তা সেই অলিভিয়া আপনাদের বুলুর বাপিকে নিয়ে গিয়ে বুলুম্যাডামের বসকে গিয়ে বলতেই কেস খাপে খাপ..'

'পঞ্চুর বাপ?'

'একদম।'

'কিন্তু, ইয়ে সেই অলিভিয়া আর রজত তাদের কি হলো?'

'তাতে আপনার কি মশাই? তারা তো বোধহয় গতমাসে কালীঘাটে গোপনে বিয়েও করেছে। মেয়েটার বাবা নাকি হেব্বি খরুস মাল, তাই আর দেরি করেনি।। এই বুলুর বিয়েটা হয়ে গেলেই বাড়িতে...... এ কি, এ কি, ও কাকু, কি হলো? অমন এলিয়ে পড়লেন কেন? এই দ্যাখো, কি ঝামেলা...আরে উঠুন...কি বিপদ...এ তো মহা জ্বালা হলো।দেখছি...'।

'না বাবা থাক। কাউকে ডেকো না। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে বুইলে। হঠাৎ করে মাথাটা....ইয়ে, মানে তুমি ঠিক বলছো ওরা বিয়ে করেছে?'

'আলবাত। আরে বিয়ে না করে উপায় ছিল নাকি? অলিভিয়া যে দেড় মাসের প্রেগন্যান্ট! এরপরে তো আর না প্রকাশ করে উপায় নেই। আর ওদের কারোরই ইচ্ছা নয় অ্যাবর্শন করানোর। অলিভিয়ার তো শুনলুম খুব ইচ্ছে, ওর বাবা আর ওর বাচ্চাকে নিয়ে একসঙ্গে সেলফি তুলে ফেসবুকে স্টেটাস দেবে, 'হ্যাপি ফ্যামিলি, লভ উইনস ওভার প্রেজুডিসেস'.... আরে আরে...ফের কি হলো? ও মশাই? আবার এলিয়ে পড়লেন কেন? বলি আপনার বাড়ির কাউকে ডাকি? অসুস্থ বোধ হচ্ছে? বমি বমি পাচ্ছে? পটি পাচ্ছে? বাথরুমে যাবেন?'

'ঠিক আছি বাবা, ঠিক আছি, কিছুই হয়নি। শুধু প্রেশারটা একটু...'

'বলি ও জগবন্ধু, এখানে কি করছোটা কি বসে বসে? বলি বুলু কি একা আমার মেয়ে? তোমাদের মেয়ে নয়? তোমরা হলে গিয়ে পাড়াপড়শি, তোমরা এখানে বসলে কি করে চলবে ভাই? একটু গিয়ে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করো! তোমরা হলে গিয়ে আমার নিজের লোক...আরে দেখো দেখো, বাবাজীবনও এখানে যে। বলি এর সঙ্গেই আলাপ করছিলে বুঝি? তা ভালো, তা ভালো। বলি শুনেছো তো বাবাজীবনের কীর্তিকাহিনী? '

'ইয়ে, আমি চলি কাকু। অভিলাষ বোধহয় একা খুব বোর হচ্ছে।'

' আরে দাঁড়াও বাপু। ওহে জগবন্ধু, দেখে নাও হে, একেবারে মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র। মাধ্যমিকে ফোর্থ, উচ্চমাধ্যমিকে সেকেণ্ড। তারপর আই আই টি দিয়ে এখন... এখন যেন কোথায় লেকচারারশিপ

করছো বাবা? ম্যাসাচুসেটস না বোস্টন?'

'ইয়ে বোস্টন। আমি যাই কাকু, নিচে বোধহয় অভিলাষ খুব... '

' আরে জামাই এখন তার শালিদের নিয়ে বিজি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা। বলি হিরের টুকরো ছেলে হে জগবন্ধু। জগদীশচন্দ্র স্কলার, দেশ পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে কয়েকটা, আর তার ওপর ছেলে গিটারও বাজায় ভারি চমৎকার। সব মিলিয়ে হীরের টুকরো ছেলে হে। এমন ছেলের সঙ্গে আলাপ করাও গৌরবের কথা।'

'সে কি? তা ভায়া কিন্তু নিজে থেকে কিছুই জানায়নি! এতক্ষণ তো অনেক কথাই হলো... '

'বাহ বাহ, নামটা মনে রেখো জগ, এ ছেলে একদিন নোবেল পাবে। তুমিও বলতে পারবে যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রজতশুভ্র মণ্ডলকে তুমি ভালো করেই চেনো। এ কি? পালাচ্ছো কেন? ওকি, চললে কোথায়? ও বাবা রজত..বলি যাও কই? কথাটা শোনো...

মার্কেট ভিজিট ১১

ইয়ে, আমার সেই পুরোনো বসের কথা বোধহয় আপনাদের একবার বলিচি, না? সেই চে গ্যেভারার কেসটা নিয়ে?

অ্যাঁ? মনে পড়েচে বলচেন? বেশ বেশ।

তা ভদ্রলোক এমনি মানুষ হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। সৎ, সাহসী, পরোপকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। পুলিশগিরির বালাই ছিল না, আরা আমাকে যাকে বলে বেশ স্নেহই করতেন আর কি!

কিন্তু ইয়ে, মানে যাকে বলে বেসিক লেখাপড়ার যায়গাটা, বা টেকনোলজি বিষয়ে নুন্যতম ব্যবহারিক জ্ঞান বিষয়ে এনার জানকারি, তালিম ইত্যাদি ছিল শিউড়ে ওঠার মতন। দুএকটি উমদা এক্সপিরিয়েন্স রসিকজনের পদতলে নিবেদন কল্লুম, সামলেসুমলে রাখবেন মাইরি!

গপ্প একঃ সেবার অফিসে নতুন শ্রেডার এসেছে। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়া ম্যানেজারের দল মহা উৎসাহে প্রচুর কাগজপত্তর ফেলে কেমন কুচিকুচি হয় সেসব হাতেকলমে পরীক্ষা করছি। গভীর চিন্তাভাবনার পর সেই বছরের ইনক্রিমেন্ট লেটারটাও শ্রেডারে ফেলে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না এ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা চলছে, এমন সময় দেখলুম অফিসের বাইরে ক্যাব এসে দাঁড়ালো, বাবু সেখান থেকে নামলেন।

এইখানে বলে রাখি, ভদ্রলোক থাকতেন হায়দ্রাবাদে। ওনার পৃথিবী সামশাবাদে শুরু, নাচারামে শেষ। সেকেন্দ্রাবাদ ওনার কাছে স্বর্গ, হাইটেকসিটি পারিজাতবনশোভিনী নন্দনকানন, আর ওল্ড হায়দ্রাবাদ তো হুরপরী বিলোলিত, শরাবান তহুরা ছলাৎছলায়িত সাক্ষাৎ জন্নত এ ফিরদৌস! কথা হচ্ছে যে তাতে আপত্তি করার কিছু ছিল না। কিন্তু মুশকিল ছিল যে হায়দ্রাবাদের বাইরে সমস্ত দুনিয়া ওনার কাছে বিলকুল ফালতু যায়গা এবং বেশ উচ্চস্বরে সেসব মতামত প্রকাশে ওনার মধ্যে কোন বুর্জোয়াসুলভ দ্বিধা ছিল না। দিল্লি ওনার কাছে ''কামিনা''দের দের শহর, মুম্বাই নরকের আগের স্টেশন আর কলকাতা তো সাক্ষাৎ যমের দক্ষিণ দুয়ার! আমরা, মানে বাঙালিরা যে পবিত্র হায়দ্রাবাদ শহরে জন্মানোর সৌভাগ্য থেকে চিরবঞ্চিত, এ আক্ষেপে সদাসর্বদাই ওনার মনটা হুহু করতে থাকতো। আর এই পাপে পরিপূর্ণ নোংরা আমিষাশী শহরে চাকরি করিয়ে ওনার আয়ু থেকে কম করে দশটা বছর কেড়ে নেবার জন্যে হামেশাই উর্দতন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডুপাত করতেন।

ওনার জন্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ ইস্টে অ্যাড করে নিউ ইস্ট রিজিয়ন বানানো হয়েছিল। যাতে করে উনি মাসের মধ্যে দিন পনেরো কি কুড়ি হায়দ্রাবাদের বিশুদ্ধ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বেশ চনমনে ফীল করে উঠে ফের কষ্টকর বাকি দিনগুলো এই ছ্যাঁচড়া শহরে এসে দিনগত পাপক্ষয় করতে পারেন আর কি!!

যাগগে যাক, কি বলছিলুম যেন? হ্যাঁ, তা দেখলুম বাবু ক্যাব থেকে নামছেন, মানে এয়ারপোর্ট থেকে এলেন আর কি। যথারীতি বাকিরা ধাঁ। আমি দাঁত কেলিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো বলে ড্যেঁইরে রইলুম।

তিনি হন্তদন্ত হয়ে এলেন, ভেতরে ঢুকলেন। আমি হাত বাড়িয়ে গুড আফটারনুন জানালুম। তিনি শ্রেডারটি দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, ' ইয়ে কেয়া হ্যায় বেটা?'। আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বল্লুম 'স্যার, দিস ইজ আ শ্রেডার, আজ হি আয়া হ্যা'। উনি দেখলুম শোনামাত্র ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'ভ্যারি গুড বেটা, মুঝে আবভি চাহিয়ে থা ইয়ে', বলে ল্যাপটপ ব্যাগ থেকে দ্রুত একতাড়া কাগজ বের করে বলেন 'উসমে ডাল দেগা বেটা?'

আমি চিরকালই একটু বসঘেঁষা পাবলিক, মানে সেবাযত্ন করে যতটা নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া যায় আর কি! আমি তো শোনামাত্র ''আপ কে সেবা মে সদেব তৎপর'' টাইপের দ্রুততার সঙ্গে কাগজগুলো হাতে

নিয়ে যথাস্থানে গুঁজে দিলুম।

পুরো সেটটা শ্রেডারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবু ভারি তৃপ্তির মুখে বললেন, ' ইয়েক্সেলেন্ট বেটা, ইসকা দো দো কপি নিকালো, বহুত আর্জেন্ট লীগ্যাল ডকুমেন্ট হ্যায়'।

সেদিন আমার সামনে আয়না ছিল না, ফলে বলতে পারবো না আমার মুখমণ্ডলে এক্স্যাক্টলি কি এক্সপ্রেশন ফুটিয়াছিল!

গপ্প দুইঃ

চোদ্দই এপ্রিল, মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে বড়বাজারে হোলসেলারদের মধ্যে বিলিয়ে বেড়াচ্ছি, আর হাত কচলে দাঁতক্যালানে বাঞ্ছারাম হয়ে 'হেঁ হেঁ, শুবো নবোবসসো দাদা, পরের মাসের অর্ডারটা একটু দেখবেন ' বলে গেঁড়ে মদন টাইপের বিলক্ষণ ধান্দাবাজি চালিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে বাবুর ফোন, 'বেটা মেরা উইন্ডোজ নট ওপেনিং '।

মুখে দিয়ে আট্টু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল 'ধুসসালা, তাতে আমি কি করবো, আমি কি দরজা জানলার মিস্তিরি, অ্যাঁ?' কিন্তু হাজার হোক, বস। বললুম 'একটু কোশিশ করকে দেখিয়ে, খুল যায়েগা, একটু ধাক্কাধাক্কি করনে সে কভি কভি খুল যাতা হ্যায়'। খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসার পর ফের সেই কাতরোক্তি 'ফিরভি নেহি খুল রহা হ্যায় বেটা '। মিষ্টি করে বল্লুম ' অফিসে যে ছোকরা গুলো চায়ে দেতা হ্যায় উয়ো অলপ্পেয়ে মিনসেগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাট রাহা হ্যায়? প্রশান্ত, যতীন ইন লোগো কো ডাকিয়ে। দরকার হোগা তো উইন্ডোর ফ্রেম অব্ধি খুলকে লায়ে গা'। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'নেহি বেটা, উনলোগ সে নেহি হোগা, তুম জলদি অফিস আ যাও'!

আমি তো মাইরি, সংস্কৃতে যাকে বলে, স্তম্ভিত!! মার্কেট ছেড়ে এখন এই জন্যে অফিস যেতে হবে? জয়েনিং লেটারে ''দরকারে বসের কেবিনের দরজাজানালা সারাইতে হইবেক'' টাইপের কিছু ক্লজ ছিল কি না খুব মন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করতে করতে বল্লুম ' থোড়াসা তেল ডালকে রাখিয়ে, লুজ হো যায়েগা। ম্যায় আভি আ রাহা হুঁ'। ওপার থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবু বললেন, 'জলদি আ যাও বেটা'।

আমি আমার সেলস অফিসার সুজয়কে বাকিটা বুঝিয়ে দিয়ে পোস্তার দিকে ''হাডা'' মাল্লুম। ডেরাইভারকে বলে, গাড়িটা একটু এগিয়ে এনে প্রায় দৌড়ে সিটে বসেই আবার ফোনালুম, 'বস, কিছু হুয়া তেল ডালনে সে?'

ওপাশ থেকে হাউহাউ আর্তনাদ ভেসে এলো, 'নেহি বেটা, আভি তো ল্যাপটপ ইজ অলসো নট ওপেনিং '!

কিপটে

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই একটু ফিক করে হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ সান্যাল।

সকালটা ভারী চমৎকার আজকে। ঝিরিঝিরি প্রসন্ন বাতাস বইছে চারিপাশে। পোষা নেড়ি মিষ্টি দরজার কাছে ভারি মনোরম ভাবে শুয়ে। নরম মিঠে রোদ চারিপাশে মিহি গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

ভারী অলস ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙলেন প্রিয়নাথ, সংগে একটা খুব তৃপ্তির হাই।

কাল খুব জোর বাঁচা গেছেন উনি। প্রায় সারাদিন ধরে ছোটবোন সুবর্ণা এসে হাতে পায়ে ধরে সে কি কান্নাকাটি। কি না, ওর একমাত্তর ছেলে, শিবরাত্তিরের সলতে, তার কিডনি পাল্টানো হবে, আর তার জন্যে লাখ চারেক টাকা চাই।

শুনেই তো প্রিয়নাথের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। একটা দুটো টাকা নয়, চার চার লাখ? বলি চারের পর কতগুলো শূন্য হয় কোন আন্দাজ আছে তোর?

এই যে তুই কারুক্কে না বলে বেজাতের ওই ছোকরা মাস্টার কে বিয়ে করে ভাগলবা হলি, এতো বড় কেলেঙ্কারি বাপ মায়ের মাথায় চাপিয়ে, বলি আমার ভরসায় করেছিলি? আর সে বাবুও যে স্কুলে টুকলি আটকাতে গিয়ে পটলোত্তলন করলো বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই সেটা কি আমার সংগে কন্সাল্ট করে করেছিল নাকি র‍্যা? এখন যদি দুদিনের মধ্যে অপারেশন না করলে ছোকরা ফুড়ুৎ হয়, তবে সেটা কোন আইনে আমার দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় শুনি?

ভাবতেই গা টা রি রি করে ওঠে প্রিয়নাথের। চাআআআর লাআআআখ টাকা! মামদোবাজি, নাকি? নাকি উনি কি দানছত্তর খুলে বসেছেন ? বলি সবাই ভেবেছেটা কি অ্যাঁ? হুঁঃ, কার কোথায় কে ছেলে মরছে, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার পড়াশুনা হচ্ছে না, কোন ভিখিরির ছেলের ক্যান্সার, সবার জন্যেই শালা ওনার পেছন খুলে দিতে হবে নাকি,যত্তসব।

শেষে সুবর্ণা মাথা নিচু করে জলভরা চোখে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন প্রিয়নাথ। উফফ, কি কষ্টেই টাকাগুলো বাঁচাতে পেরেছেন উনি। আজ বড় সুখের সকাল!

আনন্দে একটু ফিক করে হেসেই ফেললেন এলাকার ডাকসাইটে কিপটে প্রিয়নাথ সান্যাল। অবশ্য উনি নিজেকে কিপটে বলেন না, বলেন হিসেবী। বছর পাঁচেক বাদে বাদে হাওড়ার মঙ্গলা হাট থেকে জামাকাপড় হিসেব করেই কেনেন,সুবিধা এই যে প্যান্ট, বিছানার চাদর আর দরজার পর্দা একইসঙ্গে হয়ে যায়। তবে খাওয়ার শখটা পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছেন উনি, সে স্বীকার করতে ওনার সমালোচকরা বাধ্য, মাছ তো দুহপ্তায় একদিন খাওয়া হয়ই। উনিশ ''বছর আগে কেনা সেকেন্ড হ্যান্ডে কেনা টিভিটার অবস্থা যদিও কহতব্য নয়, ক্যাটরিনা ক্যাইফ কে গোবিন্দার মতন দেখায়, হাশিম আমলাকে উসেইন বোল্ট। তবে ঘোরাঘুরি কিন্তু লেগেই আছে। এই তো বছর পাঁচেক আগে মন উচাটন হওয়াতে ডানলপ থেকে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেছিলেন,পুরো তিরিশ টাকা খরচা করে! সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে? আরো যদি ওঁর বাড়িতে অন্ধকার থাকা নিয়ে কথা ওঠেই, তবে জেনে রাখা ভালো যে ইলেক্ট্রিক আলোতে ওনার মাথা ধরে, খুব দরকার ছাড়া আলো জ্বালান না, মোদ্দা কথা অকারণে কাউকে হতচ্ছেদ্দা করাটা ঠিক না। রাতের দিকটা আলো বলতে মোমবাতিই ভরসা বটে, তবে তাতে আরেকটা সুবিধা যে রাত্তিরে আলো আঁধারিতে শুধু গামছা পড়ে থাকলেই চলে। আর দাড়ি কামানোর পর বুরুশের সাবান ফেনা দিয়ে যদি উনি স্নান করেনই, তাতে কার কি হে? হপ্তায় একদিন সাবান আর শ্যাম্পু না করলে কি মান থাকে রে ভাই? এক খরচায় তিনটে কাজই হয়ে যায়, দাড়ি, শ্যাম্পু আর সাবান, হপ্তায় একদিন।

এই এতো এতো খরচাপাতির পর যদি কেউ বেমক্কা চাআআআর লাখ টাকা চেয়ে বসে, কার মাথা ঠিক থাকে দাদা, আপনিই বলুন?

উফফ, পরশুই ব্যাংকে গিয়ে দেখে এসেছেন মাত্তর সাতানব্বই লাখের মতন জমেছে,গরীবের বুকের রক্ত জল করে জমানো খুদকুঁড়ো বললেই চলে, তার থেকে বুকের পাঁজর খসানো চার চারটে লাখ টাকা, মা গো, স্রেফ দান করে দেওয়া?

মা ত্তারা ব্রহ্মময়ী, মা গো, তুমিই বাঁচিয়েছ মা!

চোখ বুজে হাত জোড় করে একটা প্রণামই ঠুকে দিলেন প্রিয়নাথ। তারপর চোখ খুলেই হাঁ।

ঠিক ওনার সামনে চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ফর্সা গায়ের রঙ, কেঁকড়ানো চুল, রোগা দোহারা শরীর। ভারি মিষ্টি দেখতে। চোখে একটু দুষ্টুদুষ্টু ভাব, নিখুঁত করে কামানো গোঁফদাড়ি। চোখাচোখি হতেই একগাল হেসে হাত তুলে নমস্কার করলেন ভদ্রলোক, 'গুড মর্নিং প্রিয়নাথ বাবু। কেমন আছেন?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মিনিট তিনেক হাঁ করে ছিলেন প্রিয়নাথ, পরে খেয়াল হতে সন্তর্পণে মুখটা বুজিয়ে নেন, স্খলিত ন্ট্রে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কে মশাই? ঘরে ঢুকলেন কি করে?'

একটু অপ্রস্তুত হলেন বোধহয় ভদ্রলোক। গলা খাঁকড়ে বলেন 'ইয়ে হঠাৎ এইভাবে এসে পরেছি বলে সরি স্যার। কিন্তু না এসে উপায়ান্তর ছিলো না বলেই, মানে খুব বাধ্য হয়েই আর কি, হেঁ হেঁ'।

'হেঁ হেঁ মানে? বলি এটা কি মশাই ধর্মশালা না আপনার তালুইমশাইএর বৈঠকখানা? কোন আক্কেলে আমার বেডরুমে ঢুকে পড়লেন মসাই? চুরি ডাকাতির মতলব নাকি?'

'অ্যাঁ? আরে ছিছিছি....রামো রামো, কি বলছেন মশাই? একটু না বাড়িতে ঢুকেই পড়েছি, তাবলে একেবারে চোর জোচ্চর ভেবে বসলেন? বলি ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই একটা আমার?'

'ইঃ, ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এয়েচেন রে। এই সাতসকালে চুপিসাড়ে টুকটুক করে আমার বেডরুমে ঢুকে পড়ার মানেটা কি অ্যাঁ? পুলিশ ডাকবো নাকি দাদা?'

ভদ্রলোক পুরো কেতরে উঠলেন ' প্লিজ পুলিশ ডাকবেন না, কিছুতেই না, ন্না ন্না ন্না'।

খুবই সতর্ক হলেন প্রিয়নাথ। রোগাভোগা শরীর, ঝাঁপিয়ে পড়লে মনে হয় কবজা করতে বেশি অসুবিধা হবে না। বন্দুক ফন্দুক নিয়ে আসে নি তো আবার? মাওবাদী কি সন্ত্রাসবাদী নয় তো? ওদের নাকি অসাধ্য কিছু নেই, যেখানে পারছে ঢুকে বন্দুকফন্দুক চালিয়ে, খুনখারাপি করে, সে একাকার কাণ্ড...

গলা খাঁকড়ে নেন উনি, সন্দেহজনক কারও সামনে যে বসে আছেন সে নিয়ে কোন সন্দেহই নেই, মাওবাদীও হতে পারে, বা পাকিস্তানের এজেন্ট। ছদ্মবেশী বারাক ওবামা হলেই বা আটকাচ্ছে কে? খুবই সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করেন,' ঝেড়ে কাসুন তো মশাই। বলি মতলবটা কি? আমার বাড়িতে কিন্তু একটা ফুটো কড়িও পাবেন না, আগে ভাগে বলে রাখলুম। বরং একটা ছেঁড়া গামছা আছে, সতের বছরের আগে কিনেছিলুম, অ্যান্টিক হিসেবে ভ্যালু কম নয়, সেইটে দিতে পারি, নিয়ে মানে মানে বিদায় হন দিকিন'।

ভদ্রলোক একবারে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'আরে ন্না ন্না, ছি ছি, আমাকে ইয়ে ভেবেছেন নাকি? ছ্যা ছ্যা' তারপর ঘাড়নাড়া থামিয়ে খুবই লজ্জিত ভাবে মাথা নিচু করে নখ খুঁটতে থাকেন ও ভারি মৃদুস্বরে বলেন ' দেখুন ব্যাপারটা বলতে আমার খারাপই লাগছে, কিন্তু কি করি বলুন তো, এদিকে না বললেই নয়। আপনি কিন্তু স্যর কথা দিন কিছু মাইন্ড করবেন না প্লিজ'।

'দেকুন ন্যাকা মেনিমুখো ম্যাদামারা লোকজন আমার মোটে পচ্ছন্দ নয়। বাঙালি কবিদের এইরকম অম্বলে ভোগা পেটরোগা ম্যাদামারা ন্যাকাপনা থাকে। তা মশাই কি কবি নাকি?'

'আরে ধুর। লজ্জা দেবেন না। সে বলতে গেলে একবার দুবার ছোটবেলায় লিখেছিলাম বটে, শুনবেন নাকি দুটো লাইন?'

এই বলেই ভদ্রলোক উদাস ভঙ্গিমায় খুবই দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতে থাকেন, বেশ হাত পা খেলিয়ে, পয়ার ছন্দে,

'পাতায় পাতায় ঝড়ে নিশার শিশির/ তাতে কি বা যায় আসে আমার পিসির।

স্কুলে যেতে ভয় করে শীত ও সামার/ সুযোগ পেলেই যাই বাড়িতে মামার।

(সেথা) আচার পাহারা দেয় রামন মিশির/

নিশীথে বানানো আচার আমার পিসির।'

কি ভাব! কি ভাষা!! খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন প্রিয়নাথ, চোখে জল। তারপর লুঙ্গির খুঁট তুলে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন ' আহা, আহা, বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠলো। মশাই যে বেশ নামজাদা কেউকেটা একজন তা পষ্ট বুজতে পারচি। সেই মাইকেল কি নবীন সেন, তারপর এই আপনি। বলি পরের বছরকার নোবেলের দিকে তাগ করচেন নাকি? জমিয়ে করুন দিকিন, দেখবেন যেন ফস্কে না যায়, হেঁ হেঁ। তা এমন গণ্যমান্য ব্যাক্তিটি সক্কাল সক্কাল আমার কাচে যে? আর তাছাড়া মহাশয়ের নামখানি যে বলতে হচ্চে যে এবার। কি করা হয় মহাশয়ের? থাকেন কোথায়? জোড়াসাঁকোর দিকে নয় তো? হ্যা হ্যা হ্যা'।

'ইয়ে, আমি একজন লোকপাল স্যার। সাউথ থেকে আসছি'

'লোকপাল?মানে লোকপাল বিল? সে কি পার্লানেন্টে পাস হয়েচে নাকি? যাঃ জানতে পারলুন না যে? টিভিটাও মাইরি.... খবর শোনাচ্ছে না অর্শের বিজ্ঞাপন, বোঝাই যায় না। আর সাউথ থেকে মানে? গড়িয়া না ব্যায়লা?'

'আরে না না সাউথ, মানে একদম সাউথ'

'সে কি? এমন চমৎকার ঝরঝরে মিঠে শান্তিপুরী বাঙলা বলছেন যে?'

'আরে লজ্জা দেবেন না স্যার, আমি এমনিতেও খুবই লাজুক মানুষ, হেঁ হেঁ।'

'বাঃ বাঃ। আই অ্যাম ভেরি ইম্প্রেসড ইয়াং ম্যান। এই বয়েসেই অত ওপরে উঠেচ, পার্লামেন্টারি ব্যাপারে আচো, অন্য ভাষাও এত চমৎকার বলচ, অথচ এত বিনয়। গুড গুড, এই দ্যাকো, আবার তুমি বলে ফেল্লুম। কিচু মনে কোর না বাপু, বয়সে ছোটই হবে আমার থেকে, কি বল?'

'আরে সে তো বটেই, সে তো বটেই, হেঁ হেঁ।'

'তা বাপু নাম গোত্তর কিচু বল। আমরাও ভারি সাউথ ইন্ডিয়ানদের ইয়ে করি, বুজলে। কি কালচারাল ইয়ে, আর কি ফটাফট ইংরেজি, আদ্দেক তো বুজতেই পারি না, হেঁ হেঁ। এই তো পাশের ফ্ল্যাটে রঙ্গনাথনদা থাকেন। ভারি মাই ডিয়ার লোক। এই তো ইচ্ছে আছে এই ডিসেম্বরেই একবার ওদিকে..'

'আজ্ঞে আমার নাম কৃতান্তকুমার আদিত্য', ভারি বিনয় সহকারে বলেন ভদ্রলোকটি।

'বাহ বাহ। একটু সেকেলে বটে, তবে কিনা চমৎকার। বুঝলে বাবা, আমরা তো পুরোন যুগের লোক, আমাদের এই রকম নামই পচুন্দ। বাহ বাহ। তা আমাদের ইস্কুলে পড়াতেন অরূপ আদিত্য, হাওড়ার প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়, তা তেনার কেউ হও নাকি? না বলচ? তা বেস। তা বাবাজীবন এয়েচ কি করতে সেটা তো খোলসা করে বলতে হচ্চে এবার।'

একটু গলাটা খাঁকড়ে নেন কৃতান্তবাবু, তারপর খুবই মিষ্টি হাসিমুখে বলেন 'এবার একটু উঠতে হচ্ছে যে স্যার। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

মুহূর্তে চনমনে হয়ে ওঠেন প্রিয়নাথ। নেমন্তন্ন নাকি? অথবা কাঙালিভোজন? নাকি হরিসংকীর্তন? নাকি কোন সভাসমিতি? ও হো, এ সেই 'নিখিল বংগ কৃপণচূড়ামণি সমিতি'র সংবর্ধনা নয় তো?

যাক, একবেলার খাবার খরচটা বেঁচে যাচ্ছে তাহলে!! যদিও মুখে একটু বিব্রতভাব বজায় রাখেন,

'সে কি? কোতায়? এই সক্কাল সক্কাল? ধুর বাপু হুট করলেই যাওয়া যায় নাকি? বলি একটা সময় বলে তো বস্তু আচে না কি? আমার যে আরও দশটা কাজ আচে বলি সে কথাটাও তো ভাবতে লাগে?'

'ইয়ে, বলছিলাম কি স্যর, এইটাই আপনার সময় ঠিক হয়েছে। একটু কষ্ট করে গা তুলতে হচ্ছে যে স্যর।'

'মানে, এসব কি ভাই? না গেলে কি করবে?' একটু ঘাবড়েই যান প্রিয়নাথ।

'না গিয়ে আপনার একদম উপায় নেই স্যর। সত্যি বলছি।' কথাগুলো কাতর অনুনয়ের মতই শোনায়।

'দ্যাখো বাপু, ইয়ে জ্বালিও না বেশি। আমি তোমাকে ইনভাইট করে আনিনি একটুও। তুমি এখন যেতে পারো। দুগগা দুগগা।' বিরক্তিসহকারেই বলেন প্রিয়নাথবাবু।

একটু ম্লান হাসেন আগন্তুক, 'আমাকে কেউ ইনভাইট করে না স্যর। আমি বিনা ইনভিটেশনেই আসি। এসে বরং আমিই ইনভাইট করি'।

প্রিয়নাথ এতক্ষণ যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছিলেন। শেষ কথাটা শুনে ধন্দে পড়ে গেলেন। ছোকরা চায় কি?

'তোমার কতা কিচুই বুঝছি না হে?'

'কেন? এই সহজ জলবত্তরং কথাটা পাকা মাথায় খেলছে কেন বলুন তো? '

খানিকক্ষণ ভ্রুকুটিকুটিল চোখে চেয়ে রইলেন প্রিয়নাথ। সকাল সকাল মশকরা ওনার মোটে পছন্দ না। কিন্তু কি একটা কথা মনের ওপর ঘাই মেরে উঠতে চাইছে, উনি ধরি ধরি করেও ধরতে পারছেন না।

তরিৎগতিতে সোজা হয়ে উঠে বসলেন উনি, 'নামটা কি বললে আরেকবার বলতো বাপু'।

বিনয়ে প্রায় ঘাড় বেঁকে গেলো ভদ্রলোকের, 'আজ্ঞে, কৃতান্তকুমার আদিত্য। ডাকনাম একটা আছে অবশ্য, তবে কিনা এই নামটাই ভেবেচিন্তে...... '

থরহরি কেঁপে উঠলেন প্রিয়নাথ,

'আ আ আ আপনি মানে.. আ আ আপনি '

'এই দ্যাখো, আবার আপনি আজ্ঞে কেন? তুমিটাই তো দিব্যি মিষ্টি শোনাচ্ছিল'।

'প্রভু, প্রভু, কি সৌভাগ্য। আপনি...

'সে কি স্যর, সৌভাগ্য কি বলছেন? আমাকে দেখলেই তো বেশিরভাগ লোক কেঁ কেঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায়। আপনার কিন্তু স্যর, সাহস হ্যাজ, মানতেই হবে। এখনো টসকান নি, এ বড় সহজ কথা নয় কিন্তু। মাইরি বলছি'।

প্রিয়নাথ সোজা বুটপদ্মে উপুড় হয়ে পড়েন, 'দয়া প্রভু, দয়া করুন।'

'এই দ্যাখো। দয়া করার আমি কে? আর দয়া করার আছে টাই বা কি?' প্রিয়নাথ কে ধরে সস্নেহে বিছানায় বসিয়ে দেন উনি 'ইউ হ্যাড আ লং ফুলফিলিং লাইফ। এখন দিব্যি হাসতে হাসতে আপনার তো টা টা বাই বাই করার কথা। নিন, ঝটপট রেডি হয়ে পড়ুন তো'।

ককিয়ে ওঠেন প্রিয়নাথ, 'ফুলফিলিং লাইফ? কি বলছেন প্রভু? সারা জীবন ভালো খাইনি, পড়িনি। কোত্থাও ঘুরতে যাইনি, আনন্দ করিনি। কিসের ফুলফিলিং লাইফ প্রভু ?'

ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালেন আগন্তুক,শিকনিটা জামার হাতায় মুছে ফেলেন, 'তা সেগুলো করতে কি কেউ বারণ করেছিল স্যার? কি বলি বলুন তো? ইচ্ছে কি আমারই করে স্যর এইসব করতে। কিন্তু ডায়রি তে যে লেখা আজই আপনার দিন। অর্ডার এসে গেছে স্যর। নিন উঠে পড়ুন। মন দুর্বল করে ফেলাটা কোন কাজের কথা নয়। ওতে শ্লেষ্মা, পিত্তবিকার, উদুরি, অম্লশূল, এসবের ঝামেলা থাকে। রেডি হয়ে নিন স্যর। চুলটা আঁচড়ে নেবেন নাকি? নাকি থাক? বেশ একটা ক্যাজুয়াল বিউটি হাবভাব নিয়েই যাবেন? তাহলে তাই চলুন স্যর,এগোন যাক? '

'কোন চান্স নেই প্রভু? কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না?'

'কি যে বলেন। এ কি রাজধানী এক্সপ্রেসের রিজার্ভেশন নাকি, যে মিনিস্টার কোটায় একটা ব্যবস্থা করে দেবো?'

'কিছু একটা করুন স্যর। এতদিন ধরে এত্ত কষ্ট করলাম, কিচ্ছু ভোগ করতে পারবো না?'

'উমম, না ই তো মনে হচ্ছে'।

'ইয়ে, প্রভু, শুনুন না। বলি সাতানব্বইয়ের হাফ কত হয়।'

'এইটে কি অংক কষার সময় স্যার? ক্যালকুলেটরটাও হারামজাদা চিতু ঝেঁপে দিয়েছে লাস্ট উইক, কিন্তু জেনে হবেটাই বা কি?'

'আমি বলছি প্রভু, উনপঞ্চাশের একটু কম। ওই পুরোপুরি উনপঞ্চাশই ধরুননা।'

'ধরলুম। তো? '

'বলছি কি, পুরো উনপঞ্চাশই, না পাকাপাকি পঞ্চাশই আপনার প্রভু। কড়কড়ে হার্ড ক্যাশ, আধঘণ্টার মধ্যে গরমাগরম... খিড়কি দরজা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ুন, কেউ জানবেও না যে আপনি এসেছিলেন। প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখবেন একটু'।

যমরাজ পাক্কা এক মিনিটের জন্যে বিঘতখানেক হাঁ করে চেয়ে রইলেন, তারপর কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছে হাঁ টা বুজিয়ে স্খলিতস্বরে বললেন, 'আপনি কি আমাকে ঘুষ দিচ্ছেন নাকি স্যর?'

'আ হা হা, ঘুষ কেন হবে? প্রণামী বলুন স্যর। এই যে ঠাকুর দেবতা দেখলেই আট আনা এক টাকা করে দানবক্সে ফেলতুম, সে কি ঘুষ প্রভু? এইটে বরং আপনাকে সরাসরি দিচ্ছি। আপনিও হ্যাপি, আমিও হ্যাপি।'

উদাস হয়ে পড়েন যমরাজ 'কি আর বলবো স্যর। আপনি বোধহয় এখনো আমাদের অপারেটিং মডেলটা বুঝে উঠতে পারেন নি। আমাদের ওদিকে ভিজিলেন্সও যেমন হারামি, অডিটও তেমনই ত্যাঁদড়। আমারই কি ইচ্ছে করে না একটু ভালোমন্দ খেয়ে পড়ে থাকতে?' ধরে আসা গলাটা খাঁকড়ে পরিষ্কার করে নেন যমরাজ, ' আপনি বরং উঠুন স্যর, আমার আরো দুটো কাজ আছে আজ, ইশশ, বড্ড লেট হয়ে গেলাম।'

'প্রভু প্রভু, জাস্ট একটি বছর'

'উঁহু'

'একটা মাস অন্তত দিন'।

'নাঃ'

' এক সপ্তাহ?'

'স্যর, এ কি কোলাঘাটের ইলিশ?'

'লাস্ট প্রভু, একটা দিন, জাস্ট একটা দিন, তারপর হাসি মুখে'

'বেকার সময় নষ্ট করছেন স্যর। চটি পরেই যাবেন বলছেন? চলুন তাহলে, দুগগা দুগগা।'

'একটা মিনিট প্রভু, প্লিজ প্লিজ'।

'উফফ, বড্ড জ্বালান মশাই। নিন উঠুন', এই বলে যমরাজ একটা হাত দিয়ে ওনার ঘাড়ে ধরতেই জ্ঞান হারালেন প্রিয়নাথ বাবু।

****

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন প্রিয়নাথ। সকালে তীব্র আলোয় চোখটা কুঁচকে গেলো। সারা গা ঘামে ভিজে জবজব করছে।

স্থির হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

স্বপ্নটা যদি সত্যিই হত? সত্যিকারের সত্যি হত? সত্যিই যদি কোনমুহুর্তে ডাক এসে যায় বিনা নোটিশে একদিন, তখন কি করবেন প্রিয়নাথ এই ঐশ্বর্য নিয়ে?

আর যার নোটিশ এসে গেছে আগে থেকে? ঢাক ঢোল বাজিয়ে? এবং যে নোটিশ ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রিয়নাথ রাখেন, তার বেলা?

মনে হল কেউ যেন জীবনের দাবাখেলায় একটা কিস্তিমাতের চাল চেলে দিয়ে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছে প্রিয়নাথের হাবভাব, ঠোঁটের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি ঝুলিয়ে, যেন জিজ্ঞাসা করছে, ''এবার কি করবে প্রিয়নাথ, এবার?''

উঠে দ্রুত নিজের আলমারি হাঁটকাতে থাকেন উনি,আহ চেকবইটা কোথায় গেলো?

কোথায় যেন ভর্তি আছে সুবর্নার ছেলে? আহ,নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। এখানেই কাগজের টুকরোটা রেখেছিলেন না?

পাগলের মতন সবকিছু ওলটপালট করে খুঁজতে থাকেন প্রিয়নাথ। দাবার চালটাকে পালটা ফিরিয়ে দেওয়া খুব জরুরি।

এক্ষুণি।।

মার্কেট ভিজিট ১২

'আগেই বুঝেছি, তুই এদিককার নোস। নেহাত ভেঁদড় না হলে কেউ মিষ্টি দিয়ে ভাত খাওয়া শুরু করে না। ওটা চপ নয় স্টুপিড, ওটা নারকেল আর গুড়ের মিষ্টি, ওটাকে বলে ওবাট্টু। আরে আরে আরে,ওটা কি দিয়ে ভাত মাখছিস? আরে ওটা ডাল নয় রে বোকা, স্যুপ, ওটাকে বলে উলাভা চারু.....'

কিছু কি বুঝলেন? তা খুবই যে ধন্দে পড়েছেন বুঝেছি, আমি নিজেও বেদম বুঝভুম্বুল হয়ে পড়েছিলুম কি না...

আমরা যারা গাঙ্গেয় অববাহিকার উর্বরতা দেখে মাটির সাত আঙ্গুল উপর দিয়ে হাঁটি, গব্বে মাটিতে পা পড়ে না, তাদের একবার ইস্ট গোদাবরী জেলাটা দেখে যাওয়া উচিৎ।

যেদিকে তাকান বনানী আর গাঢ় সবুজের সমাহার। এসেছিও অবশ্য যাকে বলে বর্ষার মাঝামাঝি। সুন্দর ফসল খেলানো ক্ষেত, সদ্য গর্ভবতী শস্যচারারা একে অন্যের গায়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে প্রগলভ গ্রাম্য যুবতীদের মতো, গোদাবরী আর কৃষ্ণা থেকে কেটে আনা ক্যানালের টইটম্বুর জলে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ছোট্ট গ্রামদেবতার মন্দিরের ছায়াটি,সব মিলিয়ে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় টাইপ কেস। তার ওপরে অন্ধ্রপ্রদেশে ব্লেণ্ডার্স প্রাইডের রেট মুম্বাইয়ের থেকে বেশ খানিকটা সস্তা। ফলে দিব্য আনন্দে আছি...

অ্যাঁ? এখনও বুঝলেন নি? ওহো, দুঃখিত, আমারই যাকে বলে গলতি সে মিসটেক হো গ্যায়া।

দিব্যি মুম্বাইতে বসে খাচ্ছিলাম আর বগল বাজাচ্ছিলাম। টাটা কম্পানি ভারি ভালো কম্পানি, সেই টেনিদার সিটি কলেজের মতই, হেব্বি ছুটি দেয়। সেবারও পার্সি ইতুপুজো না ইরানী পুণ্যিপুকুর এই উপলক্ষ্যে পরপর একগাদা ছুটি ছিল। আম্মো ভালোমানুষের মতন বন্ধুবান্ধবী,তদভাবে বন্ধুদের বান্ধবীদের নিয়ে লোনাভালা ঘুরে আসাটা চিত্ত ও চরিত্রের পক্ষে সুসভ্য হবে কি না এমন গভীর ভাবনায়, অফিসে বসেই চোখটোখ বুঝে যাকে বলে নিমজ্জমান, এমন সময়ে কাঁধে একটা টোকা পেয়েই 'তিন কত্তি তিন' আউড়ে ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি, বস!!!

তিনি ভারি গম্ভীর মুখে সমাজ ও জাতির অবনতি, অর্থনীতির দুরবস্থা ও সর্বব্যাপী রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, তদুপরি যুবসমাজের সার্বিক অবক্ষয় নিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ সমাপান্তে বললেন যে নেক্সট দুই সপ্তাহ কোস্টাল অন্ধ্র, অর্থাৎ অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান শহরগুলি ঘুরে আসাটা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক বলে হায়ার ম্যানেজমেন্টের দৃঢ়বিশ্বাস। দায়িত্বটা ওনাকেই দেয়া হয়েছিল, তবে কিনা উনিও চান সে সৌভাগ্যসিন্নির ছিটেফেঁটা আমাদের কপালেও জুটুক, ওনার মনটা যে সদা সর্বদাই আমাদের কল্যাণের জন্যে হুহু করতে থাকে সে কি আমরা ফিল করি না? ইত্যাদি প্রভৃতি...

ফলে আর কি,চোদ্দ দিনের লম্বা ট্যুরে বডি ফেলেছি এই এলাকায়। বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর, তেনালি হয়ে সেই বিশাখাপত্তনম আর বিজয়নগর, ফের ফিরতি পথে বিশাখাপত্তনম থেকে বিজয়ওয়াড়া হয়ে হায়দ্রাবাদ, সেখান থেকে দুগগা দুগগা করে ঘরের ছেলে ঘরে, মুম্বাইতে।

তা সেই লম্বা ট্যুরসংগ্রামে আপাতত ডেরাডাণ্ডা রাজামুন্দ্রিতে। গোদাবরীর অববাহিকাতে শুয়ে থাকা নিশ্চিন্ত জনপদ, স্থানীয় শস্যের বড় আড়তও বটে। জীবন এখানে হায়দ্রাবাদ বা অন্য মেট্রোর তুলনায় অতি ধীর ও শান্ত। অত্যন্ত সম্পন্ন মফস্বল শহর, অধিবাসীদের চেহারায় একটা সুখসমৃদ্ধির তৃপ্ত ছাপ। রাস্তার কুকুর আর ছাগলগুলো অবধি দেখলুম বেশ মোটাসোটা নধর চেহারা।

তা সেখানে দিনভর চললো উস্তমকুস্তম ধরণের মার্কেট ভিজিট। স্থানীয় সেলস অফিসারটিকে বোকাসোকা দেখে সুযোগ বুঝে একটু এক্সট্রা টার্গেট কমিট করিয়ে নিয়ে বেশ তুরীয়ানন্দ লাভ করেছি, এমন সময় দুপুর

দুটো নাগাদ সে ছোকরা রীতিমতো বেজার মুখেই, (এক্সট্রা টার্গেটের দুঃখে কি না খোদায় মালুম) আমাকে বললে 'স্যার, হোয়ের ডিনার ইউ হ্যাভ টু ওয়ান্ট?'.

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসার কিছু হয়নি, এর থেকেও বাজে ইংরাজি আমরা বাঙালিরাই বলি, এর থেকেও জঘন্যতর উচ্চারণে। আর আমি সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে মার্কেট ভিজিট করতে করতে বিভিন্নস্থানে ইংরেজি ভাষার যা শিহরণ জাগানো বিবিধরূপ বস্ত্রহরণ হতে দেখেছি, তাতে আমি অলরেডি একজন ভাষানীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছি। ফলে এসব বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে একদম দেরি হয় না। আমি গম্ভীর হয়ে বল্লুম 'আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ অথেনটিক তেলুগু লাঞ্চ'।

খেয়াল করে দেখবেন, এক্ষেত্রে অবধারিত ভাবে উদ্দিষ্ট স্থানীয় লোকটির মুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি খেলে যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সম্মুগম নামের সেই সেলস অফিসারটি বেশ প্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন 'ইউ গুড ফ্যামিলি ফুড ওয়ান্ট স্যার? আই টেক ওয়ান ভ্যারিইই নাইস প্লেস ইউ। লেস স্পাইস,লেস অয়েল। বাট নো এসি, ওক্কে না? চ্যালেগা?'

চ্যালেগা কি রে ব্যাটা? দৌড়েগা। গুন্টুর হলো গিয়ে ভারতের শুকনো লঙ্কার রাজধানী। তা সেই গৌরব এতদঞ্চলের লোকজন মোটামুটি হৃদমাঝারেই রাখে, তাতে যে গত সাত আট দিনে পৌষ্টিকতন্ত্রের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে সে আর কহতব্য না। লেস স্পাইসি খাবারই তো খুঁজছি কবে থেকে ভাইটু!

তা বাবু যেখানে এনে আমাকে হাজির করলেন, সেটাকে দেখেই আমার ছোটবেলায় দেখা হাওড়ার শিবপুরের কথা মনে পড়ে গেলো। তেমনই ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ নির্জন ঠাণ্ডা একটা পাড়া, সবই একতলা দোতলা বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে একটা করে ছোট্ট বাগান, পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মারে কচি কচি গাছেদের মাথা। এমনই একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে হাজির করে ছোকরা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে, 'দিস ইজ প্লেস স্যার'।

একনজরে করে দেখলে বাড়িটাকে মন্দির টাইপ লাগে। সামনের বাগানে ছোট্ট ফুলের বাগান। বাইরে জুতো খোলবার জায়গা।তার পাশে আবার বড় ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো, তাতে চক নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে চোস্ত ইংরেজিতে বিভিন্ন মহাপুরুষদের বাণী লিখিত। জুতো খোলার সময় একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম, বেশিরভাগই শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ আর কালাম সাহেবের বিভিন্ন উক্তি।

বুঝলাম,রেস্তরাঁ মালিক একটি বিশিষ্ট জ্ঞান গোঁসাই!

তবে কিনা ভেতরে ঢুকেই যেটা সবার আগে নজর কাড়ে, সেটা হচ্ছে দরজার ঠিক উলটোদিকের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা প্রমাণ সাইজের বাঁধানো ছবি। যদিও অবাক হইনি বিন্দুমাত্র, আগেও দেখেছি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রচুর অনুসারী, বাঙালিদের থেকে বেশি বৈ কম নয়! বেশ আয়েশ করে চেয়ারে বসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝলাম যে এটা আমাদের প্রচলিত অর্থে কোন রেস্তরাঁ নয়। একটা বাড়ির ড্রয়িংরুমে চার পাঁচটি চেয়ার টেবিল পেতে আয়োজন। রান্নাবান্না সবই লাগোয়া কিচেনে, ঘরোয়া পরিবেশে ঘরোয়া রান্নার ব্যবস্থা। এরকম অনেক দেখেছি সাউথের মফস্বল গুলিতে। নামজাদা রেস্তরাঁর থেকে কিছু কম ভীড় হয় না।

দরজার কাছে কাউন্টার, আর সেখানে যিনি কাউন্টার আলো করে বসে আছেন, দর্শনমাত্রে প্রতীতি জন্মায় যে ইনিই এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

ভদ্রমহিলার বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কি তার ওদিকেই হবে, বিশাল শরীর, পুরো চেয়ারটাই যাকে বলে উপচে দখল করে বসে আছেন। কাশীর পেয়ারার মতন টকটকে ফরসা রঙ, নুন গোলমরিচের উরন্ত চুল, সোনার রিমলেস চশমা। গম্ভীর মুখে একটা বই পড়ে যাচ্ছেন। কথা বলুন না বলুন, সমীহের একটা সূক্ষ্ম মসলিনি বাতাবরণ যে ভদ্রমহিলাকে ঘিরে আছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমি তো হাতটাত ধুয়ে বসেছি, সামনে থালার মধ্যে কলাপাতা রেখে দিয়ে গেছে, একগাদা ছোট ছোট বাটি চারিদিকে, তার মধ্যে বিচিত্র সব তরকারি, ঘিয়ের একটা বড় বাটি পাশেই, চামচসুদ্ধু, তার পাশে দুটো

খোপওয়ালা একটা পাত্র, তার একটা খোপে হলদে বাদামি টাইপের পাউডার একটা (এরা বলে গান পাউডার) আরেকটা খোপে গাঢ় বাদামি কালো রঙের আরেকটা পাউডার, এরা বলে মিঠা নিমপাত্তা পাউডার, বেসিক্যালি কারিপাতা শুকিয়ে মশলা মিশিয়ে গুঁড়ো করে রাখা।

তারপর দেখি একটা কি ভেজিটেবল চপের মতন দিয়ে গেলো, বেশ মুচমুচে বেসনে দিয়ে ভাজা, আর একটা ইয়াব্বড় শুকনো লঙ্কা,চপচপে করে তেল দিয়ে ভাজা। সঙ্গে থপাৎ থপাৎ করে দুচামচ চাটনি। তারপর দেখি পরিবেশনকারী ভদ্রলোক একটা ভাতের বালতি নিয়ে হাসিমুখে আমার দিকেই আগচ্ছতি। খিদের মুখে গরম ভাতের গন্ধটা যা চরম ভালো লাগে কি বলবো, খিদেটা যেন দুনো হয়ে উঠলো। আমি আবার কদিনে সামান্য ছেঁড়াখোঁড়া তেলুগু শিখেছি। ছাগল যেমন নতুন শিং গজালে সবেতেই একটু ঘষে নেয়, আম্মো চান্স পেলেই একটু তেলুগু বলে নিচ্ছি, আশেপাশের পাবলিক সেই শুনে আবার বিলক্ষণ মজাও পাচ্ছে। তা এখানেও আমার ভেতরের সেই ভাষাবিদ হরিনাথ সুযোগ পেয়েই বলে উঠলেন 'কুঞ্জম রাইস কাওয়ালে', অস্যার্থ আমার একটু ভাত চাই। কুঞ্জম মানে কিছুটা বা একটু , কাওয়ালে মানে আমার চাই।

বলেই গর্বে ইতিউতি চাইছি, আশেপাশের লোকজন বেশ প্রশ্রয়যুক্ত অ্যাপ্রূভালের ভঙ্গিতে মৃদু হাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াচ্ছেন, এমন সময় দেখি অচানক সব্বাই গম্ভীর হয়ে ফের স্ব-স্ব ক্ষুৎপাত্রে মনোনিবেশ করলেন।

ক্কি কেস? ঘাড় ঘোরাতেই দেখি মালকিন স্বয়ং!! রিমলেস চশমার মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করছেন। চোখে চোখ পড়তেই চোস্ত ইংরেজিতে প্রশ্ন 'হোয়ের আর ইউ ফ্রম'।

আমিও চোস্ততর ইংরেজিতে বল্লুম, 'আপাতত ফ্রম বিজয়ওয়াড়া'।

ভ্রূধনু কুঞ্চিত হলো, ' দ্যটস নট দ্য আনসার। হুইচ পার্ট অফ ইণ্ডিয়া? নর্থ?'।

এই রে!! তামিলনাড়ুতে নর্থ ইণ্ডিয়ার হিন্দিভাষীদের একদম পছন্দ করে না লোকজন, স্বচক্ষে দেখা। এরা আবার সেদিককার নাকি? কোস্টাল অন্ধ্রতেও কি সেরকম হেনস্থা হতে হবে? ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে নাকি? খেতে অবধি দেবে না, অ্যাঁ? এদিকে আমার যে হেব্বি খিদে পেয়েছে মাইরি!

ততক্ষণে ভাত অবশ্য ঢেলে দিয়েছে পাতে। গরম ধোঁওয়া ওঠা ভাত, (এরা আবার পোচ্চুর ভাত খায়, সে পরিমাণ দেখলে আমরা বাঙালিরা মুচ্ছো যাবো), তার মধ্যেই আধবাটি ঘি প্রায় উপুড়হস্তেই দিয়ে গেছে, গন্ধেই মাইরি পেট চুঁইচুঁই করছে, আমি অত্যন্ত গভীর গলায়, বেশ ওজনদার গাম্ভীর্য সহকারে (যাতে খাবারটি ফস্কে না যায়) বল্লুম ' আয়্যাম ফ্রম ইস্ট ইণ্ডিয়া'।

বলেই খেতে যাবো, ঝটিতি পরের প্রশ্ন, ' হুইচ স্টেট? বিহার অর আসাম?'

আ মোলো যা। তাতে আপনার কি মাসিমা? ওখানকার লোক হলে ফ্রি তে খাওয়াবেন নাকি? ঝত্তসব, সামনে মাইরি গরম ধোঁয়াওঠা ভাত, ঘি দিয়ে, ভাবচি ওই যে ভেজিটেবিল চপটা দিয়ে গেলো সেটা দিয়ে দু গরাস মুখে তুলি, এমন সময় এমন সিবিআই মার্কা এনকোয়ারি ভাল্লাগে না মাইইরি..

চপটা ভেঙে অত্যন্ত গাঢ় গলায় বল্লুম ' ওয়েস্ট বেঙ্গল'।

' হুইচ সিটি?' মিস মার্পলকে এবার অসহ্য লাগছিলো।

'ক্যালকাটা' বলেই চপটার ভেতরটা দেখে সন্দেহ হলো। নারকেল নাড়ুর মতন দেখতে কেন রে?

'হুইচ পার্ট অফ ক্যালকাটা?'

এইবার সোজা হয়ে বসে ভদ্রমহিলাকে অবলোকন করতেই হলো, যদি বলি কড়েয়া কি হরিদেবপুর, ইনি কি চিনবেন, অ্যাঁ? তাইলে এত কৌতূহল কিসের মাসিমা? যাগগে যাক, আমি চপটার খানিকটা মুখে দিয়ে সগর্বে বল্লুম, 'লেকটাউন', বলেই আমি ধাঁ,কা রণ চপটা হাকুচ মিষ্টি, অ্যাকচুয়ালি বড় নরমপাকের নারকেল নাড়ু,একগাদা গুড় দিয়ে বানানো, বাইরেটা বেসন দিয়ে ভেজে চপের আকার!!!

ভদ্রমহিলা আমার মুখ দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, তারপর বিশুদ্ধ কলকাত্তাই বাংলায়...

'আগেই বুঝেছি, তুই এদিককার নোস। নেহাত ভেঁদড় না হলে কেউ মিষ্টি দিয়ে ভাত খাওয়া শুরু করে না। ওটা চপ নয় স্টুপিড, ওটা নারকেল আর গুড়ের মিষ্টি, ওটাকে বলে ওবাট্টু। আরে আরে আরে, ওটা কি দিয়ে ভাত মাখছিস? আরে ওটা ডাল নয় রে বোকা, স্যুপ, ওটাকে বলে উলাভা চারু.....' বাক্যস্রোত চলতেই থাকলো।

আর আমি বেহুদ্দ বেকুবের মতন হাঁ করে চেয়ে রইলাম। রাজামুন্দ্রিতে বাংলা? ইনি??

তবে খিদের সামনে বেশিক্ষণ বেকুব হয়ে থাকা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঠাকুমা ছোটবেলায় ছড়া কাটতেন, 'অন্ন এমুন চিজ, খোদার থিইক্যা উনিশ বিশ', ফলে ডাল দিয়ে (এরা ডালকে বলে পাপ্পু) ভাত ভেঙে খেতে খেতে তেনার বক্তিমে শুনতে লাগলুম।

ভদ্রমহিলার জন্ম কর্ম বিবাহ কলকাতাতেই, সাউথ কলকাতায়, লেকের ধারে ('হ্যাঁ রে, মেনকা সিনেমা আছে? ওর পাশেই তো আমাদের বাড়ি ছিল। আহা, ম্যাটিনি শোতে বাবা মায়ের হাত ধরে উত্তম কুমারের ছবি দেখতে যেতুম'), পড়াশোনা ওখানেই (' তখন তো স্কুলে মজা হতো কতো, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নাটক করেছি, শ্যামাতে নেচেছি, চিত্রাঙ্গদায় গান গেয়েছি, সরস্বতীপূজো করেছি। এখনও হয় রে? অবশ্য গার্লস স্কুল, তুইই বা জানবি কি করে বল'), কলেজও (' এখনও আশুতোষ কলেজে ডিবেট ক্লাবটা আছে? চমৎকার ডিবেট হতো আমাদের সময়ে , কি ভালো ক্যুইজ হতো, প্রেসিডেন্সি থেকে শার্প ছেলেমেয়েরা আসতো, আহহা, এখনও হয় রে?')।

সারাক্ষণ ধরে এই চললো, মাঝেমধ্যে মৃদু ধমক, কার পরে কি খেতে হয় তার নির্দেশ দিয়ে। তারপর সেই অবিশ্রান্ত বকবক। তখনকার অশান্ত কলকাতা (ভদ্রমহিলার কলেজ লাইফটা সত্তর দশকে বুঝতে দেরি হয়নি বেশি), ধরপাকড়, মিটিং মিছিল, শহর জুড়ে নিরন্ন উদ্বাস্তুদের ভিড়, কালীঘাট, চেতলা, গড়িয়াহাট, জবরদখল কলোনি, মনে হচ্ছিল একটুকরো ইতিহাস যেন চোখের সামনে সোনার রিমলেস চশমা পড়ে হাসিমুখে বসে। একবার পার্ক স্ট্রিটের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আরেকবার গোলবাড়ির কথা। কলেজ স্কোয়ারের ফুচকার কথা জিজ্ঞেস করার সময় তো চোখদুটো চকচক করছিল, স্পষ্ট দেখলুম।

পুলিহারা বলে একটা আইটেম ছিল, একটু টক মতন ফ্রায়েড রাইস আর কি, দিব্যি খেতে। আমি খেতে খেতে এখানে এলেন কি করে জিজ্ঞেস করাতে সামান্য বিষন্নতার ছায়া পড়লো ভদ্রমহিলার চেহারায়, 'তোর আঙ্কেল চাকরি করতো অডিটে, বুঝলি? সেও আমার মতই কলকাতায় বড় হয়েছে। এইট্টি ফাইভে এদিকে চলে আসি। তারপর ছেলেমেয়ে বড় হতে লাগলো, আমারও আর কলকাতা ফেরা হোল না। '

ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়ে গেছিলো, বিল মিটিয়ে একটু মৌরি চিবোতে চিবোতে বেরোবার সময় বল্লুম 'এখনও চমৎকার বাংলা বলেন তো'।

রীতিমতো ক্ষুন্ন হলে তিনি, ' সে কি রে? ছোটবেলা থেকে শিখেছি, স্কুল কলেজ বন্ধুবান্ধব আড্ডা সবই বাংলাতে দিয়েছি, ভুলে যাব কি রে? তাছাড়া.... কি বলতো? '

নিচু হয়ে জুতো পরছিলুম, উঠে দাঁড়িয়ে বল্লুম 'কি?'

ভদ্রমহিলা চোখ টিপে বললেন, 'ইউ ক্যান টেক সামওয়ান আউট অফ ক্যালকাটা, বাট ইউ ক্যান নট টেক ক্যালকাটা আউট অফ হার '।

গাড়ি করে ফিরে আসার সময় এসি বন্ধ করে জানলার কাঁচটা নামিয়ে দিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া, বিকেল হয়ে নেমে আসছে নরম রোদ। সেই দিকে তাকিয়ে ভাবলাম আমার মতন যারা কলকাতা ছেড়ে এসেছি কাজের সূত্রে, আমরাও কি সব সময় বুকের মধ্যে একটুকরো কলকাতা বয়ে নিয়ে চলি না? সব সময় কি স্বপ্ন দেখি না, কোন এক অলৌকিক ভোরে এসে যাবে সেই রাজার চিঠি, সেই মায়ার ভূখণ্ডে ফিরে যাবার সনদ। আমার মতনই পৃথিবীজোড়া হাজার হাজার কলকাতা ছাড়া মানুষদের কি অমোঘ বাঁধনেই না বেঁধে রেখেছে সেই বুড়ি শহর..কি অনায়াসেই....

ডিমনিকাহিনী

বহু পূর্বকৃত পুণ্যবলে লোকে সেলসে চাগরি পায় মহাই, আজই হাতেনাতে প্রমাণ পেলুম।

হয়েছেটা কি, এই ডিমনি নামের মামণি এসে তো কয়েকদিনের জন্যে নাহক অসুবিধা সৃষ্টি করেইছেন, এ কথা শীতের ন্যাতাকাঁথা দিয়েও আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। আমার ব্যক্তিগত ভাবে যে খুব অসুবিধা হচ্ছিল তা নয়। এক অটোতে যাতায়াত, কাঁচা সবজি বাজার আর বাড়িতে গিন্নির সহকারিণীটিকে মাইনে, এ ছাড়া ক্যাশ আমার লাগেই না। তদুপরি পাওয়াই মার্কেটে জয়ন্তর দোকান থেকে মাছ কিনি, আর সেখানে বহুকাল থেকেই ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নেয়, গত দুবছর যাবৎ তাই কিনছি।

কিন্তু সবাই জয়ন্ত নয়। সবার কাছে অনলাইন পেমেন্টের ব্যবস্থা নেই। এই যেমন সেদিন। পাওয়াই মার্কেটে মাছ কিনতে গিয়ে থমকে গেলাম! ইয়াব্বড়বড় গলদা মশাই, একেকটার ওজন দেড়শো গ্রামের কম হবে না, হলফ করে বলতে পারি। শুঁড় বাদ দিয়েও এক বিঘৎ লম্বা, আর তেমনই পুরুষ্টু, প্রায় মর্তমান কলার সাইজেরই। বাড়িতে কোকোনাট মিল্ক আছে দেখে এসেছি, নারকেলও এক পিস আছে বলেই মনে পড়ছে। দাম, হে হে, বলছি বলছি, মুচ্ছো যাবেন না কিন্তু, শক্ত করে কিছুমিছু একটা ধরে বসুন।

সাড়ে চারশো। না না, পার পিস না, কিলো সাড়ে চারশো। ফলে যদি ভাবিইই যে এই রোব্বারের দুপুরে লাঞ্চটা দেরাদুন রাইসের ভাত আর গলদার মালাইকারি দিয়েই সারবো, তাতে কি খুব ভুল হবে অ্যাঁ?

ভাবতে ভাবতেই আলতো করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে লালাটা মুছে নিলাম। আরে না না স্বপ্ন নয়। অ্যাগদম সত্যি, আজই সকালে, আই আই টি পাওয়াই মার্কেটে।

তারপর? তারপর আর কি? আমি লোভাতুর নয়নে মাছের দিকে চেয়ে রইলাম, আর মাছউলি মউশি সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে।

আমার হাতে শুধু একটা দু হাজার টাকার নোট, মউশির কাছে দুটো একশো টাকার নোট, আর কয়েকটা খুচরো!

ফলে বুঝতেই পারছেন, পরিমাণটা তত বেশি না হলেও লাগে। আর চট করে বাড়ির কাজের মেয়েটিকে দুহাজারের নোট দিতে গায়ে লাগে, তাকে খুচরোতে দিতে হয়। আমার চালিয়ে নেওয়ার বিবিধ উপায় আছে, সে বেচারি অত উপায় পাবে কোত্থেকে?

তা গত মাসে নিজের পানবিড়ি ইত্যাদি খরচার জন্যে চেনা পানের দোকানীকে ধরেছিলাম। সিগারেট আর পানের ব্যবসা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাশের ব্যবসা, আর এলইউপিঅর্থাৎ লো ইউনিট প্রাইস বিজনেস, এদের কাছে খুচরো থাকতে বাধ্য। তা চেনা দোকানী, আমাকে নিরাশ করেনি, দু হাজার নোটের বদলে আঠেরোশো দিয়েছে, বাকি দুশো টাকা দু হপ্তায় পান সিগারেট কিনলে কেটে নেবে এই কড়ারে। প্রিপেইড নেশা আর কি!

তা গতকাল বাড়িতে ফিরে ছানটান করে লুঙ্গিটা পরে মুড়ি বাদামের বাটিটা টেনে নিয়েছি কি নিই নি, ও মা, গিন্নি দেখি খপাৎ করে ওয়ালেটটা হাতে নিয়ে চিল চিৎকার, 'তোমার কাছে এত্ত খুচরো, আমাকে বলোনি তো? জানো আমার কি অসুবিধা হচ্ছে? বলি এত বয়েস হলো, আক্কেলহুঁশ কবে হবে শুনি?' আমিও কাষ্ঠহাসি হেসে কিছু বলতে গেলুম বটে, কিন্তু খেয়াল করে দেখলুম প্র্যাকটিক্যালি গলা দিয়ে ঘোঁ ঘুঁ ঘপাৎ ছাড়া আওয়াজই বেরোচ্ছে না!!

তা তিনি সতেরশো টাকা হাতিয়ে খুব কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, 'একশোটা টাকা রইলো, পুরুষ মানুষের হাতে বেশি ক্যাশ থাকা ভালো নয়। আর হ্যাঁ, দুটো দুহাজার টাকার নোট দিয়ে দিয়েছি, কাল সন্ধ্যেবেলায় যেন ভালোয় ভালোয় চল্লিশটা একশোটাকার নোট পাই। কথাটা যেন মনে থাকে। '

বাপ মার কথা অমান্য করা যায় মশাই, স্ত্রীর কথা অমান্য করলে যে ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রপাত আছড়ে পরে তার প্রতিকার মনু সংহিতা থেকে হ্যারি পটার কোত্থাও লেখা নেই। ফলে আজ খুবই চিন্তিত মুখে মার্কেট এসেছি,

সেলসম্যান ছোকরা দেখি আরও চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে।

'কি রে, মুখটা ভেঁদড়ের মতন করে রেখেছিস কেন?'

'ধান্দা বিলকুল ঠপ পড়া হ্যায় স্যার। ইস মাহিনেকা টার্গেট নেহি হোগা।'

'সে কি রে পাগলা? চাকরি থাকবে যে রে! না তোর চাকরি থাকবে, আর আমার তো নেইই ধরে নে। বলি ওরে পচমপকাই, আমরা তো সেলসের লোক। দুর্গমগিরিকান্তারমরু পার হয়ে ব্যবসা আনাই তো আমাদের কাজ রে পাগলা। ওরে তুই কি সামান্য লোক? বলি কবি ''মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' এ কাদের কথা বলেছেন? স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ কাদের জন্যে হয়েছিল? মহাকবি শ্রীজাত যে বলেছেন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে', সে কার জন্যে, অ্যাঁ? ওরে তুই কি রাজা ভটচায্যির ভারতবর্ষ পড়িসনি? ছত্রে ছত্রে যে তোর বীরগাথাই লেখা আছে ' ইত্যাদি বলেটলে, 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন ', 'ঊর্ধগগনে বাজে মাদল' টাইপের পেপটক দিতেই সে ছোঁড়া বেশ চাঙ্গা হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বললো, 'তাহলে চলুন স্যার'।

ঘন্টাপাঁচেক বাদে ফের সে দুজন একই জায়গায়। পঁচিশটা দোকানে কল করা হয়েছে, মাত্তর তিনটে প্রোডাক্টিভ। দোকানদাররা কম্পানির সেলসম্যান দেখলেই মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

যাই হোক, এর পর অফিসে যেতে হয়, রিপোর্ট ফাইল করতে হবে। সে হতোদ্যম ছোঁড়াকে 'সেলসের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ' ইত্যাদি বুঝিয়েটুঝিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছি, ছোকরা ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্টে যাবে বলে অ্যাবাউট টার্ন করেছি কি করেনি, খপ করে ওর হাত ধরেছি।

'ক্যায়া হুয়া স্যার?'

' হ্যাঁ রে বুদ্ধুভুতুম দহিবড়া খাবি? '

ছোকরা ভারি অবাক হলো, 'কিউঁ স্যার?'

' নইলে মিসল পাও খাবি নাকি? বেশ ঝাল ঝাল? নাকি ভড়াপাও বলে দিই দুটো?'

সে ভারি সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কিঁউ বস? কেয়া হো গ্যায়া?'

এইবার খাপ খুলতেই হয়। 'বলি কম করে তো কুড়িটা দোকান থেকে ক্যাশে ডিউ বিলের পেমেন্ট নিলি। ব্যাগটা খোল দিকিন সন্টিমন্টি'।

এইবার সে ছেলে হেসে ফেলে আমার মতলব বুঝে, 'আপকো ছুট্টা চাহিয়ে ক্যায়া?'

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পকেটে চল্লিশটা একশো টাকার গরমাগরম পাত্তি। ডানদিকের হিপ পকেটটা যেভাবে ফুলে আছে, তাতে দক্ষিণ নিতম্বে টিউমার হয়েছে বলে কারো সন্দেহ বলার কিছু নাই। তবে ওসব তেমন কিছু না। মোদ্দা কথা এই যে আমার কাছে এখন, চল্লিশটা ইয়ে, তার মানে,

১. রাত্তিরে মাটন, আর

২. হে হে জানেনই তো , কাল লাঞ্চে গলদা!

কালকে কি বেহুদ্দ বেইজ্জত হয়েছি রে ভাই, মানে সে কি বিচ্ছিরি রকমের ইন্সাল্ট, সে আর কহতব্য নয়! ভালো বাংলায় যাকে বলে সুতীব্র অপমান, প্রায় সেটাই আর কি। গা''টা যা রাগে রি রি করছে না, মনে হচ্ছে সে ছোকরাকে ধরে কেলিয়ে পাটপাট করে দিই, তারপর থেঁতো করে, আগুনে পুড়িয়ে, হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়ো গুঁড়ো করে..

ব্যাস, শুনেই দাঁতফাঁত বার করে চলে এলেন না? কি ইল্লি মাইরি, আবদার শোনো একবার! আমার এত বড় অপমানের কথাটা নাকি ব্যাখ্যান করে শোনাতে হবে। যত্তসব করেকটেঘ্যাচাং টাইপের বন্ধু হয়েছে কতগুলো দেখছি, হুঁঃ

আচ্ছা আচ্ছা, আর রাগ করতে হবে নি, বলছি।

তা ঘটনা খুবই সামান্য। কয়েকদিন বাদে কলকাতায় যাবার একটা প্ল্যান আছেই। ফলে গত পরশু গেছি অফিসের পাশেই যে ইয়েস ব্যাঙ্কটা আছে, সেখানে, কিছু ক্যাশ তুলবো বলে। লাইনটাইন দেখলুম একটু

কম। দুজনের পরেই আমার ডাক পড়লো। আমিও গিয়ে ভারি আহ্লাদী মুখ করে চেকটা গছিয়ে দিলুম কাউন্টারে।

চেকটা যাকে বলে অ্যাকনলেজ করে, দুটো সই করিয়ে নিয়ে, কাউন্টারাধিষ্ঠিতা বিধুমুখী ললনাটি একটি ভুবনমোহিনী হাসি উপহার দিয়ে মদালসা স্ত্রে জানালেন, শুধুমাত্র দুহাজার টাকার নোটই পাবো, পাঁচশো, একশোর নোট সেদিনকার মতন শেষ। তার বদলে তিনি খুবই মিষ্টি করে বার দুয়েক সরি অবধি বললেন।

আপনারা তো জানেনই, আমি খুবই কোমলহৃদয়ের মানুষ। বিশেষ করে সুন্দরী মহিলাদের দুঃখ দুর্দশা এক্কেবারে সহ্য করতে পারি না। ফলে 'ঠিকাচে ঠিকাচে, আপনাকে আর অত ইয়ে হতে হপে না' কয়েটয়ে ব্যাঙ্কের পিয়নকে, 'এইও, দেখতা নেহি ভদ্রমহিলা কি বিচ্ছিরি রকমের ঘাম রাহা হ্যায়, বলি এসিটা জোরসে চালানে মে কি তুমকা কিছু কষ্ট হোতা হয় রে ব্যাটা' বলে একটু দাবড়ে দিয়ে বাইরে এসে ভাবলুম অতঃকিম? এইবার অন্তত একটা দুহাজার টাকার শিভ্যালরি ভাঙাই কোথায়? পকেটে তো দুটো একশো টাকার নোট ছাড়া আর কিছু নেই!

তা কাল বিকেলে অফিসফেরতা গেছি পাওয়াই হিরানন্দানিতে, বুইলেন। সে প্রায় বম্বের বুকে একটুকরো স্যুইৎজারল্যাণ্ড। বিশাল বিশাল বিদেশি ধাঁচের বাড়ি, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, দারুণরকম ভালো দোকানপাট আর পাব, চওড়া ফুটপাথ, তাতে আবার সুবেশ তরুণ তরুণীদের ভিড়, মানে শুধু পারিজাতবন আর ঐরাবতটাই যা নেই আর কি!

তা সেই স্বর্গোদ্যানে গ্যালেরিয়া বলে একটি ছোট মার্কেট আছে। মানে নিউমার্কেটের ছোট সংস্করণ আর কি, অত্যন্ত গোছানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর নিউমার্কেটের ফুটপাথের হকারদের বাঁদরামি তো একদমই নেই!

তা গ্যালেরিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর চেনা পুরোনো বইয়ের স্টলগুলোতে ঢুঁ মারছি, এমন সময় দেখি, যাঃ! পাশের টি শার্টের দোকানটা তো দেখি মাছি তাড়াচ্ছে যে! মানে লিটারেলি মাছি দেখলেই কাউন্টারের ছেলেটা তাড়াবার জন্যে দৌড়ে যাচ্ছে। আর মাছিগুলোও হয়েছে তেমন অবাধ্য আর ত্যাঁদড়, তাকে দেখলেই 'ও যেন আমাকে টাচ না করে' ভঙ্গিতে পগারপার, এদিকে আসার নামই নেই? সে তাড়াবার জন্যে মাছি খুঁজে খুঁজে কি হয়রান অবস্থা তার!

মনটা হু হু করতে লাগলো বুঝলেন? আহা রে, এই ডিমনির বাজারে ব্যবসাপাতির অবস্থা এমনিতেই মন্দা, তার ওপরে ছেলেটা এক একা মাছি তাড়াচ্ছে, ঠিক সহ্য হলো না। আর গ্রাফিক টি শার্ট আমার খুব পছন্দের জিনিস, সে তো আপনি জানেনই। বাড়িতে প্রায় খান পঞ্চাশেক মজুত আছে, তাও পেলেই কিনি। গিন্নিও চুপ থাকেন, কারন এর একটা গঠনমূলক দিক হলো যে বাড়িতে কখনো ন্যাতার অভাব হয় না!

তা দয়ার্দ চিত্তে আমি দোকানে ঢুকতেই সেই বালকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দেখে তো মাইরি নিজের ওপর আমি নিজেই খুব ইম্প্রেসড! ফলে বেশ উদারভাবে আমার মিষ্টি ও গম্ভীর হাওড়া ইংরেজিতে সেই বিপণীবালককে বললাম 'বঢ়িয়াঁ টি শার্ট হ্যায় তো দিখাও।'

সে খান পাঁচেক টি শার্ট ঝটাকসে কাউন্টারে নামিয়ে ফেলতেই আমি প্রায় গৌতম বুদ্ধ লেভেলের একটা হাসি হেসে তাকে বল্লুম, বৎস, তিষ্ঠ! আমি বিশেষ ডিজাইন ছাড়া টি শার্ট পরি না, সমঝা?

'তো কেয়া দুঁ?'

'জোকার কা দিখাও, হিথ লেজার ওয়ালি'।

দুটো উমদা পিস এলো বটে, কিন্তু রংটা এখনই ছেতড়ে গেছে। এ জিনিস একবার কাচলেই তো বাঁদিপোতার গামছা হয়ে যাবে বাবু সোনা!

'ব্যাটম্যান দিখাও'

পছন্দ হলো না।

' সুপারম্যান দিখাও'

'টি শার্ট নেহি হ্যায় জি, দো ঠো চাড্ডি হ্যায়'

মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দেওয়ার জন্যে হাতটা নিশপিশ করে উঠলেও নিজেকে সংযত করলাম।

' সিভিল ওয়ার হ্যায়'

'খতম হো গ্যায়া জি'

'থর? উলভেরাইন? স্টর্ম?'

'উয়ো ক্যা জি?'

'হাল্ক? ডক্টর স্ট্রেঞ্জ? অ্যাভেঞ্জার্স? আয়রন ম্যান? '

'আয়রন ম্যান?'

ইক্কিরে বাওয়া, মালটা টনি স্টার্ককে অবধি চেনে না দেখছি! গ্রাফিক টি শার্ট কেন, এর তো দেখছি স্যান্ডো গেঞ্জি অবধি বেচা উচিৎ নয়।

তবে স্টার্ক শব্দটা মনে আসতেই...

'গেম অফ থ্রোন্স তো হোগা?'

'??????'

এবার অসহিষ্ণুহয়ে পড়ি, 'হাউস অফ স্টার্ক, টারগেরিয়ান? ল্যানিস্টার? অল মেন মাস্ট ডাই? কম করকে আই অ্যাম খালিসি অন্তত তো হ্যায়?'

'নেহি বাবু, ই সব নেহি রাখতে'

'তো তুমারে পাস একঠো ভি কাম কা টি শার্ট নেহি হ্যায় দেখতা হ্যায়। আরে ভাই মেরে লিয়ে কুছ তুমহারে পাস হ্যায় ইয়া নেহি, অ্যাঁ? '

সে ছোকরা অপাঙ্গে একবার দেখলো আমাকে। তারপর সরাসরি আমার মধ্যপ্রদেশের দিকে নজর রেখে ভারি নিঃস্পৃহ গলায় বললো,

'দো ঠো কুংফু পাণ্ডা হ্যায়, দিখাউঁ?'

বলেছিলাম না, মনে হচ্ছে সে ছোকরাকে ধরে কেলিয়ে পাটপাট করে দিই, তারপর থেঁতো করে, আগুনে পুড়িয়ে, হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়ো গুঁড়ো করে..

মার্কেট ভিজিট ১৩

ইন্দওর ভারি সুন্দওর শহর।

ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। চওড়া রাস্তাঘাট, ঝলমলে দোকানপাট, লোকজনের ব্যবহারও ভালো। আর ছাপ্পানদুকান বলে একটা জায়গা আছে, গোলগাপ্পা, রাজ কচৌরি আদি নমকিন স্ন্যাক্স ইত্যাদির জন্যে ভারতবিখ্যাত, এখানকার এগ বেঞ্জো যে না খেয়েছে তার পক্ষে....

দেখতে দেখতে নিজের শহর হাওড়ার জন্যে একটা হালকা দুঃখ বুকের মধ্যে চিনচিন করে। প্রায় একই তো পপুলেশন, তাও....হাওড়া যদি আধা শহুরে হতদরিদ্র কলহপরায়ণা বৃদ্ধা হয়, ইন্দোর তাহলে সদ্য যুবতী লাবণ্যঝলমল সহজ মফস্বলী বধূটি, সমৃদ্ধির এয়ো চিহ্ন সর্বাঙ্গে।

তা প্রথম দিন, আট তারিখ, ছিল কনজিউমার ভিজিট। যে কোনও একটি আম আদমি পরিবারে হানা দিয়ে তাঁরা কি করেন, কি দেখেন, কি ভাবেন, কি খান, কি পড়েন, বাড়িতে কে কে আছেন, কি কি আছে ইত্যাদির তত্ত্বতালাশ নেওয়া, যদি কোনও নতুন কনজিউমার ইনসাইট পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রে বলেছে আত্মানং বিদ্ধি, ম্যানেজমেন্টশাস্ত্র বলে কনজ্যুমারাৎ সমৃদ্ধি, অর্থাৎ তিনিই সেই বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম...তাঁকে জানলেই মার্কেটিং এর পরমব্রহ্মলাভ হয়, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহনায়!

তা ইত্যাদির পর সন্ধ্যেবেলা বন্ধুবান্ধব অ্যাজ ইউজুয়াল একত্তর হয়ে যে যার বসের নামে গুচ্ছের গালমন্দ করছি, এমন সময় সবারই মোবাইলে টুংটাং আওয়াজ করে দুয়েকটা মেসেজ ঢুকলো। সবাই একসঙ্গে মেসেজ চেক করতে স্ক্রিনে চোখ রাখলাম....

তারপর কি হইলো জানে শ্যামলাল!!

যে ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রপাতজলোচ্ছ্বাসবন্যামহামারীভূমিকম্প ভেঙে পড়লো তার আর তুলনা নেই। আমরা হতচকিত, টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে ফেটে পড়লো উচ্চকিত তরজা আর আলোচনা, বাড়ি থেকে ঘনঘন ফোন, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজে আর জোক্সের বন্যা, সর্বোপরি ফেসবুকে ফের ফাটাফাটি!

সেই রাত্তিরেই বাইরে বেরিয়ে দেখি এটিএমের সামনে লম্বা লাইন। পান দোকান থেকে খানদানি আংগ্রেজি শরাব কি দুকান অবধি পাঁচশো কি হাজার টাকার নোট দেখালেই এমনভাবে আঁতকে উঠছে যে কহতব্য নয়। চারদিকে 'যাহ সসালা, এ সব কি হচ্চে বাওয়া' ভাব।

পরের দিন ৯ তারিখ আমাদের কনজ্যুমার ভিজিটের অ্যানালিসিস অ্যান্ড আইডিয়েশন পার্ট ছিল। ততক্ষণে ফেসবুকে যে যুদ্ধ লেগেছে তার কাছে কুরুক্ষেত্র, ওয়াটার্লু, স্তালিনগ্রাদ সব তুচ্ছ। ফেসবুক না হয়ে এ যদি সামনাসামনি হতো, কলকাতার জনসংখ্যা সেইদিনই হাফ হয়ে যেত, নীরদবাবু গোঁফে তা দিয়ে বলতেন, 'আত্মঘাতী বাঙালি কি সাধে বলেছিলুম রে বাওয়া?'

সকালে গিন্নি ফোন করে জানালেন যে বাড়ির হাউসমেডটি এসেই হাউহাউ করছে, এই সপ্তাহেই সে মাইনে পেয়েছে, সবই পাঁচশো আর হাজারের নোটে। এখন সে কি করবে? দয়াপরবশ হয়ে গিন্নিকে বললাম, 'ওকে বলো হাজার দুয়েক ক্যাশ পরে দিয়ে যেতে, আপাতত তুমি ওকে পাশের বিগ বাজার থেকে তোমার ক্রেডিট কার্ডে ওর যা লাগে তেমন হাজার দুয়েকের জিনিসপাতি কিনে দাও।'

দুমিনিট পরে গিন্নি জানালেন যে তিনি সলজ্জমুখে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওদের চওলের যে লোক্যাল মুদিশ্রেষ্ঠ, তিনিই আপাতত ধারবাকিতে জিনিসপত্র দিচ্ছেন, দু সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে এই কড়ারে।

তা সেই আইডিয়েশন সেশনে অশ্বডিম্বরূপ একটি আইডিয়া প্রসব করে সন্ধ্যেবেলা স্থির করলুম সদলবলে একটু বেরোব, ইন্দোর শহরটাও দেখা হবে আর তত প্রিভিলেজড নন এমন কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে হালহকিকত বুঝে নিই।

কপালগুণে একটা ভাড়ার গাড়ি পেয়ে গেলাম, চারঘন্টার জন্যে আটশো টাকা নেবে, এবং কিমাশ্চর্যম, পাঁচশো টাকার নোটেই নেবে?

কেন বাওয়া, সারা দুনিয়া পাঁচশো হাজারের নোট দেখলে কুষ্ঠরোগীর মতন এড়িয়ে যাচ্ছে, তোমার অসুবিধা হবে না?

স্মিত হেসে ছোকরা জানালো কাল পরশু তাকে ব্যাঙ্কে যেতেই হবে ডিপোজিট করতে। আরো চারটে নোট না হয় এক্সট্রা হবে। ডিপোজিট করতে তো আর লিমিট নেই, 'কাস্টমার কিঁউ ছোড়ে?'

তা তেনার গাড়ি চড়ে চারজন জ্ঞানপিপাসু বৈরাগী গিয়ে যে জায়গায় প্রথমে বডি ফেললাম, তার নাম রাজওয়াড়া। ইন্দোরের পুরোনো রাজপ্রাসাদ আর কি। তবে রাজওয়াড়া তখন বন্ধ। আশেপাশের বাজারহাট অবশ্য খোলা।

রাজওয়াড়ার ঠিক সামনে উদাস চোখে দুই অটোওয়ালা দাঁড়িয়ে, তাদের প্রথমজনকে পাকড়াও করি, 'কি চাচা, কাজকম্মের হাল কি?'

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ক্লান্ত উত্তর ভেসে আসে, 'বহোত খারাব হালত বাবু।'

আমার আবার নাম্বার নিয়ে খুঁতখুঁতুনি আছে, খারাপ মানে কত খারাপ? ভালো মানে কত ভালো? কোয়ান্টিফাই প্লিজ।

বুঝলুম, তেনার দিনমানে হাজার টাকার মতন ব্যবসা হয়। শতিনেক টাকার পেট্রোল পোড়ে, আর পুলিশের সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' বাবদ আরও একশো, কুল্লে ছ''শো টাকা দিয়ে ঘরসংসার চলে।

আজ, এই সন্ধ্যেবেলা অবধি মোট ব্যবসার পরিমাণ চল্লিশ টাকা!

হুম। তা তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে?

না বাবু, এখনো খাতা খুলিনি।

তা জমানো টাকাকড়ি রাখো কোথায়?

চোরাচাউনির সঙ্গে, 'ঘরেই থাকে বাবু'।

নিশ্চয়ই পাঁচশো হাজারের নোটেই রাখো। সেটা এখন কি করবে?

উত্তর শুনে টং করে রক্ত মাথায় উঠে গেলো, 'বস্তিমে এক হ্যায় অটোওয়ালা, দো ঠো অটো হ্যায় উসকে পাস, বোলা হ্যায় সারে কে সারে পাঁসসও না নোট লে লেগা, অওর হর পাঁসসও কে লিয়ে চারশো দেগা'।

ভারতবর্ষের সব কাকই বোধহয় কাকের মাংস খায়, না? সে কাক বুর্জোয়া হোক বা প্রলেতারিয়েত?

পরের অটোওয়ালে ভাইয়ার সঙ্গে কথাবার্তাও প্রায় একই লাইনে। তফাত দুটো জায়গায়, এক, অটো এই ভাইটির নয়, মালিকের। মালিককে দিনান্তে তিনশো টাকা তুলে দিয়ে বাকি যা বাঁচবে সব এঁয়ার। আর জমানো টাকা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন, ' মালিক বোলে হ্যাঁয়, উনহোনে বন্দোবস্ত কর দেঙ্গে', না, কোনও কাটমানির প্রশ্নই নেই, 'হামারে মালিক হ্যাঁয়, ইয়ে সব টাইম পর তো হামলোগোঁ কো দেখনা পড়ে গা না।'

এগোতে এগোতে দেখি ওষুধের দোকান। ইন্দোরের শুকনো আবহাওয়াতে ঠোঁট ফেটে চৌষট্টি হয়ে গেছিলো। গিয়ে বোরোলীন (হ্যাঁ, এই বাঙালি ব্র্যাণ্ডটি ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়) কেনার ছলে প্রৌঢ় মালিকটিকে সেই একই প্রশ্ন, 'ধান্দাপানি ক্যায়সা হ্যায় বাউজী?'

সেই একই উত্তর, সারাদিনমানে দৈনিক গড় ব্যবসার তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট হবে কি না সন্দেহ। যারা ক্রেডিট কার্ডে কেনে, তারাই এসেছে শুধু।

পাশে ইলেক্ট্রনিকসের দোকান, তিনি অবশ্য বেশি বিচলিত নন, তেনার দোকানে প্রায় সব কেনাকাটাই কার্ডে হয়। তবে 'আজ কাস্টমার কম হ্যায়, ছুট্টা দেকে অটো ইয়া টাঙ্গা চঢ়না পড়েগা, ইসি লিয়ে লোগ

জ্যাদা নিকলে নেহি হ্যাঁয়।'

এরপর জেল রোড, ইন্দোরের চাঁদনি আর কি। ঢুকেই দেখি এক চানা মসালা ওয়ালা,কম্বুর্নে অর্ডার দিলুম 'ভাই, চার জাগাহ পে দস দস রুপেয়াকা বানাও, নিম্বু জ্যায়াদা। পাঁসসও কা নোট লোগে না?'

ছোকরা প্রথম ঠোঙাটা তুলে ফিক করে হেসে ফেলে, 'কাহে মজাক কর রহে হো বাবুজি?'

এরপরে এক বাদামওয়ালার সঙ্গেও ঠিক একই কথোপকথন হয়েছিল। একই বক্তব্য, লিখতে আমিও বোর হবো, পড়তে আপনিও বেহুদ্দ বোর হবেন। তাই দুটো কেস একটাতেই সালটে নিই।

'বলি ব্যবসাপাতি ক্যামন'

'খুবই কম কত্তা, নোকজন কম বেরিয়েছে কি না'

'তা এই পাঁচশো হাজার টাকা ব্যান হলো, তোমার অসুবিধা হচ্ছে না?'

'হাসালেন কত্তা, পাঁচ দশ টাকার মাল বেচি, লোকে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ টাকার নোট দেয়। পাঁচশো টাকার নোট ইয়ে হলে আমার কি?'

টিকেট সাইজ, পারচেজ টিকেট সাইজ। এতক্ষণে জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলিত হলো। এদের রোজকার ব্যবসায় পাঁচশো টাকার ভূমিকা সীমিত। লোকাভাবহেতু ব্যবসায় মন্দাটাই আসল অসুবিধার কারণ।

'ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে?'

'না বাবু'

'জমানো টাকাকড়ি নিশ্চয়ই পাঁচশো হাজারে আছে, সেটা কি করবে?'

'কেন? মহাজনকে দেবো, মানে যার কাছ থেকে এই চানা /বাদাম আনি, তাকে দেবো, সেই বদলে দেবে।'

'তা সে কত টাকা কাটমানি নেবে?'

ভারি অবাক হয়ে সে চোখ তুলে তাকায় সেই টিকিধারী বিহারি ব্রাহ্মণবালক, 'সে কি? চাচা আমার মহাজন, আমার মালিক। তার সঙ্গে আমার রোজকার কারোবার চলে, তার বেটির নিকাহতে আমাদের ফুল ফ্যামিলির চার পাঁচদিন রান্না বন্ধের হুকুম হয়, সে থোড়াই আমার সঙ্গে এই রকম চিন্দিগিরি করবে? কি বলছেন কি বাবুজী? এখন যদি আপনি যান তো চাচা টোটালকে উপর তিস প্রতিশত তো পাক্কা লেগা। লেকিন মেরে পিতাজী ভি উনকে সাথ কাম করতে থে, ম্যায় ভি কাম করতা হুঁ দস সাল হো গ্যায়া। হাম লোগোঁকে সাথ ইয়ে সব... শোচ ভি নেহি সকতে।'

বুঝলাম, ভারত, দ্যট ইজ ইণ্ডিয়া নামের দেশটির মানুষী সম্পর্কের সবকটি পেঁচুঁ দেখতে ও শিখতে আমার এখনো বাকি আছে।

পরের শিকার এক ডিমসিদ্ধওয়ালা। ছ''টাকা পার ডিমসিদ্ধ। একই গল্প, লোক কম বাজারে তাই রোজগার কম। আর দিনে হাজার টাকার মতন ডিমসিদ্ধ বিক্রি হয়। হাজার পাঁচশো নোটের গল্পই নেই। জমানো টাকা কিছু পাঁচশো হাজারের নোট আছে বটে, তবে এঁয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও আছে। অতয়েব ইনি নিশ্চিন্ত আছেন, 'নেক্সট উইক মে তো ফির সে ওহি কাস্টমার আয়েঙ্গে না, এক হপ্তে কি বাত হ্যায় জি। পিছলে সাল বারিষমে কেয়া কিয়ে থে লোগোঁ নে? ইয়ে ভি ওয়সেহি সমঝ লোঁ।'

সবারই একই বক্তব্য, দুদিনের কেস, মিটে গেলে আর ঝামেলা নেই।

কিন্তু এসব তো এক্কেবারে নিম্নবর্গের ব্যবসায়ীকুল। মধ্যবিত্ত দোকানদার, অর্থাৎ রিটেইলারদের কি হাল হকিকত বাবু? যাদের আমদানি আর খরচা দুটোই পাঁচশো হাজারের নোটে হয়? তাঁদের কি গপ্প, অ্যাঁ?

এইটে বোঝাতে গেলে আপনাদের একটা টেকনিক্যাল জিনিস সামান্য বুঝতে হচ্চে যে কত্তা!

যে কোন কম্পানির উৎপাদিত প্রডাক্ট আপনার হাতে যে আসে, তা অন্তত কমপক্ষে দুজন মধ্যবর্তীর হাত ঘুরে পৌঁছয়, কম্পানি টু ডিস্ট্রিবিউটর, ডিস্ট্রিবিউটর টু রিটেইলার অ্যান্ড ফাইনালি রিটেইলার টু কনজিউমার। অর্থাৎ,

কম্পানি-গ্ল ডিস্ট্রিবিউটর-গ্ল রিটেইলার -গ্ল কনজিউমার।

(হোলসেলারদের এই আলোচনায় আনলাম না, মালটা সামান্য জটিল হয়ে যাবে বলে। আপাতত ধরে নিন হোলসেলার ইকোয়ালটু বড় সাইজের রিটেলার, যদিও কিছু তফাত আছে)।

এখন এই চেনে একটা সাপ্লায়ার -কাস্টমার ব্যাপার আছে। কম্পানি ডিস্ট্রিবিউটরের সাপ্লায়ার, ডিস্ট্রিবিউটর রিটেইলারের সাপ্লায়ার, আবার রিটেইলার হলো কনজিউমারের সাপ্লায়ার।

উল্টোদিক ধরে, কনজিউমার হলো রিটেইলারের কাস্টমার, এবং এইভাবে এগোতে এগোতে ডিস্ট্রিবিউটর হলো কম্পানির কাস্টমার।

ব্যবসার নিয়ম হচ্ছে সাপ্লায়ারের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব ক্রেডিট বা ধার আদায় করা, এবং কাস্টমারকে যত সম্ভব ক্যাশে বিক্রি করা। তাতে ব্যবসায় অপারেটিং ক্যাশ বৃদ্ধি পায়। ওটা ব্যবসার সুস্বাস্থ্যের চিহ্ন, ওতে ট্রঞ্জজ্জ অর্থাৎ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বাড়ে, লেভারেজ বাড়ে, অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন, ইহলোকে সুখী অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন, ইত্যাদি প্রভৃতি।

পরের দিন সক্কাল সক্কাল ছানটান করে, চাট্টি ইডলি ধোসা খেয়ে মার্কেটে নেমে যা দেখলাম, তা জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। আমার সমস্ত ন্যাখাপড়া, দশ বারো বছরের এক্সপিরিয়েন্স ধূলিস্যাৎ করে দেখি গঙ্গা উলটো বইছে!

তাবৎ দোকানদার তাঁদের সাপ্লায়ার,অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটদের পেমেন্ট দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সে কি দৃশ্য রে ভাই, প্লুরো 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান' কেস, দেখলে সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, জেগে আছি না বৈকুণ্ঠধামগতি হয়েছে বোঝা দায়। দোকানদার ঝাঁপিয়ে পড়ে কারেন্ট বিল তো বটেই, আগামী দুমাসের স্টকের জন্যে অগ্রিম পেমেন্ট অবধি ডিস্ট্রিবিউটরের পকেটে গুঁজে দিচ্ছে, মুখে স্পষ্ট 'তুই কি আমার পর?' ভঙ্গি।

সব পেমেন্টই অবশ্য পাঁচশো ও হাজারের নোটে!! অর্থাৎ আপদ তো বিদেয় হলো, তার ওপর স্টক দিতেও ডিস্ট্রিবিউটর বাধ্য। ফলে অনেকটা নিশ্চিন্দি।

তা যে ডিস্ট্রিবিউটর মহাশয় সঙ্গে ছিলেন, তিনি দেখলাম নির্বিকার চিত্তে সমস্ত পেমেন্ট কালেক্ট করছেন, হ্যাঁ, পাঁচশো আর হাজারি নোটেই!

এহেন মহত্বের কি কারণ?

তিনি উদাসস্বরে বললেন টাকা জমা দিতেই হবে, একবার নয় অনেক বারই, আর তাছাড়া জমা দেবেন কারেন্ট অ্যাকাউন্টে, সেভিংসে নয়। অতয়েব আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে? এই সুযোগে ভদ্রলোকের ব্যবসার চেহারা ফিরে গেলো, মার্কেটে এখন জিরো ক্রেডিট!

বুঝলুম, ভদ্রলোক ব্যবসা বোঝেন। তা ইন্দোর শহরের যে দ্বিতীয় ডিস্ট্রিবিউটর আছেন, শুনলাম তিনি কোনও পেমেন্ট নিচ্ছেন না যে? এক যাত্রায় এহেন পৃথক ফলের কারণ?

ইদিকউদিক তাকিয়ে ভদ্রলোক ফিক করে হেসে ফেললেন, 'উসকা প্রোমোটারি কা ভি ধান্দা হ্যায় না! '

এইবার বুঝো সাধু যে জানো সন্ধান!

রিটেইলারদের মধ্যে দেখলাম তিন প্রকারের রিঅ্যাকশন। তার আগে দেখলাম রাতারাতি ইন্দোরের প্রায় সমস্ত গ্রসারি বা জেনেরাল মার্চেন্টে পেটিএমে পেমেন্ট নেওয়া চালু হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম আহ্লাদিত, পুরোনো প্রজন্মের বিচলিত। এতদিন এসব না ব্যবহার করেও দিব্যি চলে যাচ্ছিলো, এখন হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়াতে তাঁরা মন দিয়ে কি করে পেটিএম ইউজ করা যায় শিখছেন। এ নিয়ে একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা হলো, উপসংহারে বলবো না হয়।

তা যা বলছিলাম, তিন প্রকারের রিঅ্যাকশন। এক, কিছুতেই পাঁচশো হাজারের নোট নিচ্ছেন না, দুই, নিচ্ছেন, কিন্তু পুরো পাঁচশো টাকার সামান নিতে হচ্ছে। তাঁদের বিশেষ দোষ দিয়ে লাভ নেই, দু একজন

গল্লা, অর্থাৎ ক্যাশবাক্স খুলে দেখালেন সবই পাঁচশো হাজারের নোট। খুচরো নোট সার্কুলেশনে নেই, চেঞ্জ দেবে কোত্থেকে? তিন, হাসিমুখে পাঁচশো হাজারের নোট নিচ্ছেন, নো ইস্যুজ।

তবে দুটো জিনিস কমন, এক ব্যবসার পরিমাণ অর্ধেক বা তারও কমে নেমে গেছে। আর দুই, মহল্লার চেনা লোকজনদের সবাই উদারহস্তে ধারবাকি দিচ্ছেন, 'এক দো হপ্তে মে তো মিল হি জায়েগা। ইতনা তো করনা পড়তা হ্যায়'।

তা তো বুঝনু, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটরদের পেমেন্ট করে দিচ্ছেন, পাবলিককে ক্রেডিটে মাল দিচ্ছেন, আপনাদের চলবে কি করে?

কেন? সবজি ছাড়া সবই তো দোকানেই আছে। আর এক হপ্তা সবজি কেনার পয়সা ঘরে থাকেই। ওটা তেমন বড় ইস্যু নয়।

বুঝলাম, আপাতত মার্কেটে বিশাল পরিমাণ ক্রেডিটে লেনদেন চলছে, 'এক দো হপ্তে মে কাম নিপট যায়েগা'র আশায়।

তা এত বড় ডিসিশনটা যে নেওয়া হলো, তাতে ফল কিছু হবে?

ব্যবসায়ী লোক, দুটো কথা মুখে বলেন, দশটা কথা পেটে থাকে। অনেকেই সোৎসাহে সমর্থন করলেন, বেশিরভাগই সতর্ক, 'আশা তো করছি ভালো কিছু হবে, দেখা যাক কি হয়' টাইপের জবাব।

তা ইত্যাকার জ্ঞানভাণ্ডারে চিত্তপূর্তি হলে পর খেয়াল হলো যে উদরপূর্তির আশু ব্যবস্থা দরকার। তা ইন্দোরের আপনা স্যুইটসের চানা ভাটুরা নাকি বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে, আবিষ্কর্তা নোবেল কি অস্কার কিছু একটা পেলেন বলে, এইসব শুনে সেখানে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো।

আগে পেমেন্ট কাউন্টার। সেখানে মেনুকার্ড রাখা। সেই দেখে পেমেন্ট করলে আপনি কুপন পাবেন, আর সেই কুপন ''ডেলিভারি'' লেখা জানালায় নিয়ে গেলে উদ্দিষ্ট বস্তুটির খোঁজ পাবেন।

গিয়ে দেখি তুমুল বাওয়াল!

এক বছর সত্তর পঁচাত্তরের বৃদ্ধ, মিলিটারিমার্কা গোঁফ নাচিয়ে মিলিটারি মেজাজে পেমেন্ট কাউন্টারে দাঁড়ানো মালিককে চোস্ত ইংরেজিতে ঝেড়ে চলেছেন, কেন পাঁচশো টাকার নোট নেওয়া হবে না তার কারণ দর্শানো হোক, এই মর্মে। মালিক ভদ্রলোকের কাঁদোকাঁদো অবস্থা, বাবুর অবস্থা দেখে কর্মচারীরাও ভীত ও ত্রস্ত। আর তো আর, এমপি পুলিশের এক ইন্সপেক্টর সাহেবও খেতে এসেছিলেন, তিনি চুপচাপ কেটে পড়লেন, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' আওড়াতে আওড়াতে।

শেষে যখন কিছুতেই কিছু হলো না, মালিক কার্ড বা পেটিএম ছাড়া পেমেন্ট নিলেন না, ভদ্রলোক লাইন থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে পাকড়াও করলেন, (খুব সম্ভবত মজা দেখার জন্যে সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম বল), 'হে ইয়ং ম্যান, আই হ্যাভ ইন্সটলড পেটিএম ইন মাই মোবাইল লাস্ট উইক, বাট আই ডোন্ট নো হাউ টু পুট এনি মানি দেয়ার। ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মি? মাই ক্রেডিট কার্ড ইজ উইথ মাই সন, অ্যান্ড দ্যাট বাগার ইজ সিটিং হ্যাপিলি ইন ভোপাল....' আমি তাড়াতাড়ি ফোন কেড়ে নিয়ে বললাম, 'দাঁড়ান স্যার, দেখছি।'

স্যার শুনে ঈশ্বর প্রসন্ন হলেন, গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসি দেখা গেলো। পেটিএমে টাকা ভরতে গিয়ে দেখি ক্রেডিট কার্ডের ডিটেইলস সেভ করা। হাজার টাকা ভরে মোবাইলটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললাম 'সিভিভি নাম্বার ডালুন।'

তা তিনি সিভিভি নাম্বার ডাললে যথারীতি পেটিএম ওটিপি নাম্বার পাঠালো, এবং তিনি সুগম্ভীর স্বরে জানালেন, ' দিস অ্যাপ ইজ রেজিস্টার্ড বাই মাই সানস মোবাইল, প্রব্যাবলি দ্যাট নাম্বার উইল গো টু হিম!!!'

লাও, এখন অ্যাকটিভিটি চলছে, সেটাকে বন্ধ করে তো আর ফোন করা যায় না, তাহলে তো উদ্দেশ্যটাই সিদ্ধ হবে না।

পাশে আমার সেলস অফিসারটি এতক্ষণ ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে সবকিছু নিমীলিত চোখে নিরীক্ষণ করছিলেন, এখন সচল হয়ে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে বিনয়াবনত গলায় বললেন 'আপকা বেটেকা নাম্বার বাতাইয়ে।'

যেই না ওপাশ থেকে হ্যালো শোনা গেছে, সেই তিনি ফোনটা নিয়ে ছেলের সঙ্গে যে ভাষায় আলাপ শুরু করলেন, তার বাংলাটা খানিকটা এইরকম, 'ওহে অলপ্পেয়ে অকালকুষ্মাণ্ড, ভোপালে গিয়ে দিব্য ফূর্তিতে আছো, বলি বুড়ো বাপ মা কেমন আছে তার খোঁজপত্তর কি একেবারেই নিতে নেই, অ্যাঁ? ওহে জাম্বুবান, এবার যদি ক্রেডিট কার্ডের বিল বেশি আসে... ', ঝট করে ফোনটা কেড়ে নিতে বাধ্য হলাম, কারণ ওটিপি বেশিক্ষণ লাইভ থাকে না।

ওপাশ থেকে পুত্ররত্নটি কাঁপাকাঁপা গলায় ওটিপি আউড়ালেন, আমি টাইপালাম।

পেমেন্ট সাক্সেসফুল।

এইবার সেখান থেকে দোকানিকে পেমেন্ট পাঠানো। পেটিএমের ডিসপ্লে লাগানো ছিলো, বার স্ক্যনার ওয়ালা। দশ সেকেণ্ডের বেশি লাগলো না একশো সত্তর টাকা পে করতে।

ভদ্রলোক পেমেন্ট কাউন্টারের দিকে যেতে যেতে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'বুড়ির সকাল থেকে খিদে পেয়েছে, এখানে সব দেশোদ্ধার হচ্ছে হুঁহ...যত্তসব...আগাপাছতলা চাবুক চালালে দুদিনে সব সিধে....'

কোণায় জড়সড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধাকে দেখিইনি এতক্ষণ!

বুড়ো মিনিটখানেকের মধ্যে কুপন নিয়ে বেরিয়ে এসে খুবই উদারস্বরে ধন্যবাদ জানালেন, 'থ্যাংস ইয়ং ম্যান, আসলে আমরা একটু ওল্ড তো, এইসব নতুন কায়দাকানুন শিখতে....'

আমি স্বভাবমতো দন্ত বিকশিত করে বল্লুম, 'নো ইস্যুজ স্যার, ওয়ান ডে আই''ল বিকাম অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ ইউ। হোপ সামওয়ান উইল হেল্প মি দেন দ্য ওয়ে আই হেল্পড ইয়ু টুডে।'

ভদ্রলোক থমকে তাকালেন, তারপর পিঠ চাপড়ে গিন্নির হাত ধরে ডেলিভারি কাউন্টারের দিকে এগোতে থাকলেন।

যে বলে পুরুষ মানুষের চোখ ছলছল করে না, তাকে হাতের কাছে পাই একবার!

ডিলেমা

বিপিন হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলো না!

অথচ অফার লেটারটা হাতে পেয়ে কিন্তু বিপিন ভারি খুশিই হয়েছিল। সে কথা বিপিনের স্পষ্ট মনে আছে।

নাহ, গল্পটা প্রথম থেকেই খুলে বলি।

বিপিন, বিপিনচন্দ্র শাসমল আমাদের কলেজে পড়তো। ছেলে হিসেবে চমৎকার, দিলদার বন্ধুঅন্তপ্রাণ। শুধু মা সরস্বতীর সঙ্গে পার্মানেন্ট ফৌজদারি মামলা এই আর কি! তা মা শেষতক সামান্য আড়চোখে কৃপাদৃষ্টিপাত করাতে ছোকরা পাশটাশ করে ভারি খুশি হয়ে আমাদের একদিন খাইয়ে দিল। উঃ, সে কথা মনে পড়লে এখনো জলে জিভ আর কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে!

যাগগে। বিপিন কলেজ পাশ করে ঢুকলো সেলসের চাকরিতে। তারপর যা হয়, একদিন বিয়েও করে ফেলল বাড়ির কথামত।

টুকটাক করে মন্দ কাটছিল না। শুধু তখনো ছেলেপিলে না হওয়াতে একটু মরমে মরে থাকতো এই আর কি। আমরা বন্ধুরা অবিশ্যি উৎসাহ দিতাম, ' এমনি এমনি কি এসব হয় রে পাগলা, এর জন্যে কঠোর পরিশ্রম লাগে, দিনরাত মেহনত করতে হয়'। মুশকিল এই যে আমাদের কথামত দিনরাত মেহনত করতে গেলে বিপিনকে খাবারদাবার ছেড়ে শুধু ইয়াকুতি হালুয়ার ওপরেই থাকতে হয়, খুব স্বাভাবিক কারণেই সেটা শোভনও না সম্ভবও না।

যাই হোক, এদিকওদিক টুকটাক ইন্টার্ভিউ দিতে দিতে একদিন বিপিন দেখলো, ইয়া আল্লা, মার দিয়া কেল্লা!! খোদ হিন্দুস্থান লিভারে চাকরির অফার! ভালো মাইনে, প্রচুর পার্কস ইত্যাদি ইত্যাদি। নাচতে নাচতে বিপিন পুরোন কম্পানিতে রেজিগনেশন দিয়ে অ্যাক্সেপ্টেন্স লেটার পাঠিয়ে আমাদের অলিপাবে বেধড়ক মাল খাওয়ালো। আমরাও যাবতীয় ঈর্ষা বুকে চেপে 'হেঁ হেঁ, ইউনিলিভার খুউপ ভালো কম্পানি। তেরা তো লাইফ বন গ্যায়া ইয়ার' ইত্যাদি বলে চোখ, এমন কি কপাল অবধি মাল খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলুম।

সব গল্প প্রায় শেষ, শুধু মেডিকেল টেস্টটাই বাকি, এমন সময়ে বিপনে পুরো ঘেঁটে গেলো!

মেডিকেল টেস্টের জন্যে অ্যাপোলো থেকে বাড়ি এসে ব্লাড, ইউরিন সব নিয়ে গেছিল। তার পরদিন বাকি টেস্টগুলোর জন্যে হাসপাতালে গেছে, ডাক্তারবাবু নাম শুনেই বিপিনকে বগলদাবা করে সোওওজা নিজের কেবিনে!

'ক্কি ব্যাপার স্যার?', বিপিন ভারি আকুল হয়ে শুধোলে।

ডাক্তারবাবু টেস্টের রিপোর্ট পড়তে পড়তে আধখানা রিডিং গ্লাসের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন 'দিনে কত পেগ হয়?'।

বিপিন 'ন্না ন্না স্যার, হরলিক্স আর চন্নামেত্ত ছাড়া আর কিচ্ছু খাইনা, মাইরি বলছি' বলতে যাচ্ছিল, শেষে ডাক্তারবাবু খুনে দৃষ্টিতে তাকাতে মিউমিউ করে বলল, 'ওই আ-আড়াই থেকে তিন পেগ স্যার'।

ডাক্তারবাবু হিমশীতল গলায় বললেন 'ক্রিয়েটিনিন, ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল তিনটেই মাথা উঁচু করে দেখতে হচ্ছে যে মশাই, টঙে চড়ে বসে আছে যে। কিন্তু যেটা ভয়ের কথা, সেটা হচ্ছে যে ইউরিনে প্রোটিন পাওয়া গেছে'।

খুব খুশি হল বিপিন, 'সে তো খুউউপ ভালো কথা স্যার, মানে আমার শরীরে হেবি প্রোটিন আচে, নয়?'

ডাক্তারবাবু পেপারওয়েটটা তুলে নিয়েছিলেন খুব সম্ভবত ছুঁড়ে মারবেন বলে। কি মনে হতে সেটা রেখে বললেন, 'না, নয়। এর মানে আপনার কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে না। এমত অবস্থায় ট্রিটমেন্ট না করিয়ে তো আমি আপনাকে ফিট সার্টিফিকেট দিতে পারছি না মশাই'!!

বিপিন খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে হাঁউমাউ জুড়ে দিল। অলরেডি আগের কম্পানিতে রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে। এখন এই তুচ্ছ কারণে যদি এইটা হাতছাড়া হয়,ফ্যামিলি নিয়ে পথে বসা ছাড়া বিপিনের আর কি উপায় আছে,সেটা ক্ষমাঘেন্না করে ডাক্তারবাবুই বলে দিন না হয়!

যা হোক, ডাক্তারবাবু বললেন যে সক্কাল সক্কাল ইউরিন নেওয়া হয়েছিল বলে হয়তো একটুখানি প্রোটিন ঘুমচোখে পথ ভুলে ধাঁ করে এসে পড়েছিল। উনি আরেকবার সুযোগ দেবেন। কাল সকালে আরেকবার ইউরিন স্যাম্পল নিতে লোক যাবে। বিপিন যেন খুব করে জলটল খেয়ে ঘুমোতে যায়, ইত্যাদি নানা সদুপদেশ দিয়ে রেহাই দিলেন।

তা সেদিন বিকেলে ঘটনাচক্রে একটু অলিপাবে গেছি গলা ভেজাতে, গিয়ে দেখি সে মক্কেল তুম্বোপানা মুখ করে এক কোণে বসে আছে। গিয়ে পিঠ চাপড়ে বল্লুম 'কি বে, হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছিস যে বড়? বউ বকেছে?' বলতেই সে ছোকরা ভেউভেউ করে উঠলো। সে কি কেলেঙ্কারি! কি বলে কিছুই বোঝা যায় না। শেষে জলটল খাইয়ে একটু ঠান্ডা করাতে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল।

আমি অবাক হয়ে বল্লুম, 'এ আর এমন কি ব্যাপার? কাল সকালে ইউরিন নিতে এলে বউয়েরটা দিয়ে দিস। ওরা তো আর দেখতে যাচ্ছে না টয়লেটে কে যাচ্ছে!'

ছোকরা পাক্কা আড়াই মিনিট হাঁ করে চেয়ে রইলো। তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চুমুটুমু খেয়ে একাকার কান্ড! আমার বিলটাও জোরজার করে ওইই দিল, আমি আর না করতে পারলুম না!

যাই হোক। পরামর্শ মেনে সমস্ত কাজকম্ম সুসম্পন্ন করে, পরের দিন হাসিমুখে বিপিন গেছে অ্যাপোলোতে, রিপোর্ট নিয়ে নতুন অফিসে সাবমিট করেই শ্বশুরবাড়ি যাবে এই প্ল্যান, ডাক্তারবাবু ওকে দেখেই ফের বগলদাবা করে কেবিনে।

'ইয়ে আবার কি হল স্যার? সব কিছু ঠিকঠাক আচে তো এইবার?'

রিপোর্ট পড়তে পড়তে রিডিং গ্লাসের ওপর দিয়ে ফের তাকালেন ডাক্তারবাবু, বললেন 'বাকি সব তো ঠিকই আছে, তবে কি না.....'

একটু ভীত স্বরে বিপিন বলল 'ইয়ে, তবে কি ডাক্তারবাবু?'

'আপনি কি জানতেন যে আপনি প্রেগন্যান্ট?'

হাসবে না কাঁদবে,বিপিন সত্যিই বুঝে উঠতে পারলো না!

মার্কেট ভিজিট ১৪

আমার কম্পানিটি দাদা কি বলবো, এমনিতেই ভারি ভালো কম্পানি। কেউ কাউকে কিচ্ছুটি বলে না, কাজ করলেও বলে না, না করলেও না। তার ওপর গত মাসে আমার বস রিজাইন করাতে গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়েই বেড়াচ্ছিলাম প্রায়। কিন্তু দুধের ওপরেও যে সরভাজা হয়, বা চিকেনের ওপরে রোগনজোশ সেটা চমৎকার বুঝতে পারলাম ঠিক যে পুণ্যমুহূর্তে আমার টেম্পোরারি ওপরওয়ালা এসে খুবই গম্ভীর মুখে বললেন, 'বেটা, যবসে ইস্ট রিজিওনকা ম্যানেজার নওকরি ছোড় দিয়া হ্যায়, তব সে ধন্দে কি তো ওয়াট লাগি হুই হ্যায়। আপ এক কাম করো, বোরিয়া বিস্তর উঠাও অওর কলকাত্তা যা কর ব্যয়ঠো', বিশ্বাস করবেন না, মনে হয়েছিলো গুঁফো লোকটার কোলে উঠে দুই গালে দুটো চকাম চকাম করে চুমু খাই। এদ্দিন যেন সরোবরের মীনগণের মতই হীন হয়ে ছিলুম, ভরসা পেয়েই মনে হলো বান্দা ওরলি সি লিঙ্কের ওপর তোয়ালে পরে লুঙ্গি ড্যান্সই করি। কিংবা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার সামনে খালি গায়ে বারমুডা পরে গ্যাংনাম স্টাইল নাচলেই বা আটকাচ্ছে কে?

ফলে টিকিট কেটে সেই হপ্তার শুক্রবারই দুটো ট্রাউজার্স, একটা শার্ট, খান চারেক ব্লেণ্ডার্স প্রাইডের এক লিটারি বোতল, আর নরবলির ইতিহাসের ওপর খান দুয়েক বই বগলে, ''ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'' গাইতে গাইতে দমদম এয়ারপোর্টে যখন পায়ের ধুলো দিলুম, তখন মনের মধ্যে যে বিচিত্র রংবাহারি প্রজাপতি উড়ছিলো সে না বললেও চলে। আনন্দের আরও কারণ ছিলো যে সেলস সাপোর্ট ছেড়ে সেলসে ফিরে আসতে পেরেছি। আরে মশাই, আমি বলে কিনা উদ্বাস্তু বাঙাল, হাওড়ার মাঠেঘাটে নালানর্দমায় ফুটবল লাথিয়ে আর মারপিট করে মানুষ, কোট টাই পরে অফিসে বসে বাবুয়ানি কি আমার পোষায় , অ্যাঁ? আপনারাই পষ্ট করে বলুন দিকিন!

সে যাই হোক, নেমে হোটেলে ঢুকেই জলদগম্ভীর গলায় এরিয়া ম্যানেজারদের একপ্রস্থ খোঁজখবর নিলুম। আমার সঙ্গে যে কোনওরকম ইয়েমস্তিটি চলবে না সেইটে আগে সমঝে দিতে হবেনি? ফলে দুচারজনকে বজ্রকঠিন গলায় দুচারটে ধমকটমক দিয়ে মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে, শরীরে বেশ চনমনে ফীল করছি, এমন সময়ে স্থানীয় ম্যানেজারটি খুবই ভব্যসভ্য গলায় জিগাইলেন, ' বস কি কাল মার্কেটে যাবেন?'

অন্য সময় হলে কাটিয়ে দিতাম, কারণ শনিবারে রিজিওনাল ম্যানেজার মার্কেট গেলে সেলসঠাকুর পাপ দেন, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু এলাকায় আমি লতুন, নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বাঁধার আগেই আমাকে ঝাঁকে ঢুকে পড়তে হবে, ফলে বীরদর্পে বল্লুম, 'ঠিক হ্যায়, লেটস ডু সাউথ ক্যালকাটা টুমরো'।

পরের দিন তো সক্কাল সক্কাল মাঞ্জাটাঞ্জা মেরে একটা উদার হাসি বিলিয়ে মার্কেটে নামলুম। উদ্দেশ্য অবশ্য খুবই মহৎ, বুঝদার লোক মাত্রেই ঘাড় নেড়ে সায় দেবেন। লোকজনকে চমকে ধমকে বেশ খানিকটা ভয়টয় দেখিয়ে 'ওরে আমি এলাম, সম্মানটম্মান করিস বাপু। আর হ্যাঁ দেখিস ভাই, যেন টার্গেটের জন্যে আমাকে আবার গতর নাড়াতে না হয়। এমনিতেই বয়েস হয়েছে, আর ওজনের কথা তো কহতব্য নয়'...ইত্যাদি প্রভৃতি সমঝে আসবো। কিন্তু ও হরি! মার্কেটে নেমে দেখলাম দিব্যি চৌখস লোকজন, মার্কেটও তৈরি। ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরি করেও কোনও ইয়ে খুঁজে না পেয়ে মনটা ভারি উদাস উদাস ফীল হতে লাগলো, বুইলেন? বলি কাউকে কিচ্ছুটি বকাবকি না করে সোনামুখ করে বাড়ি ফিরে গেলে কেমন গা'টা ম্যাজম্যাজ করে না? অ্যাঁ?

ফলে শেষ আশ্রয় হিসেবে কাতরস্বরে বল্লুম, 'আর কোনও মার্কেট নেই কাছাকাছি?'

প্রশ্নটা শুনেই সেলস অফিসারটি দেখলাম তড়িৎগতিতে বললো, 'আছে তো স্যার, বারুইপুর মার্কেটে আজ কাজ হচ্ছে তো', কিন্তু তৎক্ষণাৎ ম্যানেজারের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো।

ব্যাস...ক্যাচ কট কট...ম্যানেজার বারণ করছে কেন? নিশ্চয়ই কিছু গোলমেলে কেস হ্যাজ। হুঁ হুঁ বাওয়া, বারো বচ্ছর হয়ে গেলো এই লাইনে রগড়াচ্ছি, হ্যাঁ করলেই হনুলুলু বুঝে যাই, চ্যাঁ করলেই চাইকোভস্কি, আমার সঙ্গে চালাকি পায়া হ্যায়? কম্বুর্ন্টে বল্লুম, ' ঠিক হ্যায়, লেটস গো টু বারুইপুর'।

এইবার দেখলাম বর্ষীয়ান এরিয়া ম্যানেজারটি এগিয়ে এলেন, 'বলছিলাম কি স্যার, গত মাসে ওখানেএকটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে, না গেলেই নয়?'

ব্যাস, আমার সন্দেহ একদম যাকে বলে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছ। লোচাটা গত মাসেই করেছে, তাই আমাকে যেতে দিতে এতো অনীহা। দৃঢ় গলায় বল্লুম যে 'না হে, আমি বারুইপুরেই যাবো, এক্ষুণি যাবো।'।

যেখানে ছিলাম যেখান থেকে বারুইপুর যেতে আধঘণ্টাটাক লাগে। আদর্শ মফস্বল বলতে যা বোঝায়, বারুইপুর ঠিক তাই। তবে শহর কলকাতার আগ্রাসী থাবা এতদূর এসে পৌঁছতেও ছাড়েনি। বিস্তীর্ণ পেয়ারাবাগান কেটে আস্তে আস্তে উঠছে দামী হাইরাইজ। মার্কেটের রাস্তায় সাইকেল আর ভ্যানগাড়িকে সচকিত করে বেরিয়ে যায় দামি মোটরসাইকেল আর চারচাকা।

মার্কেটে এসে গাড়ি থেকে নামতেই যে ভদ্রলোক সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, বুঝলাম যে তিনিই এই এলাকার স্টকিস্ট। মাঝারি উচ্চতার দোহারা ছিপছিপে চেহারা, উজ্জ্বল মেটে তামার রঙে গায়ের রঙ, বগলে একটা ছোট হাতলওয়ালা চামড়ার ব্যাগ, মুখে জর্দাপান চিবোনো এক অতি অমায়িক হাসি! নামতেই আস্তাজ্ঞে হোক, বস্তাজ্ঞে হোক ইত্যাদির পর্ব পেরিয়ে বল্লুম, 'মার্কেট দেখান দাদা'।

তা ঘন্টাদুয়েক ঘুরে দেখলাম এ মার্কেটও বেশ ভালোই। খুচখাচ যা ইস্যু আছে সে সসাগরা জম্বুদ্বীপে সর্বত্র ঘটে থাকে, আমরা বলি ইনফিল্ট্রেশন। মানে অন্য এলাকার স্টক (আমাদেরই) এই এলাকায় ঢোকা। সেসব আটকানোরও উপায় আছে। কিন্তু তাহলে আমাকে আসতে বারণ করছিলো কেন এরা? এমন কি ঘোটালা বা মিসহ্যাপ হয়েছিলো এখানে? হুমম, কেস জটিল লাগতা হ্যায়!

সে যাই হোক, মার্কেট দর্শনান্তে, ভদ্রলোকের সঙ্গে সদুপায়ে অশেষ ভবিষ্যিযুক্ত আলোচনার পর মনে হলো এবার কিছু পারিবারিক আলাপ পরিচয় করে (যা আমি করেই থাকি) কেটে পড়বো। ফলে আমি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলাম, ' বাড়িতে কে কে আছেন? ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার?'

অপাঙ্গে খেয়াল করলাম, এই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ম্যানেজার আর সেলস অফিসার, দুইজনেও যেন শিউড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। কেসটা বোঝার আগেই ডিস্ট্রিবিউটর ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে একটা পান মুখগহ্বরে দিয়ে, একটু জর্দা চিমটি দিয়ে ফেলে বললেন, ' আমি আর আমার বউ আছি।'

আমার মশাই অনুসন্ধিৎসা প্রায় পাড়ার খবরচালানি মাসিদের পর্যায়ে পড়ে, মুখে হাসিটা রেখেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলে? মেয়ে?'

নির্বিকার উত্তর এলো, 'একটা মেয়ে ছিলো স্যার। গত মাসে গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করেছে।'

আমি প্রস্তরবৎ স্থাণু! মানে? সুইসাইড করেছে ওঁর মেয়ে? আর সেই কথাটা এতো ক্যাজুয়ালি বলছেন? আড়চোখে তাকিয়ে দেখি বাকি দুইজনও ভাবলেশহীন মুখে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

এইটাই তাহলে সেই মিসহ্যাপ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, ' ক্কি, ক্কি করে? মানে হোয়াই?'

ভদ্রলোক আরেকটু জর্দা মুখে ফেলে বললেন, ' কি আর বলবো স্যার, অ্যাভ্রুজে পড়তো, পলিটিকাল সায়েন্স। পড়াশোনায় ভালো ছিলো স্যার, মাধ্যমিকে এলাকার মধ্যে হায়েস্ট মার্ক পেয়েছিলো।'

চিত্রার্পিতবৎ আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, 'তাহলে?'

'একটা ছেলের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার্স ছিলো স্যার, সে প্রায় অনেক দিনের। কয়েকদিন আগে জানা যায় যে ছেলেটি ভালো না, দশ জায়গায় বাইক নিয়ে ঘোরে আর মেয়েবাজি করে। আগে একবার বিয়েও করেছিলো, ডিভোর্স হয়ে যায়, সেটা আমার মেয়েকে বলেনি। মেয়েটা আমার খুব সোজা সরল ছিলো স্যার। শুনে খুব মুষড়ে পড়েছিলো। আমরা অনেক বুঝিয়েছি। আমি, ওর মা, ওর কাজিন বোনেরা। বলেছি এরকম তো হতেই পারে। ভাগ্যিস বিয়ের আগে জানা গেলো। নইলে কি কেলেঙ্কারি হতো বলতো?'

'তারপর?' নিজের গলা থেকে বেরোনো আওয়াজটাকে নিজেই চিনতে পারছিলাম না।

'মেয়েটা আমার হেব্বি বোকা ছিলো, বুঝলেন স্যার ', সেই একই নৈর্ব্যক্তিক সুরে বলে যেতে লাগলেন ভদ্রলোক, 'দুদিন কান্নাকাটি করলো, কিছু খেলো না। ব্যাপারটা ওকে হেভি ডিস্টার্ব করেছিলো বুঝলেন। তারপর তিনদিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।'

এরপরে আর কথা চলে না। একহাতে ভদ্রলোককে কাছে টেনে নিলাম, বুকে জড়িয়ে বললাম, 'সরি টু হিয়ার দ্যাট সাহেব। আগে জানলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। আমিও একজন সাতবছরর কন্যাসন্তানের বাবা। আপনার দুঃখটা কিছু হলেও...'

মূর্খ আমি, গেছি সদ্য সন্তানহারা পিতাকে সান্ত্বনা দিতে। ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন সেই ভরা বাজারের মধ্যে, যেন মুহূর্তের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে বেরিয়ে এলো শত ঝর্ণার জল, 'আপনার তো সাত বছরের মেয়ে স্যার, আমার একুশ বছরের মেয়ে, একটি মাত্র সন্তান। কত কষ্ট করে, কত ভালোবেসে, কত আদর করে মানুষ করেছি ওকে। সামান্য জ্বরজারি হলেও রাত জেগে থেকেছি স্যার, জানেন? আজ অবধি গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, বকাবকি অবধি করিনি। নিজে না খেয়ে মেয়ের জন্যে ভালো কলেজে ভর্তি করেছি স্যার, সবচেয়ে ভালো যা যা পারি তাই এনে দিয়েছি, শুধু ওর জন্যে। গলায় দড়ি দেওয়ার আগে একবার আমাদের কথাটা ভাবলি না মা?'

সমগ্র জগৎ যেন ক্ষণিকের জন্যে আমার সামনে চিত্রার্পিত হয়ে গেলো, আমরা তিনজন মাথা নিচু করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, স্থাণুবৎ!

পৃথিবীর তাবৎ রাজকন্যেরা শোনো। দিনকাল রূপকথার সময় থেকে অনেক বদলে গেছে। তোমরা প্রিন্স চার্মিং বা স্বপ্নের রাজপুত্র পেলে পেতেও পারো, নাও পেতে পারো। কিন্তু তোমার জন্যে একজন রাজা ভগবান নিশ্চিতভাবে পাঠিয়েই রেখেছেন। তোমার কিছুমাত্র হলে তিনি সম্পূর্ণ দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে আর বেঁচে থাকার কোনও উপায়ই থাকে না।

কিছু ভেবো, কিছু করার আগে একবার তাঁর কথাটা অন্তত কিছু ভেবো!

দাম্পত্য

গত মাস ছয়েক ধরে লেকটাউন এলাকায় কোন কাক বা চিল দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা প্রথমে মাস তিনেক আগে, এক ছুটির দিনে, খেয়াল করেন সুরেশচন্দ্র আগরওয়াল। শঙ্কিত স্বরে গিন্নীকে ডেকে বলেন, 'ডাভড়ি, লারল তিন হফতা হুঁ কোঈ কাগলোকো নি দিখিও'। জবাবে গিয়ারসি দেবি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তিনতলার ফ্ল্যাটের দিকে দেখিয়ে দেন। নতুন আসা বংগালি মোটেয়ার-লুগাই দুটিই যে এই অনর্থের কারণ, সেটাও জানাতে কসুর করেন না।

সুরেশচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রসওয়ার্ড পাজল করতে বসেন।

সুজন আর স্নিগ্ধার বিয়েটা হয়েছিল খুব ধুমধাম করেই। দুপক্ষের জ্যোতিষীরাই ঘাড় নেড়ে রায় দিয়েছিলেন যে এই বিয়ে রাজযোটক হতে বাধ্য। স্নিগ্ধার বাপের বাড়ি বলতে গেলে বেশ বড়লোক, দেওয়া-থোওয়াতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। মোটমাট দুজনের সংসার সুখের করে তুলতে কোনও পক্ষের চেষ্টাতেই কোন ত্রুটি ছিলো না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো বিধি শুধু বামই নয়, পুরো নন্দীগ্রামের সিপিএম।

প্রথম দিন থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেছিলো যে এই বিয়ের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। তেল এবং বেগুন, আদা এবং কাঁচকলা, সাপ এবং নেউল, এরা বরং একে ওপরের প্রতি অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল। নাইট বালবের রঙ থেকে শুরু করে পর্দার ডিজাইন, ননদের ছেলের স্কুলের খরচ দেওয়া থেকে রাত জেগে কোপা ফুটবল ম্যাচ দেখা, আগ্নেয়গিরির পারদ দিনে দিনে ক্রমেই উর্ধমুখী হয়ে উঠছিল।

সবাই আশঙ্কিত হয়ে ফাইনাল শো ডাউনের জন্যে অপেক্ষা করছিলই। তবে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। সবার সম্মিলিত আশঙ্কাকে সম্মান জানিয়ে বিয়ের মাস ছয়েক বাদেই সেই ডি ডে সগৌরবে উপস্থিত!

সেদিন ছিল স্নিগ্ধার বেস্ট ফ্রেন্ড অনুপমের বিয়ে। বিয়ে বউভাত মিলিয়ে ছবি ভিডিও তোলা হয়েছিল কম নয়। সেসব সেভ করার জন্য খুব সম্ভবত বাধ্য হয়েই স্নিগ্ধা সুজনের হার্ড ড্রাইভ থেকে এগারো বছর ধরে জমানো সাড়ে সাতশ জিবি র মুভি কালেকশন (সানি লিওনি থেকে সিটিজেন কেন, অ্যানিমেশন মুভিজের পুরো সেট) ডিলিট করে দেয়।

জবাবে সুজন বিশেষ কিছু করেনি। শুধু স্নিগ্ধার দুটো দামি বেনারসি পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানি লছমনকে কেটে লুঙ্গি করে পরার জন্য দিয়ে আসে।

এর পরে সংসার করা সত্যিই ভারি মুশকিল। সেইদিনই স্নিগ্ধা বাপের বাড়ি চলে আসে। আর মিউচুয়াল ডিভোর্স দিতে সুজনের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিলো না।

কিন্তু মাঝখান থেকে বাধ সাধলেন দুই মা। স্নিগ্ধার মা যতই হাপুস নয়নে বলুন,'মেয়েকে মানুষ করতে পারিনি দিদি,ক্ষমা করে দিন', সুজনের মা ততই বিব্রত হয়ে বলতে থাকেন 'আরে না না, বৌমা ঠিক বুঝতে পারেনি, বাচ্চা মেয়ে তো। ওটা কোন ব্যাপারই না। আর আমার ছেলেরও বাঁদুরে বুদ্ধি দেখুন, অমন দামি শাড়ি তুই লুঙ্গি করে পরতে বলে এলি?'

এইসব পর্ব পেরিয়ে, ম্যারেজ কাউন্সেলরের পরামর্শ মেনে দুজনকে ধরেবেঁধে তুলে দেওয়া হল জগন্নাথ এক্সপ্রেসে। দুটো দিন ওরা একত্তর কোথাও নিরিবিলিতে কাটিয়ে এলে কিছু হলেও হতে পারে এই আশায়।

ট্রেন ছাড়তেই স্নিগ্ধা সুজনের উল্টোদিকে এসে বসল। প্রথম থেকেই এই ''দুদিন গিয়ে কোথাও ঘুরে আয় না'' ন্যাকামিটায় ওর গা জ্বলছিল। এইভাবে বিয়ে বাঁচিয়ে এই হরিবল লোকটার সংগে থাকতে হবে? জঘন্য। ইরিটেটিং।

বিরক্তিসহ ও তাকিয়েছিল বাইরের দিকেই। সুজন একটা ছ'শ এম.এল স্প্রাইটের বোতলে আধাআধি ভদকা আর স্প্রাইট মিশিয়ে এনেছিল। সেটাই অল্প চুমুক দিতে দিতে কাঁটা সিরিজ পড়ছে এমন সময় পাশের কামরা থেকে এক মধ্যবয়স্ক দম্পতি সবেগে এসে ওদের পাশে বডি ফেললেন।

দুজনের মধ্যে যিনি মহিলা, সেই ফর্সা, পৃথুলা এবং পাঁচ ফুট উচ্চতার ষাট ছুঁইছুঁই সুন্দরী গিন্নীটি স্নিগ্ধার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন 'কিছু মনে করেন নি তো?'

সঙ্গী ষাটোর্ধ ভদ্রলোকটি গাত্রবর্ণে ঘোরকৃষ্ণ। দোহারা চেহারার মানুষটি উচ্চতায় ছফুটের সামান্য বেশীই হবেন। তিনি রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে কাঁচাপাকা গোঁফের ডগা নাচিয়ে বললেন, 'মনে করনের ত কিসুই দেহি না। আমরা হইলাম গিয়া বোনাফায়েড প্যাসেনযার। আমাগো সীট পাইয়া বইয়া পরসি। মনে করনের আসেডা কি হেতে?'

মহিলা একবার শ্যেনদৃষ্টিতে ভদ্রলোককে মেপে নেন। তারপরে মধুমাখা স্বরে কিঞ্চিৎ লঙ্কার ঝাঁজ মিশিয়ে বলে ওঠেন 'ওইভাবে হুড়যুদ্দ করতে করতে কারও গায়ের ওপর এসে পড়লে সরি বলতে হয়। তোমাকে ছোটবেলায় তোমার মা বাবা শেকায় নি?'

'হে হে, ওইরকম ফুডবল মার্কা বডি হইলে ত গরাইয়া যাইবই। উনি সবই বোযসেন। তোমারে আর কওন লাগবো না'।

বলেই ভদ্রলোক গিন্নির দিকে দৃকপাত না করে সুজনের পাশে বসে চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করেন 'কি খাইতাসেন? বাকার্ডি না স্মারনফ? হে হে। আমিও লইয়া আইসি, পেপসি দিয়া ওল্ড মঙ্ক , বোযলেন নি?'

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত স্থির গলায় বলেন 'নিজের গুনপনার পরিচয় দেবার আগে লোকে অন্তত নিজের নামটুকুন বলে। ওনার নাম জিগ্যেস করেচ? নাকি উটেই আগে ছোঁকছোঁক, ককন খুলে বসবে। আর পারিনা বাপু'।

ভদ্রলোক হঠাত খুব গম্ভীর হয়ে রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেন' মীট মিস্টার প্রশান ভট্টারিয়া। এক্স চিফ প্রোডাকশন ম্যানেযার অফ ভারত মেশিনারি। ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম শিবপুর বি ই কলেয। থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ আনপ্রিসিডেন্টেড এক্সাম্পল অফ.....'

'ওফফ, এই সুরু হল বুড়োর। এই ছিলুম, ওই ছিলুম। অমুক সায়েব আমার ইঞ্জিরি দেকে এই বলেচিলো, ওমুক কনফারেনে ওই পেয়েচিলুম। বাঙাল বিয়ে করে যে কি গোকখুরি করেচি মা যে কি বলি। একটা সাট্টিপিকেটের জন্যে এমন হাবাতে মার্কা হা পিত্যেশ কাউকে করতে দেকিনি বাপু'

'বলি বোঝবা কি কইর‍্যাব? তোমাগো ফেমিলিতে ল্যাখাপড়ার চল আসে নাকি কিসু? বউবাযারে দুইখান সোনার দোকান দুইডা বাদ দিয়া কি আসে কও দেহি? ভাইগুলা ত এক একডা খাডাশ। পয়সার গরমে ত্যাল ম্যাকম্যাক করে।'

'আহাহা.... ঢং দেকে বাঁচিনে বাপু। কি দেমাক কি দেমাক। বলি আমাদের ত নাকি কিচুই ছিলো না। তা কি দেকে নেংচে নেংচে এলে হ্যাংলার মতন?'

'দ্যাহ রমা, দ্যাট হ্যাপেনড বিকজ অফ আওয়ার প্যারেন্টস। বুল্টির বিয়ার গয়না গড়াইবার লগে আমার ছুডকাকা আমারে লইয়া তোমাগো দোকানে গেসিল। তা আমার রূপ (হালকা হাসি) দেইখ্যা আর ডিগ্রীখান শুইন্যা তোমার বাবার হ্যাসরপ্যাসর দেইখ্যাই তো হ্যা হ্যা হ্যা.....'

'ইসস ম্যাগো, আবার সেই বিচ্চিরি হাসিটা হাসচে দ্যাকো'

এই পর্যায়ে সুজন প্রায় হামলে পড়ে। হাত বাড়িয়ে বলে 'সুজন বসু, বাড়ি লেকটাউন। এরিয়া সেলস ম্যানেজার অফ হাইজিন অ্যান্ড কেয়ার কম্পানি। মীট মাই ওয়াইফ স্নিগ্ধা, ফ্রম যাদভপুর, মাস্টার্স ইন কম্প্যারেটিভ লিটারেচার। আর আমাদের প্লিজ তুমি করে বলুন। আপনারা বয়সে অনেক বড়'।

বৃদ্ধ উল্লসিত হয়ে ওঠেন 'বাহ বাহ, যাদবপুরের মাইয়া, মাস্টার্স করস, হ্যা হ্যা,... দেখলা গিন্নি, বাঙালগুলা কেমুন আউগাইয়া যাইতাসে'।

'তুমি থামো বাপু। তা বাছা, তোমাদের দেশগাঁ কোতায়? লেকটাউনতো হালে হয়েচে, জত্ত মেড়োগুলো আসর বসিয়েচে ওখানে। তা বাপু বাপ পিতেমোর ভিটেটি কোতায়?'

সুজন খুব কুণ্ঠিত স্বরে বলে 'বাঁকুড়া,' শুনেই প্রৌঢ়া একগাল হাসি হেসে বলেন 'সে তো আমাদেরও গাঁ তো ওদিকেই। বলি গাঁয়ের নামখানি কিচু জানা আচে?'

সুজনের গলা শুকিয়ে যায়। ওরা বাঁকুড়ার বাসিন্দা নামেই, গত পঞ্চাশ বছর ধরে ওরা কলকাতার লোক। গ্রামের নামটা মুখস্থই ছিলো, কিন্তু এঁদের দেখে মাথাটা পুরো ঘেঁটে গেছে, নামটা কিছুতেই মনে আসছে না।

ওদিকে ভদ্রলোক দিব্যি স্নিগ্ধার সংগে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে 'দ্যাশ যানি কোথায় কইলা ? বিক্রমপুর? হ্যা হ্যা, আমাগো ইয়ে ত কাসেই, সাভার। আহা হা হা। কত্ত যমি নদি পুহইর আসিল আমাগো। সে যদি একবার যাইতাম.....'

এতক্ষনে অরিন্দম কহিলা বিষাদে....

ভদ্রমহিলা বীরদর্পে এদিকে ফেরেন, মিষ্টিস্বরে হুল ফুটিয়ে বলেন 'বলি এইসপ গুল ঝেড়ে আর কদ্দিন চলবে বল দিকিন? জমি পুকুর ওবদি না হয় বুঝলুম, বলি নদী কি করে কারও সম্পত্তি হয় নাকি বাপু? আর সব্বারই তো শুনি ওদিকে নাকি গাদা গাদা জমিদারি ছিল। বলি বাংলাদেশে এত জমি আচে? নাকি ওদিকে এক ডেড় কাঠাতেই জমিদারি পাওয়া জেত? কি জানি বাপু, ইদিকে তো দু দশ খান গাঁ না হলে আমরা জমিদার বলে মানতেই চাইতুমনি। বলে সুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে নিঃশব্দে হাসতে থাকেন।

বৃদ্ধ ঈষৎ গরম হয়ে বলেন, 'দ্যাখো, দ্যাশ তুইল্যা কথা কইবা না। জানো আমরা কত কষ্ট কইর‍্যাঈ...'

কথা শেষ হতে দেন না বৃদ্ধা, কলকল করে ওঠেন 'ওনার কতা একবর্ণ বিশ্বেস কোরনি বাপু। বুড়ো জন্মেচে এদিকে, সাতচল্লিশের পরেই। ওপার থেকে এদেসে এসেচিলেন আমার শ্বশুরমসাই, ছিলেন ইসকুল মাসটার। আহা, অমন লোক আর হবে না বাবা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য মানুষ। আর আমার ছিলেন আমার শাশুড়ি, সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা। যা কষ্ট ওনারা করেচেন। এনারা তো ওই যা হোক করে ডিগ্রী বাগিয়ে এক একজন হনু হয়েচেন, সে উনি, আমার দ্যাওর, ননদ সব এককেজন সেয়ানা নাম্বার ওয়ান....'

–'দ্যাহো রমা, এইসব ইন্টারনাল কথা এদিক ওদিক কওন ঠিক না।'

'আহা হা হা হা। মুচ্ছো যাই আর কি। নকশা দেকে বাঁচিনে। নেহাৎ আমার সহজ সরল বাপ ডিগ্রী দেকে...'

'হ্যা হ্যা হ্যা। হেইডাই তো হইল কথা। বোযলা মা, ডিগ্রী। হ্যান্ডসাম তো সিলামই, হে হে হে ('মরণ, বুড়োর আদিক্যেতা দ্যাকো') তারপর বোযলা কিনা, এয়াগো ফ্যামিলিতে তো ল্যাখাপড়ার তেমুন চল নাই ('মাজে মাজে ইচ্চে করে বুড়োর মুকে নুড়ো জ্বেলে দিই'), তা শ্বশুরমশয় আমার হাত ধইর‍্যা কইলেন, ''দ্যাহো প্রশান্ত, আমার মাইয়াডা তে মানুষ হয় নাই''...

'দ্যাকো, অনেক্কন ধরে সুনচি এসব। এরপর কিন্তু টিটি ডেকে টেরেন থেকে নামিয়ে দেবো, সত্যি বলচি'।

এতক্ষণে স্নিগ্ধা এদের খুনসুটি উপভোগ করতে শুরু করেছিল। ওর মনের গভীরে জমে থাকা মালিন্য কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। এই বুড়োবুড়ির কথাকাটাকাটির গভীরে কোথাও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটা ভালোবাসার চোরাটানও আছে। হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

সুজন জিজ্ঞেস করে 'আপনারা কি কোনও কাজে যাচ্ছেন ? নাকি এমনি, আমাদেরই মতন ছুটি কাটাতে?'

ছুটি কাটানোর কথা শুনে স্নিগ্ধা একবার ওর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে নেয়। কিছু বলে না।

'সে আমরা বচ্ছরে দুইবার শ্রীক্ষেত্রে আসি বাপু। বাবা জগন্নাথের পেসাদ নিয়ে ঘরে ফিরি'

-'এইগুলা এক একখান হোক্স, বোযলা। এইসব পূযাফুযা সব ফালতু। লোক ঠকানের কায়দা আর কি। ছুডবেলা থেইক্যা দেখতাসি....'

-'দেখো, ঠাকুর দেবতা নিয়ে বাজে কতা একদম বলবে না। বামুনের ছেলে, সান্ধ্যাহ্নিক টুকু করো না, বাসি কাপড়ে খেতে বস, পইতে দিয়ে মশারির দড়ি করেচ। কি ভাবচো, এসব উনি দেকেন না?'

-'তা আমারডা ছাড়ান দাও। তোমারটা তো দ্যাহেন। তা হেইডা দিয়া রুপুর ভালো কিছু হইলো নাকি?'

হঠাৎ দুজনেই চুপ করে যান। ভদ্রমহিলা মাথা নিচু করে বসে থাকেন। ট্রেন তখন খড়গপুর পৌঁছেছে। ভদ্রলোক শশব্যস্ত হয়ে 'খাওনের লগে কিসু পাওয়া যায় কি না দেহি' বলে দরজার দিকে এগিয়ে যান।

স্নিগ্ধা এসে সুজনের পাশে এসে বসে, কেন জানি না গা'টা একটু শিরশির করছিলো ওর। ইচ্ছে করছিলো এদিকে এসে বসতে।

ট্রেন খড়গপুর ছাড়ালে প্রশান্তবাবু এক চাঙারি কচুরি আলুরদম আর চারটে ডিমসিদ্ধ নিয়ে ফিরে আসেন। প্রসন্ন মুখে বলে 'খাইয়া দ্যাহ। হে হে হে। অম্রেতো, বোযলা, অম্রেতো। লিপিড প্রোফাইলের কথাডা ভুইল্যা যাও।'

সুজন মৃদু আপত্তি করে। 'আহা আপনি আবার কেন এত কষ্ট করে....'

ভদ্রলোক দাবড়ে দেন, 'আরে খাইয়া দ্যাহো। বড় বড় শেফেদের এয়াদের কাস থেইক্যা কসুরি বানানো শেখন লাগে।'

সবাই সেই মুহূর্তে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে চাঙারির ওপর।

স্নিগ্ধা আর সুজন একই চাঙারি থেকে কচুরি খেতে থাকে। হাতে হাত ঠেকে যায়, কাঁধে কাঁধ, আঙুলে আঙুল।

ওদিকে খেতে খেতে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা একবার আড়চোখে কর্তাটির দিকে তাকিয়ে নেন,

-'তেলেভাজা আর ডিম খাচ্চ খাও। কিন্তু বেসি বাড়াবাড়ি যদি দেকিচি, তক্ষুনি কিন্তু সরিৎ ডাকতারকে ডেকে সুদু গলা ভাত খাওয়াবো, বলে রাকলুম'।

-'হেইডাই দিও, সংগে যদি এক চামচ মরিচ বাটা, কসুর লতির তরকারি আর গিমা শাগের বড়া ভাইজ্যা দাও গিন্নি, দুইখান চুমা এহনই দিতে পারি হে হে হে'।

বৃদ্ধা মুহূর্তে রাঙিয়ে ওঠেন, 'নোলা দ্যাকো বুড়োর। আর কতাবাত্রার কি ছিরি। মুকের কোন আড় নেই '।

সুজন হেসে ফ্যালে। স্নিগ্ধা সামান্য অপ্রস্তুত হয়। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে ওঠে 'ওঁর বুঝি ওসব খাওয়া বারণ?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে মুখ খোলেন বৃদ্ধা, 'তিন তিন বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গ্যাচে ওনার। শেষ বার তো যমের মুক থেকে সরিৎ ডাক্তার একাই টেনে এনেচিল। টানা একমাস হাসপাতালেই সংসার গুচিয়ে বসেছিলুম,' বলেই হাত জোড় করে প্রণাম ঠোকেন উনি, ভগবান না ডাক্তারবাবু, কার উদ্দেশ্যে সেটা বোঝা যায় না অবশ্য।

তবে তার পরেই তাঁর গলায় আগুন ঝরে পড়ে,'তাও কি বুড়োর হুঁস বলে আচে কিচু? ছাইপাঁশ গেলা কি কিচু কমতি আচে? আবার অমন দেবতুল্য ডাক্তারকে বলে কি না, ''রেগুলার কাস্টমারদের কিছু ডিস্কাউন দেবেন না?'' কী বলবো বাছা, কিচুই না পেয়ে শেষে একমুঠো নজেন আর ডাক্তারবাবুর একটা নতুন পেস্কিপশন লেকার খাতা তুলে এনেচেন উনি, বচ্ছরকার বাজারের হিসেব রাকার জন্যে। কি বেয়াক্কেলে লোক ভাই কি বলবো, হাড় মাস কালি করে দিলে এক্কেবারে'

-'হ, নিযের কথাডা কও। হাডু দুইখান তো পুরাই ইন্ডিয়ার ইকনমি, খালি ন্যাতাইয়া ন্যাতাইয়া পড়ে। ডাইন চক্ষুখান তো গ্যাসেই। আমি কই কি একখান কালো কাপড় বাইন্ধা রাখো, পুরাই পাইরেট লাগবো'অনে, পাইরেট অব ক্যারিবিয়ার মত পাইরেট অফ বাগবাজারিয়া। পার্ফেক্ট অ্যাটায়ার ফর ইউ। হে হে হে হে। বোযলা মা, আমারে ভালোমানুষ দেইখ্যা একখান ডিফেক্টিভ বউ হ্যান্ডওভার কইর‍্যা। দিসিল..'

ভদ্রমহিলা তেড়েফুঁড়ে ওঠেন। 'এই নিয়েই তো চল্লিশটা বচ্ছর তোমাদের বাঙাল ফ্যামিলির সেবাযত্ন করে গেলুম। বলি তোমার ননদ দ্যাওরদের মানুষ করলো কে? কোন খেয়ালটা রাকতে শুনি? নিজের বোনের বিয়ের দিন বরের ছোটমামাকে বলনি 'বিয়া ত দিতাসেন, পোলায় গবর্মেন্টের অফিসার, চুরিচামারির অভ্যেস নাই তো?', বলি এসব ঝামেলা কে সামলায়? আমার দ্যাওরের আশি বছরের বিধবা শাশুড়ি ঠাকুমাকে তুমি সর্দি হয়েচে সুনে গরম জলে রাম না হুইস্কি গুলে খাওয়াওনি? ছি ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি'।

ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, 'আহা, অর লগেদুইখান তুলসিপাতাও ত দিসিলাম গ্লাসের উপর'।

-'দ্যাকো, একদম মাতা গরম করাবে না।'

-'হে হে গিন্নি, রাগ কর ক্যান। তুমি ছিলা বইল্যাই ত বাইচ্যা আসি। কই কি তিরিশ বচ্ছর তো হইয়াই গ্যালো। ন্যাক্সট সাত জনমের লাইগ্যা তো উপরওয়ালার কাসে তোমার নামখান লেইখ্যা ডিমান্ড ইন্ডেন্ট যমা দিয়াই রাখসি। এহন দ্যাখার কে আগে উপরে গিয়া ইন্ডেন্টখান ফাইল করে। হ্যা হ্যা হ্যা। মনে হয় আমার চান্সডাই বেশি। কি কও?'

-'যত্তসব অলুক্ষুনে কতা'

স্নিগ্ধা সুজনের পাশে ঘনিয়ে আসে। 'আপনাদের ছেলে মেয়ে?'

-'তার কথা কইও না মা। কুলাঙ্গার। একখান শিক্ষিত হামবাগ'

-'দ্যাকো, যেকানে সেকানে নিন্দে করবে না রুপুর। হিরের টুকরো ছেলে আমার'।

-'করুম, হাযার বার করুম। হিরা নয়, কয়লা।'

সুজন খুব ইতস্তত ভাবে জিজ্ঞেস করে 'কি করেন উনি'।

বৃদ্ধার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে' ও তো খুউপ ভালো ছেলে বাবা। খড়গপুর আই আই টি থেকে খুব ভালো পাসটাস করে এখন অ্যামেরিকা তে আচে। বুজলে, ওকানেই মাস্টার করে, ডাক্তার হয়ে রিসাচ করে'।

-'ট্রেইটর। কুইসলিং। লাস্ট টেন ইয়ার্স দ্যাশে আয় নাই। মায়-বাপেরে দ্যাহনের কুনো ইসস্যাই নাই। হি ইস টু বিযি টু টক টু হিস পেরেন্টস ইভেন ওয়ান্স ইন আ মান্থ। এক বোচা নাক জাপানিরে বিয়া কইর্যা বাসসা কাসসা লইয়া ভালই আসে। আমাগো কথা মনেই পড়ে না।'

-'আহা। ওদের কত কাজ বল দিকিন। রাতদিন খাটাখাটনি...'

-'তাহইলে কালও ''অরে কতদিন দেহিনা ''বইল্যা কান্দতাসিলা ক্যান?'

বৃদ্ধা চুপ করে যান।

বয়স্ক লোকটি উঠে ট্রাভেল ব্যাগ থেকে একটা চাদর বার করে স্ত্রীর গায়ে জড়িয়ে দেন। 'ঠান্ডা লাগাইয়ো না'।

স্নিগ্ধা কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে 'ওনার বুঝি ঠান্ডার ধাত?'

'হ, তবে কিনা আমার অ্যাকশনটা হইল গিয়া পুরাই সেল্ফিশ, বোঝলা না? বুড়ি কাল মইর‍্যাধ গ্যালে এই বুড়াডারে দেখবো কেডা? হ্যা হ্যা হ্যা'

বৃদ্ধা কপট রাগত দৃষ্টিতে তাকান। তারপর কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করেন 'ওসুদের ব্যাগটা কই? এখন তোমার দুটো ট্যাবলেট খাওয়ার কতা না?'

-'রাখসিলা কই?'

-'কেন? তোমার ওই নীল হাতব্যাগটার মদ্দ্যে। সেটা কোতায়?'

বৃদ্ধ উদাস মুখে বসে থাকেন।

-'কতা কানে জাচ্চে না?'

-'যাইব কই? হোটেলে গিয়া খুইজ্যা দেখুম'অনে'।

-'পথে এসো। ব্যাগটাতো পাসের বারির বান্টিকে ফুটবল খেলার জন্যে দিয়ে এসচিলে। ভাগ্যিস ওর মা এসে নিয়ে গেসলো। এই নাও। এখন মুখটা খোল দিকিন। এই যে, হ্যাঁ......'

পরম মমতায় উনি চল্লিশ বছরের সুখ দুঃখের সাথী ভদ্রলোকটির মুখে ট্যাবলেট দিয়ে জল ঢেলে দিতে থাকেন।

সেইদিন রাতে, সুজনের বুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করে 'বিয়ে করলেই খুব ঝগড়া হয়, না?'

সুজন আধো ঘুমে বলে 'হুঁ'।

-'ঝগড়া করাটা কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট?'

-'হ্যাঁ'

-'হ্যাঁ?'

-'হ্যাঁ। তবে কি না আরও ইম্পর্ট্যান্ট হল ঝগড়া করতে করতে এক সঙ্গে বুড়ো হওয়াটা।'

স্নিগ্ধা হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাত করে সুজনের ঠোঁট ওর ঠোঁটের ওপর নেমে আসায় আর কিছুই বলে উঠতে পারে না ও।

তখন অবশ্য বেশি কিছু বলার কথা ওর মনেও ছিলো না।

আর মনে থাকলেও তখন তাতে কিছু এসে যায় না।

মার্কেট ভিজিট ১৫

গেসলুম আদিত্যদা'র কাছে! কি বললেন? কোন আদিত্য? ইক্কিরে বাওয়া, চিনলেন না? আরে আদিত্যদা, ইউপি''র সিএম, আরে আমাদের যোগীজী!

মানে?

এই দ্যাখো, ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আরে ঘাবড়াবেন না মশাই। মানে আর কিছুই না, সামান্য এয়ার্কি কচ্ছিলুম আর কি! আমি গোরখপুর গেসলুম মার্কেট ভিজিটে, তাই একটু...আরে এই দ্যাখো, তেড়েমেড়ে আসছে কেন লোকজন? আরে উনি যে খুবই ভালোমানুষ সে কি আর জানি নে? মুক্তকন্ঠে স্বীকার করি সে কথা। যেমন সাহস, তেমন তেজোময় মূর্তি, তেমনই জ্বালাময়ী ভাষণ! আর কি প্রশস্ত ললাট, কি অম্লানকুসুম হাসি, কি চিকনিচামেলী গাল, এককথায় কি উচ্চবংশ, ক্কি উচ্চবংশ!

দাঁড়ান, ব্যাপারটা খুলে বলি।

সদ্য যে কম্পানিটি আমার আর আমার বউ বাচ্চার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিয়েছে, তারা ভালোবেসে নিভৃতে যতনে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ইস্ট ইউপিও জুড়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য মিনমিন করে বলার চেষ্টা করছিলুম, 'হাম প্রচণ্ড দুবলা হ্যায় স্যার, তাকাকে দেখিয়ে, গাল দুখানা শুকাকে আমসি হো গ্যায়া হ্যায়। উসকে উপর আমার আবার প্রচণ্ড ভূতের ভয় স্যার, আর ইউপির গোভূতগুলো যে কি জঘন্য হোতা হ্যায় স্যার যে কেয়া বোলেগা, তাড়া করনে সে দৌড়তে দৌড়তে আমার ঠ্যাং খুল যায়েগা স্যার' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভবী তো আমার এইসব নানা প্রকারে কাতর আর্তনাদে ভুললেনই না। তার উপর ভাইস প্রেসিডেন্ট লোকটা মশাই দেখলুম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ভাইসে ভর্তি! খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে পেটে একটা খোঁচা মেরে বললো, 'ওহে কুমড়োপটাশ, সামান্য দৌড়াদৌড়ি করলে আখেরে তোমার ভালোই হবে হে। বডিখান যা বানিয়েছো বাপু, বলি একটা আয়নায় আঁটে?'

ইনসাল্টিং না? আপনারাই বলুন।

অবশ্য পরে ভেবে দেখলুম প্রস্তাব খারাপ না। ইস্ট ইউপি বলতে লাখনৌ থেকে বেনারস আর বালিয়া পজ্জন্ত আর কি! আমিও শুনেটুনে আর আপত্তি করিনি। কম্পানি বলছে লাখনৌ থেকে বেনারস, আমি শুনছি গলৌটি কাবাব থেকে রাবড়ি! বস দেখাচ্ছে বেহরৌচ থেকে সিদ্ধার্থনগর হয়ে গোরখপুর, আমি ম্যাপে পষ্ট দেখছি আঙুল সামান্য এদিকওদিক হলেই কপিলাবস্তু থেকে লুম্বিনী হয়ে কুশীনগর ! যাদৃশী ভাবনার্যস্য ইত্যাদি প্রভৃতি!

যাক গে। আমিও ভেবেছি গরমটা একটু কমুক, বিষ্টিটিষ্টি একটু পড়ুক, হাসি হাসি মুখে একদিন না হয় এলাহাবাদ বা বেনারসে বডি ফেলবো হপ্তাখানেকের জন্যে। আহা আমার মতন প্রতিভার সঙ্গ কি এক হপ্তার কমে কেউ পেতে চায়, বলুন? একটা ''এয়ার'' নিয়ে ফ্লাইট থেকে নামবো, লোকজন গাড়িফারি হাজির থাকবে, সামান্য মার্কেট ভিজিট, তারপর চন্নামেত্তর মতন চাট্টি উপদেশ ছিটিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরে রাজকীয় অভ্যর্থনা, আর কি চাই? অবস্থাগতিকে সন্ধেবেলায় মিটিং, হোটেলরুমেই অবিশ্যি.. চাইতেই কোল্ড ড্রিঙ্কস, না চাইতেই.... হেঁ হেঁ সেসব বোঝেনই তো!

কিন্তু ও হরি, ম্যান প্রপোজেস, ভাইগ্য ডিজপোজেস বলে ঈশপ ফেবলস না রসময় গুপ্তের কাব্যসঙ্কলনে একটা কথা আছে না? হাতেনাতে ফলে গেলো মশাই!

গোরখপুরের আমাদের একটি ডিস্ট্রিবিউটর আছেন, যিনি কিঞ্চিৎ বাহুবলী বলে বাজারে দুর্নাম আছে। এসব অবিশ্যি ওদিকে জলভাত, লোকে দুচারটে খুন করাকে গৌরবজনক বলেই মনে করে। বেয়াইমশাই চারটে

খুন করেছেন, আর উনি নিজে মাত্তর দুটো, এ দুর্নাম ঘোচাবার জন্যে মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ের আগে নিজের "ওজন" বাড়াতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নেহাৎ বাধ্য হয়েই, আরও দুটো খুন করেছে এসব স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা ('চারগো হাম ভি কিয়ে হ্যাঁয়, হাম কিসিসে কম হ্যায় কা রে বাবুয়া?')। কলকাতায় যেমন মিষ্টির দোকান, ইউপি বড় বড় শহরে তেমন বন্দুকের দোকান। আর শুধু কি "দম্বুক"? ওয়ান শটার, তামাঞ্চা, দেসি কাট্টা, রামপুরিয়া ... ভ্যারাইটি আর অ্যাসর্টমেন্ট দেখলে চোখ টেরিয়ে যাবে মশাই! আর দুচারটে নীচু জাতের দোসাদ, চামার বা কুর্মি মারলে ওখানে ওসব তেমন দোষের বলে ধরা হয় না, 'অ্যাঃ, টিকটিকি' বলে কাটিয়ে দেয়।

তা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটরটি বছরখানেক বেগড়বাঁই করছেন খুবই। বাহুবলী বলে কেউ বিশেষ কিছু বলতেও সাহস পায় না। আরে মশাই, যে লোকটা দশ বছর আগে গোরখপুরে দশ হাজার টাকা দিয়ে পানের দোকান খুলেছিলো, আজ সে আড়াইশো কোটি টাকার সাম্রাজ্যের মালিক, তার কুছ তো ইজ্জত করো গে কে নেহি, হাঁয়?

তা গত মাসে বাবুর ষাট লাখ টাকা টার্গেট ছিলো। তিনি বলে পাঠালেন যে তিনি পাঁচ লাখের বেশি করবেন না, তাঁর নাকি মুড নেই! তাতে আমি সবিনয়পূর্বক ফোন তুলে বল্লুম যে যেহেতু আমার বাবা এই ব্যবসায় নেই, তাই তাঁর পক্ষে বাকি পঞ্চান্ন লাখের ভরপাই করা তো সম্ভব হবে না রে ভাই! তোর মুড নেই শুনে দুঃখ পেয়েছি খুবই। তবে কিনা বড় মানুষের মুড, পালিয়ে আর যাবে কোথায়, কাছেপিঠেই আছে কোথাও। তাকে একটু খুঁজেপেতে এনে অর্ডারটা দিতে হচ্চে যে কত্তা!

তাতে উনি বললেন যে এভাবে কাজ করতে উনি অভ্যস্ত নন। আমি মশাই পোচ্চণ্ড বিনয়ী ম্যান, তাঁর অভ্যেসের সবিশেষ প্রশংসা করে বল্লুম তাহলে আর কি, পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই, ব্যবসা আমি অন্যত্র লইয়া যাই!

দুদিন পরে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে আমারই সেলস টিমের আর্তনাদ ভেসে এলো, সে বাবু নাকি পিস্তলটিস্তল দেখিয়ে আমার ছেলেছোকরাদের সামান্য চমকেছেন। এখানে স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে পিস্তল জিনিসটা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী, ওতে অজ্ঞান নাশ হয়, শুভবুদ্ধির উদয় ঘটে, পিত্ত থেকে চিত্তবিকার অবধি ক্যুইক সেরে যায়, আর দ্রুত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপারে তো লাজবাব! কিন্তু আমি মাইরি সেলসটিমগতপ্রাণাং, তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং, মানে বাংলায় বলতে গেলে তাদের কান্নাকাটি মোটে সইতে পারিনে। ফলে দিন চারেক আগের এক দুপুরবেলা "পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস" নামের একটি অতি খাজা ট্রেনে চড়ে বসতে বাধ্য হলাম।

পুর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস একটি অতি বেয়াক্কেলে ট্রেন মশাই, এই বারণ করে দিলুম, ঘুণাক্ষরেও চড়বেন না। একে প্যান্ট্রি নাই, তার ওপর যেমন জঘন্য সার্ভিস, তেমনই নোংরা টয়লেট! সে যাই হোক, অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, গোরখপুর পৌঁছে, সেই মহামহিম বাহুবলীটির সঙ্গে মিটিং করে, তারই কথার জালে তাকে পেড়ে ফেলে, তৎক্ষণাৎ তাকে স্যাক করে, পরের দিন একখান ইনোভা গাড়িতে বেনারস পৌঁছবো বলে উঠে পড়লুম। সে বেচারা বুঝলোই না কোথা হইতে কি হইয়া গেলো, দস্যু মোহন কি করিয়া যেন তাহারই টুপি তাহাকেই পরাইয়া গেলো!

বেনারস আমার প্রিয় শহর, এখানেই একবার নাম বিভ্রাটে আমার এক মর্মান্তিক দুঃখভোগ ঘটেছিলো (মার্কেট ভিজিট ৩ অবলোকন করহ), তদসত্বেও আমি এ শহরের চার্ম থেকে মুক্ত হতে পারিনি। কিছু কিছু শহর গেলেই আমার বড় আপন মনে হয়, যেমন পুনে, যেমন জলপাইগুড়ি, যেমন ভাইজ্যাগ, তেমনই বেনারস। কিন্তু এবার সময় বড় কম ছিলো, ঘন্টা ছয়েকের মধ্যে মার্কেট ভিজিট ও ডিস্ট্রিবিউটার্স মিট সেরে রাতে চড়ে বসলুম কলকাতাগামী একটি ট্রেনে।

আর সেখানেই তেনাকে দেখলুম।

রাতের ট্রেন। আমি দিব্য আমার প্যাকড ডিনার এবং ব্যাগপত্তর নিয়ে আমার লোয়ার বার্থের সিটটিতে বেশ আয়েশ করে বসেছি। খানিকক্ষণ বাদেই এক মোটাসোটা গোলগাল হাফপ্যান্ট পরিহিত, সোনালি রিমলেস চশমা পরিহিত, ফ্রেঞ্চকাট শোভিত এক ভদ্রলোক, তাঁরই সুন্দরী সুতনুকা স্ত্রী এবং সাক্ষাৎ তেনাকে সমভিব্যাহারে এসে আমার সামনের সিটটি অধিগ্রহণ করলেন!

তেনার হাইট চার ফুটের মতন, বয়েস পাঁচ বছর, পরনে মিষ্টি একটি বেবি পিঙ্ক ফ্রক, এবং একগাদা চুল মাথায় ঝুঁটি করে বাঁধা। তিনি এসেই প্যাসেজের মধ্যে দুদিকের দুটি লোহার হ্যাণ্ডেল পাকড়ে (যা বেয়ে লোক ওপরের বার্থে ওঠে) ঝুলতে লাগলেন। তাঁর মাতৃদেবী তাতে হাঁ হাঁ করে উঠলে তিনি সলজ্জ মুখে জবাব দিলেন 'ব্যায়াম কচ্চি তো'। বলাবাহুল্য, অমন ব্যায়ামে লোকজনের চলাচলের বিলক্ষণ অসুবিধা হচ্ছিলোই, ফলত তেনার মা তাঁর কান পাকড়ে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু হা হতোস্মি! তিনি মায়ের কোল থেকে নেমে ফের সেই প্যাসেজের মুখে দাঁড়িয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে যাতায়াতকারী সব্বার কাছে, 'টিকিট, টিকিট দিজিয়ে' বলে টিকিট দাবি করতে লাগলেন। যাত্রীরা ফিক করে হেসে তেনার গালে হাত দিয়ে একটি করে টিকেটের দাবি মিটিয়ে চলে যেতে লাগলেন। মাতৃদেবী হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এই শুরু হলো!'

বুঝলাম, একটি যন্ত্র ট্রেনে উঠিয়াছেন বটেক!

তা ট্রেন চলতে তিনি খানিকক্ষণ 'ও বাবা, বোর হচ্চি তো, ও মা, স্টোন পেপার সিজার খেলো না' বলে ঘ্যান ঘ্যান করে বুঝলেন যে সে লাইনে জুত হচ্ছে না।পিতৃদেব একটি ম্যাগাজিন বার করে ঘুমোতে লাগলেন, মাতৃদেবী চোখ বুঝে বোধহয় কিঞ্চিৎ জিরিয়ে নিয়ে লাগলেন, তাঁর ফুররফুৎ নাসিকাধ্বনিতে মালুম হলো তিনি এই ছুরি পাথরের জগতের মধ্যে আর নেই। তাতে কি এই ক্ষুদ্র লক্ষ্মীবাইটিকে আর থামানো যায় মশাই? তিনি খানিকক্ষণ আমার দিকে জুলজুল করে চেয়ে রইলেন, তারপর তারপর কথা নেই বার্তা নেই রীতিমতো দাঁত বার করে হঁ হঁ হঁ করে ভয় দেখাতে লাগলেন! আমিও তো 'আমি কি ডরাই সখী' বলে তেড়েমেড়ে দাঁত বার করে, দুই কানের পাশে দুই হাত নিয়ে গিয়ে বিচ্ছিরি ভাবে নাড়িয়ে খুবই ভয় দেখাতে লাগলুম। তিনি আমাকে বক দেখালেন, আমি তাঁকে কাক দেখালুম। তিনি ঘোৎ করলেন, আমি ঘুঁৎ করলুম। শেষে তিনি হেসে ফেলে দয়ার্দ ন্ট্রে বললেন, 'তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না, হিঁ.. ওই ভাবে আমার ভয় লাগে নাকি?' জিজ্ঞেস করলুম, 'তা তোমার কিসে ভয় লাগে?' তিনি খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন 'ভূতের সিনেমা, ইঞ্জেকশন আর পড়ার আন্টি'।

বলা বাহুল্য, এরপর অট্টহাস্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।

আমার মৃদুন্ট্রের মিষ্টালাপেই নাকি মুমূর্ষু রোগী রোগশয্যা থেকে উঠে বসে ট্রেকিং কিংবা তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে, অন্তত আমাদের ফ্যামিলিতে তো তেমনই প্রবাদ। বাকিদের ছেড়ে দিন, স্বয়ং আমার গিন্নি তো প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে তামা তুলসী হাতে এই বক্তব্যে সায় দেবেন! তা সেই অট্টহাস্যে ট্রেনটা সামান্য থরথর কেঁপে উঠে দ্বিগুণ জোরে ছুটতে লাগলো। তেনার বাবা মা দুজনেই জেগে উঠে খানিকক্ষণ থুম মেরে বসে রইলেন, তারপর সকাতরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে খুব দুষ্টুমি করছে, না?'

যার নিজের মেয়ের বয়েস আট, সে পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার অসীম অত্যাচারে ঠিক কতটা বিচলিত হতে পারে সে আপনারা জানেনই! আমি সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্লুম, 'কৈ, না তো!'

কিন্তু তিনি কোথায়?

খেয়াল হলো যে এরপর তিনি নেমে পরে একবার তাঁর বর্তমান সাম্রাজ্য, মানে সমস্ত কামরাটি সরেজমিনে তদন্ত করতে বেরিয়েছেন। শুধু কি তদন্ত? প্রত্যেককে ডেকে ডেকে 'হ্যাল্লো আঙ্কেল, হোয়াটস ইওর নেম? হ্যলো আন্টি হোয়াটস ইওর নেম? হোয়ের ডু ইউ স্টে, হুইচ স্কুল ইউ রিড ইন' ইত্যাদি বলে সবাকার তত্ত্বতালাশ নিয়ে সে প্রায় সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট খুলে ফেলেন আর কি। তার ওপর আরও অন্য এক রগড়। ঠিক আমাদের পাশে কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছিলেন এক ''এম্লেসাহিব'', মানে জনৈক বিধায়ক মহোদয়। তা

পৃথিবীর এই অংশে সমস্ত সরকারি বাবুলোগ, মানে আর্দালি ও চাপরাশি অবধি যা সমাদর পেয়ে থাকেন, তা সভ্য দুনিয়াতে বড় বড় ''অফসর''দের কপালে তা মুশকিলহি নেহি, একদম না মুমকিনভি হ্যায়। এই অল্পসাহিবটিও তিন চারজন পুলিশ প্রহরাবেষ্টিত হয়ে, খানচারেক মোসাহেব ও চামচা সমভিব্যাহারে রাজপাট জাঁকিয়ে বসেছিলেন প্রায়। অকস্মাৎ সেই রাজ্যপাটে ভদ্রমহোদয়ার ব্লিৎজক্রিগ! তিনি সপাট গিয়ে এল্পেসাহিবের প্রায় কোলে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াটস ইওর নেম?'

ভদ্রলোকের চোখ প্রায় গোলগোল হয়ে কপালে উঠে যাচ্ছিল আর কি! ওঁরই এলাকায় ওঁকে নামধাম জিজ্ঞেস করে, হ্যার ঘাড়ে কয়ডা মাথা! কিন্তু প্রশ্নকর্ত্রীর হাইট দেখে বুঝলেন কেসটা কি! তারপর দুজনে মিলে অনেকানেক ভব্য আলোচনান্তে, দুজনেই দুজনকে মাঝেমধ্যে কল করবেন এমন প্রতিশ্রুতি আদায় করে ইনি ফের নিজের রাজপাটে ফিরে এলেন।

কিন্তু চলে এলেই তো আর হলো না মশাই। সামান্য এন্টারটেইনমেন্ট না হলে রাজারাজড়াদের মনই বা উঠবে কি করে বলুন? এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই আমি। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় আমি একটি রহস্যোপন্যাসে ডুবে ছিলুম। তিনি খানিকক্ষণ আমাকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন, 'তোমাকে সামার হলিডেতে খুব হোমটাস্ক দিয়েছে, তাই না?'

দ্রুত একমত হয়ে পড়ি, তদুপরি মুখখানা খুবই কাঁদোকাঁদো করে রাখতে হয়, 'সে তো বটেই, একগাদা হোমটাস্ক, তার ওপরে প্রোজেক্ট ওয়ার্ক, তারও ওপরে একগাদা সামেশন আর সাবস্ট্রাকশন, আর আমাদের স্কুল টীচার কি স্ট্রিক্ট কি বলবো কি বলবো, ইয়া মোটা মোটা স্কেল দিয়ে....'আমার গলা থেকে হাহাকার ঝরে পড়ে। সেই আগত দুর্ভোগের চিন্তায় ব্যাকুল কান্নার শুনে পাথরও গলে যেতে বাধ্য, আর ভক্তের কান্নায় ভগবান দ্রবীভূত না হলে শাস্ত্র টাস্ত্র সব মিথ্যে , মুনি ঋষিরা সেইরকমই বলে গেছেন শুনেছি না? তেনারও চোখটা ছলছল করে এলো বোধহয়, আমার পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ম্যাথসটা না হয় আমি হেল্প করে দেবো, কেমন? আমাদের তো সামেশন শেখাচ্ছে এখন!'

এত বড় আশ্বাসের পরেও যে খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে যে না ওঠে স্বীকার করতেই হয় যে সে ব্যাটা এক্কেরে ঘোর পাষণ্ড বিভীষণ! ফলে বইটই বন্ধ করে হাঁটু মুড়ে সিটের ওপর গুছিয়ে বসতেই হলো, আলাপ পরিচয়টা সেরে ফেলি, এই ছিলো মতলব!

'তোমার নাম কি শুনি?

'মৌটুসি। তোমার নাম কিইইইই?'

'উমমম আমার নাম কুমড়োপটাশ বকবকম'।

'ইশশশশ, মিথ্যেবাদী। কুমড়োপটাশ কারও নাম হয় নাকি?'

'হয় হয় যানতি পারো না। আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো মৌটুসি?'

'আমি তো খিদিরপুরে থাকি। তুমি?'

দিব্য মজা লাগছিলো, বানিয়ে বানিয়ে বললাম, 'আমিও খিদিরপুরে থাকি, হুমহুম, তাই তো তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। তোমাদের বাড়িতে একটা বুদ্ধুভুতুম থাকে না?'

'ইসশশ, তুমি কি মিথ্যুক, কি মিথ্যুক গো! আমাদের ক্লাসের বিভানও এত মিথ্যে বলে না। তুমি তো হাওড়ায় থাকো'।

চমৎকৃত হই, সামনে স্বয়ং হারমাইওনি গ্র্যা ঞ্জার সশরীরে নাকি?, 'কি করে বুঝলে?'

'হি হি হি হি, তোমাকে কেমন হাওড়া হাওড়া দেখতে!'

স্তম্ভিত হওয়ার কিছু বাকি থাকে না আর, সত্যি বলেছে বলে খুশি হবো, নাকি রেসিস্ট কমেন্ট বলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ফেসবুকে স্টেটাস দেবো বুঝে উঠতে পারি না। ওদিক থেকে মহোদয়ার মাতৃদেবীর কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'ছি মামমাম, ওসব কি বাজে কথা? বারণ করেছি না ওরকম বলতে?'

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে বলি, 'না না ঠিক আছে, বাচ্চা তো, হেঁ হেঁ ', এই বলে ফের অটল ধৈর্যের সঙ্গে আলাপ জমাতে ব্রতী হই, 'আচ্ছা, তোমাদের স্কুলে কী কী পড়ায়?'

তিনি ভাবুক ও স্বপ্নালু চোখে অনেক্ষণ উর্ধনেত্র হয়ে থাকেন, তারপর ক্ষীণ স্বরে শুরু করেন, 'ম্যাথস, ইংলিশ, বেঙ্গলি, সায়েন্স...' এরপরে ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, তিনি গভীর চিন্তার সঙ্গে কর গুনতে থাকেন। আমারও মায়া হয়, আহা, এই বয়সে আর কত কিই বা শিখবে বলুন তো? সময় তো পড়ে আছেই সামনে,অত্ত তাড়াহুড়ো কিসের অ্যাঁ? অতএব অন্য প্রশ্নে যেতে হয়, 'তোমার বেস্ট ফ্রেণ্ড কে?'

'স্কুলে না বাড়িতে?'

তাই তো! এই বয়সে এসে যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু ঈর্ষাকাতর সহকর্মী আর কাঠিচালনায় বীরোত্তমকেশরী প্রতিবেশীদের, তখন ভুলেই যাই শিশু বয়সে আমারও কিছু বন্ধু ছিলো, তাদেরও আমরা স্কুলের বন্ধু আর পাড়ার বন্ধুতে ভাগ করতাম। তখন ছোট শরীরে বড় মন ছিলো, সর্বত্র বন্ধু খুঁজে পেতাম, আর এখন?

'আচ্ছা, দুটোই বলো'

'স্কুলে প্রেরণা আর সানা। আর সোসাইটিতে সানিয়া আর ফারহা। মল্লিকা আর ঈশানীও ফ্রেন্ড বটে, কিন্তু বেস্ট ফ্রেণ্ড না। মানে প্রেরণার মত বেস্ট ফ্রেণ্ড না। তবে আইশরইয়ার থেকে বেশি ফ্রেণ্ড। তবে ঈশানী যতটা ফ্রেণ্ড আইশরইয়া তার থেকে বেশি ফ্রেণ্ড। মল্লিকা আর সানিয়াকে তুমি সেম সেম ধরতে পারো। তবে সত্যি করে বলতে গেলে কিন্তু ফৌজিয়াও আবার গুড ফ্রেণ্ডসদের মধ্যে আছে, বুঝলে? ধরো আইশরইয়া আর মল্লিকার থেকে বেশি, কিন্তু ফারহার মতন অতটা নয়....'

ঈশ্বর পরম কারুণিক, বেশিক্ষণ এই ক্লাসিফিকেশন আর পেকিং অর্ডার শুনতে হলে মাইরি অজ্ঞান হয়ে যেতুম, জিএসটি বিলের সাবক্লজ বোঝা বরং এর থেকে ঢের সহজ। এর অর্ধেক মেহনতে শার্লক হোমসের নতুন সিরিজ বার করা যায়, হ্যারি পটার তিনবার নতুন করে লেখা যায়, গেম অফ থ্রোন্সের জি বাংলা ভার্শান বার করা যায় (টিরিয়ন ল্যানিস্টারের চরিত্রে রুদ্রনীল!)। আমি খানিকক্ষণ শিবনেত্র হয়ে তাকিয়েছিলুম, হাফ বোতল হুইস্কি সাবড়ে তার ওপর দু'পুরিয়া গাঁজা মারলে ওর থেকে বেশি হ্যাল হওয়া সম্ভব না। পরে ধাতস্থ হতে দেখি তিনি আমার কেনা চানাচুরের প্যাকেটটি খুলে খুবই মন দিয়ে সেটি সাফ করার চেষ্টায় আছেন। সেদিকে খুবই করুণ চোখে তাকাতে (স্প্রাইটে হাফ হাফ করে মিশিয়ে বাকার্ডি এনেছিলুম বটে। এখন বিনা চানাচুরে কি করে ... থাক এযাত্রা বোধহয় বাড়িতে গিয়েই...), তিনি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'তুমিও একটু খাবে নাকি? দেখো, খুব ঝাল কিন্তু'! এই বলে সামান্য প্রসাদ আমার হাতে দিলেন। আমিও বুভুক্ষুর মতন মায়ের প্রসাদ, যা পাওয়া যায় তাই ভালো, ভেবে গালে চালান করে দিলুম। তারপর আড়চোখে আরেকবার চাইতেই তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন 'খুব ঝাল বল্লুম যে, আবার চাইছো? তোমার মা বলেনি যে গ্রিডি হওয়া ভালো নয়?'

এরপর আরেকটু চানাচুর চায়, এমন সাহস কার? আমিই বা কোন বাহুবলী হে? হাত চাটতে চাটতে জুলজুল করে চেয়ে রইলাম, আর তিনি প্যাকেটটা শেষ করে হু হা করতে করতে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বোতল থেকে আধ বোতল জল সাবাড় করে দিলেন। আমি আর কি করি, অগত্যা হতাশ্বাস হয়ে ফের একেনবাবু খুলে বসেছি, (আহা, সুজন দাশগুপ্ত মহাশয়ের জয় হউক), তিনি দেখি ফের কাছে ঘেঁষে এলেন, 'তোমার আরও খেতে ইচ্ছে করছিলো, তাই না?'

ছোট্টবেলা থেকে শিখেছিলাম মিথ্যে বলা পাপ, তাই দ্রুত ঘাড় নাড়িয়ে সম্মত হলাম।

ও ম্মা, এইটে শোনামাত্র তিনি দেখি গুটিগুটি পায়ে গিয়ে তেনার মায়ের পাশ থেকে একটা এত্তবড় হলুদ রঙের প্যাকেট বার করলেন, মুখে সলজ্জ হাসি। ওটা কি রে? ত্তাই ব্বলো, একটা আস্ত পট্যাটো চিপসের প্যাকেট! এইটে না বার করে আপনি আমারই চানাচুর আমাকেই দয়াদাক্ষিণ্য করে দিয়ে.... কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর...

তিনি সন্তর্পণে প্যাকেটটা ছিঁড়লেন, যাতে আওয়াজ তেনার মায়ের কানে না যায়। তাঁর সেই চার্লস শোভরাজকে লজ্জা দেওয়া সূক্ষ্ম হাতের কাজ দেখে মালুম হয় যে একাজে তিনি রীতিমতো দক্ষ...শশশকরে অবশ্য আওয়াজও করলেন আমার মতন বুরবককে সতর্ক করার জন্যে ... তারপর ... তারপর... তারপর... ভাবতেও জিভে লাল গড়াচ্ছে.. লিখতেও এই পাতি কলমচির আঙুলগুলি শিহরিত হচ্ছে...তিনি একটি মাত্র চিপস তুলে, সেটি ভেঙে এক চতুর্থাংশ মাত্র আমার হাতে দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন যে, 'বেশি চিপস খেলে পেট ব্যাথা করে, তোমার মা তোমায় বলেনি?' এই বলে তিনি একমুঠো চিপস নিজের মুখের মধ্যে পুরে কড়মড় করে চিবোতে চিবোতে আমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইলেন। আমিও সমুদ্রশোষণকারী অগস্ত্যকে চামচে করে জল খেতে দেওয়া হয়েছে এমন মুখ করে আঙুল চেটেচুটে বসে রইলুম।

বল্লাম না, মায়ের প্রসাদ, যা পাওয়া যায় তাইই ভালো!

এরপর অনেক রাত হয়েছে, এই বিধায় আমি আমার সিটে বিছানা বিছোতে লাগলুম, এরপর খেয়ে দেয়ে শোবো এই অভিপ্রায়। আমার দেখাদেখি এঁর মা'ও তাঁদের বিছানা তৈরি করতে লাগলেন। তিনিও অবশ্য সোৎসাহে তাঁর মা'কে সেই পুণ্যকর্মে সহায়তা করতে লাগলেন। মাতৃদেবী যথারীতি বিস্তর বিরক্ত হচ্ছিলেন। এখন কাজ এবং আকাজের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কি পার্থক্য সেই নিয়ে ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ বলে একটা ভারী দামি কথা আছে। মুশকিল হচ্ছে যে বড়রা কথাটা একদম মানতে চান না।।ফলে তেনার পিঠে উপর্যুপরি দুইবার দুম দুম করে কার্পেট বম্বিং হওয়ার পর তিনি গম্ভীর মুখে যেন ডানকার্কের সেই বন্দর থেকে, 'গ্লোরিয়াস রিট্রিট' করে ফের আমার কাছে ফিরে এলেন।

তিনি গম্ভীর মুখে বসে আছেন দেখে সামান্য মায়া হলো। আরেকটু কাছে ঘেঁষে এলাম,

'তোমরা কোথায় গেছিলে মৌটুসি'।

'এলাহাবাদ', অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর, যা লোকে সচরাচর ক্ষিপ্ত হলেই দেয়।

'ইয়ে, ঘুরতে?' প্রশ্নটা করা সঙ্গত হলো কি না বুঝলাম না।

'আঙ্কলের বিয়ে'। নাহ, বুঝলাম, ন্যায়শাস্ত্রে যে বলে পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ, এই সেই ধূম! অবশ্য পিঠে দুম করে পড়লে...

'হুমম। তা মৌটুসি, তুমি ঘুরতে যেতে ভালোবাসো?

'হুঁ'।

'বাহ বাহ। তা এবার সামার হলিডেতে কোথাও ঘুরতে গেছিলে তোমার?'

'না। সামার তো শেষই হয়ে গেলো।'

যাক, মনোসিলেবলের গেরোটা কেটেছে। জয়কালী। হাত দিয়ে ঘাম মুছে অতি সন্তর্পণে পরের প্রশ্নে যাই।

'তা দুর্গাপুজোতে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'এইবার? দার্জিলিং ', এইবার খুশিতে মুখটা ঝলমল করে উঠলো, যেন সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় উড়ে গেলো একঝাঁক রঙীন প্রজাপতির দল। আহা, কে লিখেছিলেন গো, মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি? 'আমি, আমরা সবাই, আর সানিয়া আর ফারহা আর সানিয়া ফারহার পেরেন্টসরা, আর..'

'সে কি? তুমি দুর্গাপুজোতে কলকাতায় থাকবে না?' ছদ্মবিস্ময়ে বলি।

'না তো, আমরা প্রত্যেকবার কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাই। লাস্ট ইয়ার কেরালা গেছিলাম। পরের বছর কুলু মানালি যাবো। তাই না মা?' তিনি সমর্থন খোঁজার জন্যে ওদিকে ফেরেন।

'মৌ, আঙ্কলকে ঘুমোতে দাও এবার। অনেক বকবক করেছো, খাবে এসো, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো', মাতৃদেবীর কড়া নির্দেশ ভেসে আসে। দেখতে পাই ওদিকে ডিনার প্যাক খোলা হয়ে গেছে।

অগত্যা, তিনি গুটিগুটি পায়ে অগ্রসর হন, ফিসফিস করে বলেন, 'আচ্ছা, দুগগা ঠাকুরের দশটা হাত, আর কি বড় বড় চোখ, আমাদের হেডমিস্ট্রেসের মতন। তোমার ভয় করেনা?'

রাত দশটায় পাঁচ বছরের শিশুকে মা দুর্গার দশপ্রহরণধারণের তাত্ত্বিক ব্যাখা শোনানোটা নেহাৎ চাইল্ড অ্যাবিউজ হয়ে যাবে বলে নিজেকে শাসন করতে বাধ্য হই। খেয়েদেয়ে, পর্দাটা টেনে দিয়ে মোবাইলে ''অয়ি গিরিনন্দিনী'' শুনতে শুনতে গভীর ঘুম।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো দেরিতে, তাও তিনি আমার চুল ধরে টানছিলেন বলে। উঠেই দেখি কামরায় একটা ব্যস্ত হুড়োহুড়ির ভাব, সবাই তৈরি হচ্ছেন নামার জন্যে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ডানকুনি ক্রস করে যাচ্ছে ট্রেন, মানে আর আধঘণ্টার মধ্যে হাওড়া পৌঁছবো। তড়াক করে উঠে বেসিনে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে আসি। ফিরে এসে সিটে বসে জুতো পরছি, এমন সময় তিনি এলেন, এসেই চ্যালেঞ্জের সুরে, ' কাল তুমি আমাকে তো বললে না তুমি কোথায় থাকো?'

গালটা টিপে দিয়ে বলি, ' আমি লেকটাউনে থাকি মৌ। কেন তুমি কি আমাদের বাড়ি আসবে?'

খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তিনি কি ভাবেন, তারপর বলেন, 'আগে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, তারপর ভেবে দেখছি।' সেই গুরুগম্ভীর গিন্নিবান্নী হাবভাব দেখে এবার ফিক করে হেসে ফেলি, 'আচ্ছা তোমাদের বাড়ি কি করে যেতে হয় বলো, দেখি। আমি অ্যাড্রেসটা নোট করে নিই। বলো, ' বলে মিছিমিছি কিছু টাইপ করার ভঙ্গিতে মোবাইল বাগিয়ে ধরি। তিনিও বলতে থাকেন, 'লিখে নাও, ভালো নাম শবনম আখতার, ডাক নাম মৌটুসি, খিদিরপুর সেকেন্ড বাই লেন, বাড়ির নাম পার্ক প্যালেস, আর আমার নাম করলেই সব্বাই দেখিয়ে দেবে, না চিনলে বলবে মোগলি যাদের বাড়ি থাকে। ও তোমাকে মোগলির কথা কিছু বলিনি, না? মোগলি হচ্ছে আমাদের সোসাইটির সওওওবচেয়ে কিউট বেড়াল। লেজখানা তো দেখোনি, এই ইয়্যাত্তোবড়.....'

কোথাও কি সূক্ষ্ম কিছু ঘটে গেলো আমার মধ্যে? মানে নামটা শোনামাত্র কি এই নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ শিশুটির যে চারিত্রিক অবয়ব আমার চেতনায় ও ইন্দ্রিয়ে ছিলো, তাতে কি আমারই অবচেতন মন থেকে অনাবশ্যক কিছু রঙের ছিটে এসে পড়লো? কোথাও কি সামান্য হলে, অতি সামান্য হলেও একটা অস্বচ্ছন্দ দূরত্ব তৈরি হলো? মানে যদি সত্যিই এর নাম মৌটুসিই হতো, পদবী হতো মুখার্জি কি মণ্ডল ,নিদেনপক্ষে গঞ্জালভেস কি কউর, তাহলে কি আমার এই যে হঠাতই 'ও আচ্ছা, মেয়েটা মুসলিম?' চিন্তাটা মাথায় আসতো?

না, বোধহয় আসতো না। কোথায় যেন আমরা দুপক্ষই একে অন্যকে অন্যভাবে দেখাটা অভ্যেস করে ফেলেছি। এ দায় কার কে জানে!

জোর করে এই অস্বস্তিকর চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছি, এমন সময় আরেকটা চিন্তা মাথায় উদয় হলো, ও আচ্ছা, মুসলিম ফ্যামিলি। তাই দুর্গাপুজোয় কলকাতায় থাকে না, তাই মা দুর্গাকে দশ হাতে অত ভয়ঙ্কর লাগে তাই না?

এবং মুহূর্তের মধ্যেই বুকের ভেতরে বসে থাকা আদ্যন্ত মদ্যপ, খিস্তিবাজ, এবং কাউকে রেয়াত না করা কিঞ্চিৎ উদ্ধত লোকটা বলে উঠলো, 'বটে? তোমার মামাশ্বশুররা যে গুষ্টিসুদ্ধ ফিবছর পুজোতে বেড়াতে যায় তার বেলা? আর এর পদবী আখতার বলে বিচার করছো দুগগাঠাকুরকে কি বললো, বলি তোমার নিজের মেয়ে গত বছর ভদ্রমহিলাকে পলিগন বলে ডেকেছিলো, সে কথাটা মনে আছে?'

খানিকক্ষণ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিলাম। না হে, ভুলই করছিলাম বোধহয়, বুদ্ধিশুদ্ধি সোজা রাখা খুবই জরুরি, খারাপকে খারাপই বলতে হয়, কিন্তু ঘণ্টাকর্ণ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়।

এমন সব ভাবছি, এমন সময় তিনি খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে এসে কোলে উঠে বললেন, 'শোনো না, তুমি এলে সাতাশ তারিখে এসো কেমন? মানে ঈদের দিন এসো বুঝলে? অনেক রান্নাবান্না হবে তো, আর তুমি যা হ্যাংলা..হি হিহি...আর শোনো, তোমার সঙ্গে ফারহা সানিয়া মল্লিকা ঈশানী এদের সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ করিয়ে দেবো, কেমন? তোমারও অনেকগুলো নতুন ফ্রেণ্ড হয়ে যাবে, তাই না?'

এমন লাভজনক প্রস্তাবে একমত হবো না এমন পাষণ্ড এখনও হইনি, ফলে দ্রুত সম্মতি দিয়ে ফেলি। তারপর কি একটা মনে পড়ে যেতে ফিসিফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা মৌটুসি, তুমি ঈদে ঈদী কি নেবে?'

তিনি অপাঙ্গে মায়ের দিকে চেয়ে নেন, তারপর আরও ফিসফিস করে বলেন, 'অ্যানা আর এলসার দুটো ডল এনো কেমন?', বলেই চকাম করে একটা হামি খেয়ে ফেলেন! চোখ বুজে সেই হামি উপভোগ করতে থাকি, একটা মিষ্টি দুধেদাঁতের শিশুগন্ধ বুকের মধ্যে নরম অমাভুক জ্যোৎস্নার মতই ছেয়ে যায়। কচি গলায় কে যেন ভেতরে বলে ওঠে এক্সপেক্টোওওও পেট্রোনাম...

বলেছিলাম না, মায়ের প্রসাদ, যা পাওয়া যায় তাইই ভালো!

সেলেব্রিথ্রি

বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে যে বছর আমি ইঞ্জিনিয়ারিঙের ডিগ্রি অর্জন করি, সেটা ছিলো ২০০২। তার একবছর আগে জনৈক আট্টা এবং তাহার সহযোগীরা বোধহয় খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে দু-দুটি সস্তার প্লেন ঢুকিয়ে দিয়ে এই মরজগতের যাবতীয় জিহাদিদের চোখে দোসরা তারেক বিন জিয়াদ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তদুপরি হোপ এইট্টিসিক্স থেকে শুরু করে তারামায়ের পদাশ্রয়ী, 'ভোটে বাইরের লোক নিয়ে আসা আমাদের ঐতিহ্য'খ্যাত বীরবিপ্লবী শ্রীসুভাষও মৃদুমন্দ হাস্যধ্বনিসহ 'আহা, এহেন অসামান্য কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতুম' বলে এতদ্দেশীয় গুপ্তজিহাদিদের বিপুল হর্ষবর্ধন করছেন, এমন সময় আমরা, মানে কলেজে আমাদের ব্যাচের শচারেক ইঞ্জিনিয়ারিং এর লোকজন দেখলুম ভারি আতান্তরে পড়েছি!

আগে গোটা ব্যাচের আদ্ধেক চাকরি করতে যেত, আদ্ধেক যেত উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে। সেই বাজারে আদ্ধেক নয়, আমাদের মতন গুটিকতক শিকেয়-ছেঁড়া-চাকরি প্রাপ্তদের ছেড়ে, বেশিরভাগ ক্লাসমেটই দীর্ঘশ্বাস ফেলে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগমনে ব্রতী হয়। এইখানে বলে রাখা ভালো যে এইরকম ''উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগমনের'' ইচ্ছেঠাকুরুণ যে আমার মনেও বাসা বাঁধেননি তা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার দৃঢ় ধারণা ছিলো আমার ফাইনাল মার্কশিট দেখে বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যে বিপুল হাস্যরোল উঠবে, সেই কলতরঙ্গ যদি কোনক্রমে গঙ্গা পেরিয়ে এদিকে আসে, তো বাড়িতে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে ধোলাই অনিবার্য। জিআরই আর টোয়েফল পরীক্ষা দেওয়ার ফিজের টাকাটা যে পকেটে ছিলো না সেটাও ঘটনা বটে, আর বোনের বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও ঘাড়ের ওপর ছিল, সেটাও মনে রাখতে আমি বাধ্য। তবে কিনা কাঁহাতক আর 'ও গো, আমি কি গরীব আর অসহায় ছিলুম সে আর বলে বোঝাতে পারবো না' বলে করুণাফুটেজ খাওয়া বিবেকে পোষায় মশাই?

তা আমার সেই সেই পুণ্যপদাশ্রয়ী বন্ধুবর্গ সেইসব বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যালয়সমূহে, আণ্ডার দোজ হ্যালোওড পোর্টালস, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছিলো। তারই দুচারিটি স্মৃতিকথা সামান্য ঝাড়পোঁছ করে আপনাদের সামনে রাখলুম। এ সবই যাকে বলে সুনি হুই কাহানিঁয়া, সুহৃদ পাঠকবর্গ প্রমাণ চেয়ে বুকে দাগা দেবেন না বলেই বিশ্বাস!

সেলেব্রিওয়ানঃ

ঘটনার নায়িকা আমার এক অনিন্দ্যসুন্দরী বান্ধবী। না, তাই বলে অমন সন্দেহনয়নে তাকাবার কিছু হয়নি। উচ্চতায় ফুটচারেক,(এবং প্রস্থেও তদ্রূপ) সেই বীরাঙ্গনাটিকে আমরা কলেজেই ঝাঁসির রানীর দ্বিতীয় সংস্করণ বলে অভিহিত করতাম। বস্তুত, পান থেকে চুনের ফেঁটামাত্রেক উৎক্ষেপণে তেনার যা যা রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখেছি সে আর কহতব্য নহে। জাত্যংশে রাজপুতানি সেই রায়বাঘিনীর আঁচরের কিছু দাগ এই অধমের শ্রীথোবড়াতেও রয়ে গেছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

তাই সেই তিনি তখন অনেকানেক মহাত্মার হৃদয়ে বিরহবেদনা উদ্রেককান্তে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে একটি ফুল স্কলারশিপ বাগিয়ে হেথায় সগৌরবে পাড়ি দেন, এই ঘটনা তখনকার।

নেহাত অপ্রয়োজনীয়ই হবে, তবুও এখানে বলে রাখা শ্রেয় যে ভদ্রমহোদয়া নিজেদের পড়াশোনার লেভেল নিয়ে সামান্য ওভারপ্রোটেক্টিভ ছিলেন। আর ফলিত গণিতবিদ্যায় মহিলাটির কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি ছিলো। তিনি গেম থিওরি নামক একটি দুরূহ কিন্তু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞানবর্ধনমানসে কালাপানির ওপারে পাড়ি জমান।

তা গিয়ে বোধহয় এক দুসপ্তাহ হয়েছে। মোটামুটি তখনও গুছিয়ে বসা হয়নি। এক বিকেলে তিনি ক্যাম্পাসে হাঁটতে বেরিয়েছেন। খানিকক্ষণ পর তিনি আবিষ্কার করেন যে তেনার কফিতেষ্টা পাচ্ছে বেশ।

তা টুকটুক করে ক্যাম্পাসের মধ্যেই যে কফিশপটি আছে সেখানে গিয়ে দেখেন যে এক আজব দৃশ্য!

কফিশপের কাউন্টারের সামনে প্রচণ্ড রোগা এবং তালঢ্যাঙা লম্বা এক ভদ্রলোক কফি, চিনি, দুধ এসব নিয়ে খুবই চিন্তাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বন্ধুনিটি কাছে গিয়ে বুঝলেন ভদ্রলোক কফিতে কতটা চিনি এবং দুধ মেশালে ব্যাপারটা খোলতাই হবে সেসব নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিড়বিড় করছেন নিজের মনেই, একবার চিনির পরিমাণ মাপছেন, আরেকবার চামচ তুলে নিয়ে কিসব ভাবছেন, মোটামুটিভাবে উনি কফি বানাচ্ছেন না পরমাণু বোমা হাবভাব দেখে বোঝার জো নেই!

আগেই বলেছি, ভদ্রমহোদয়া খানদানি রাজপুতানি, এইসব ছল্লিবল্লি তেনার বিলকুল নাপসন্দ। তিনি বোধহয় কফিশপের সেলসমহিলাটির চোখে ফুটে থাকা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমটি খেয়াল করেননি, কাছে গিয়ে পেছন থেকে সামান্য রূঢ়ভাবেই বলেন 'বলি একটু না সরে দাঁড়ালে বাকিরাই বা কফি নেবে কি করে মশাই? আমরাও তো লাইনে আছি নাকি?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে, ''এহেহে ভুল হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না ভাই'' টাইপের মুখ করে এদিকে ঘুরে দাঁড়ান, এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই চার ফুটিয়া মেয়েটির চোখ এবং ছফুটের ওপর লম্বা ভদ্রলোকটির বুক একই সমান্তরাল রেখায় চলে আসে, এবং মহিলার চোখের সামনে ভদ্রলোকের শার্টে আটকে থাকা পরিচয়জ্ঞাপক ব্যাজটি পরিস্ফুট হয়।

সেই ব্যাজে লেখা, 'প্রফেসর জন ন্যাশ, প্রিন্সটন ইউনিভ'!

ফলিত গণিতবিদ্যার যে কোনও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এরপর দুম করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তার বদলে সেই রাজপুতকন্যাটি যা শুরু করে তাকে ইংরেজি ভাষায় নুইসেন্স ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সে 'ও মাই গড জন ন্যাশ, ইউ আর জন ন্যাশ, মাই গুডনেস জন ন্যাশ ইন ফ্রন্ট অফ মি, ও মাই গড, ইউ আর জন ন্যাশ' বলে মহা শোরগোল তুলে ফেলে। পরে সে অবশ্য স্বীকার করেছিলো যে ভদ্রলোকের মানসিক স্থিতির কথা ভেবে কাজটা উচিৎ হয়নি। কারণ এরপর ভদ্রলোক নাকি ভারি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, এবং 'আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি দ্যাট আই অ্যাম জন ন্যাশ, ইট উইল নেভার হ্যাপেন এগেইন' বলতে বলতে উল্টোবাগে দৌড় দেন!

বন্ধুনীটির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এরপর নাকি গেম থিওরির মোস্ট সেলিব্রেটেড পার্সোনালিটি, ''আ বিউটিফুল মাইণ্ড'' খ্যাত নোবেল লরিয়েট প্রফেসর জন ন্যাশ পাক্কা দুদিন বাড়ির বাইরে বেরোননি!

সেলেব্রিটুঃ

এই ঘটনাটি টাইম অ্যান্ড স্পেসের কোন অনির্দেশ্য বিন্দুতে ঘটিয়াছিল তার বিশদ বিবরণ, বা কলাকুশলীদের নামধাম পুরোপুরিভাবে খুলে বলতে একটু অসুবিধে আছে। কারণ যাঁরা এই ঘটনার নায়কনায়িকা, সেই দুই কত্তাগিন্নিই নাসাতে উচ্চপদে কর্মরত, শুধু এটুকু বলতে পারি, তেনারা কেউই বঙ্গসন্তান নন।

তা স্থান, বলেই ফেলি, মিশিগানের এক ইউনিভার্সিটি। কাল, এক মেদুর বিকেলবেলা। উপরোল্লিখিত কত্তাগিন্নি ঠিক করলেন অনেকদিন হলো শরীরচর্চাতে ছেদ পড়েছে, একটু হাত পা খেলিয়ে না নিলে আর চলছে না! এই ভেবে তাঁরা ইউনিভার্সিটির স্যুইমিং পুল, যা আড়েবহরে যেকোনও অলিম্পিক পুলকে গুনে গুনে দশ গোল দিতে পারে, সেখানে স্যুইমিং কস্ট্যুম পরেটরে হাজির!

তা দুইজনেই যাকে বলে খাতেপিতে ঘরকে লোগ। ফলে সেই হোঁদলকুতকুত দোঁহাতে যখন পুলে বডি ফেললেন, ছোটখাটো একটা প্রলয়ই হয়ে গেলো প্রায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সুচিন্তিত বয়ান অনুযায়ী, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মাঝেমধ্যে হারিকেন হলে আতলান্তিকে অমন অতলান্তিক ঢেউ ওঠে বটে। আশেপাশে

যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সভয়ে অনেকেই পেছনে সরে গেলেন, ডাঙায় দাঁড়িয়েও নাইতে কারই বা ভালো লাগে বলুন?

তা দুইজনে বেশ করে নেয়েটেয়ে যখন উঠলেন, পুলের আদ্ধেক জল তখন চারিপাশের মেঝেতে ঢেউ খেলছে। তেনারা নিজেদের পারফরমেন্সে ভারি পরিতৃপ্ত হয়ে, স্যুইমিং কস্টিউমের ওপর তোয়ালেস্যুট জড়িয়ে আশেপাশের পুল।পরিদর্শনে বেরোলেন।

তা পাশের পুলে গিয়েই তেনারা আটকে গেলেন। একজন সাঁতারু ছাড়া আর কেউ নেই। তা সেই সাঁতারু ছোকরাটির বয়েস কুড়ির আশেপাশেই হবে, পেটানো পেশীবহুল শরীর, লম্বাটে মুখ। পাশে আরেকজন প্রৌঢ়, তাঁরও বেশ নজরকাড়া স্বাস্থ্য। প্রৌঢ়টি কোচ বা ট্রেইনর হবেন। ছেলেটি মাথা নিচু করে প্রৌঢ়টির কিছু উপদেশ শুনছে। উপদেশশ্রবণ শেষ হলে ছেলেটি ধীরেসুস্থে স্টার্টিং পয়েন্টে এসে দাঁড়ালো, এবং পুলে ঝাঁপ দিলো।

একফোঁটা জল উপচে পড়লো না, বিশেষ কোনও তরঙ্গ উঠলো না, মনে হলো একটি অভিজ্ঞ স্যামন কি কাতলামাছ যেন দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে পাড়া বেড়াতে বেরুলেন!

আমাদের দাদাবৌদি জুটি তো খুবই ইম্প্রেসড! দুইজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন আর মোহিত হতে লাগলেন। আহা, কি স্পিড, কি স্ট্যামিনা, কি অনায়াস মসৃণ ছন্দ। দুইজনেই খানিকক্ষণ বাদে আর থাকতে না পেরে, 'বাহ বেটা, শাব্বাশ, জিতে রহো, নাজুক নাজুক' ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার প্রশংসাসূচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক শাবাশি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। একবার তো 'তণখা বড় জায়েগি তুমহারি' বলতে গিয়েও চেপে গেলেন, বলা যায় না, পুল থেকে উঠে স্যালারি ইনক্রিমেন্টের চিঠি চেয়ে চেপে ধরলে?

তা দুইজনে তো যাকে বলে খুবই উত্তেজিত, ভাবছেন এমন চৌখস ছেলে এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে আগে তো জানতেন না। এমন সময় দেখলেন যে প্রৌঢ় ট্রেইনর ভদ্রলোক ওঁদের পাশেই দাঁড়িয়ে।

এঁরা তো দুইজনে ভদ্রলোককে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, আহা, কি তৈরি করেছেন ছেলেটাকে চাবুক, চাবুক! ভদ্রলোক অবশ্য ঘাড়ফাড় নেড়ে 'আমি তেমন কিছুই করিনি' বলতে চেয়েছিলেন, এঁরা শুনলে তো। তা সেই প্রবল প্রশংসাসুনামি থামলে দুইজনেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন ছেলেকে তো আরও বড় এরেনাতে প্রেজেন্ট করা উচিৎ, তাই না?' ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন, 'বড় এরেনা? তা হবে, বড় এরেনাতেই ও সাঁতার টাঁতার কাটে'। শুনে দুইজনে আরও খুশি, 'বাহ বাহ, বেশ বেশ। তা প্রাইজটাইজ কিছু পেয়েছে?'

শুনে ট্রেইনর সাহেব গভীর ভাবনায় ডুবে যান, এবং কর গুনে বিস্তর হিবেসনিকেশ করে খানিকক্ষণ পরে জানান, 'তা ধরুন, এখনও অবধি মাইকেলের ষোলখানা অলিম্পিক মেডেল আছে, প্রাইজ হিসেবে খারাপ নয়, কি বলুন?'

সেলেব্রিথ্রিঃ

এই ঘটনাটিও আমার এক বন্ধুর। বন্দোপাধ্যায় উপাধিধারী ভদ্রলোকের পিতৃদত্ত নামটি চেপে গেলাম, কবে ফট করে নোবেল কি ফিল্ডস প্রাইজ পেয়ে যাবে, তখন এইসব কুচ্ছো ছড়াবার দায়ে পুলিস যদি আমাকে যদি দায়রায় সোপর্দ করে? তাছাড়া ইনি এমনিতেও খুবই লাজুক মানুষ, ফট করে গাঁজাখুরি গপ্পতে নায়ক হয়ে পড়াটা কিভাবে নেবেন বোঝা যাচ্ছে না!

তা ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ভদ্রলোক ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস, অস্টিনে পাঠরত। চলতি কথায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউটি,অস্টিন নামেই বিখ্যাত।

এই অসামান্য প্রতিভাধর বন্ধুটি অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণতনু এবং কথাবার্তায় সামান্য ন্যাকা হওয়ার কারণে আমাদের কাছে খুবই প্যাঁক খেতেন। কিন্তু বিদেশ যাওয়ার পর তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা

গেলো। জনশ্রুতি এই যে এক নীলনয়না স্বর্ণকেশীর প্ররোচনায় তিনি জিমে যাতায়াত শুরু করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে তার ঈপ্সিত সুফল দেখা দিতে শুরু করে।

তা এক প্রসন্ন বিকেলে বাঁড়ুজ্জেমশাই নিত্যনৈমিত্তিক পালোয়ানি কসরতান্তে ফিল করলেন যে শরীর তখনও কিছু চাইছে। অন্যভাবে নেবেন না কথাটা, মানে আরও খানিকক্ষণ গা ঘামাতে ইচ্ছা যাচ্ছে আর কি। তা ইতিউতি চেয়ে দেখলেন সামনেই ইউনিভার্সিটির টেনিস কোর্ট। যদিচ ভদ্রলোক কোনওদিন লুডোর বেশি কিছু খেলেননি, তবুও মনে করলেন যে দেখাই যাক না, এমন আর কি ব্যাপার, র‍্যাকেট দিয়ে বল পেটানোই তো, এর বেশি তো কিছু নয়। এই চিন্তা করে উনি 'জয় বাবা বরিসনাথ' তিনবার আউড়ে স্ট্রেট ঢুকে পড়লেন।

তা ঢুকে তো পড়লেন, গিয়ে দেখেন আর কোত্থাও কেউ নেই, কেবল একটি বছর বাইশের ছেলে, ছ ফুটের ওপর লম্বা, পেশীবহুল শরীর, একা একাই দেওয়ালে বল মেরে মেরে খেলছে। বলা বাহুল্য, ব্রাত্য সর্বহারাদের প্রতি বাঙালিদের একটা ন্যাচারাল সিমপ্যাথি আছেই, ফলে বাঁড়ুজ্জেবাবুর বুকটা এই একলা একলা খেলে যাওয়া সঙ্গিহীন শিশুটির দুঃখে হু হু করে উঠলো। তিনি একটা টেনিস র‍্যাকেট তুলে গলা খাঁকারি দিয়ে ছোকরাকে ডেকে বললেন, 'আরে এই যে ভাই, তুম একলা একলা কিঁউ খেল রাহা হ্যায়? মেরে সাথ একদান খেলোগে?'

তখন খানিকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, শেষ বিকেল। বন্ধুবর দেখলেন সে ছোকরা ভারি খুশি হয়ে 'আরে কি সৌভাগ্য, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আসুন কত্তা একহাত হয়ে যাক ' বলে র‍্যাকেট হাতে কোর্টের অন্যপ্রান্তে দাঁড়ালো। আমাদের শ্রীবন্দোপাধ্যায় চলো কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই স্টাইলে র‍্যাকেট হাতে এপাশে দণ্ডায়মান হইলেন।

তা সে ছোকরা বোধহয় কিঞ্চিৎ শ্যাডো প্র্যাকটিসের মুডে ছিলো। বাঁড়ুজ্জেবাবু স্পষ্ট দেখলেন যে ছোকরা হাতও ওপরে উঠলো, র‍্যাকেটও নেমে এলো, কিন্তু কই, এদিকে তো বলটল কিছু এসে পৌঁছলো না! শ্যাডোই হবে, ভেবে ঈষৎ অন্ধকারে চোখটোখ কুঁচকে বাঁড়ুজ্জেবাবু ফের মনোনিবেশ করলেন।

ফের ছোকরা শ্যাডো করলো, সেই একই কেস, হাত উঠলো র‍্যাকেটও নামলো কিন্তু আমাগো বাবুর কাসে তো দেহি কিসুই আইয়া পৌঁসায় না!

চতুর্থবার শ্যাডো দেখার পর বাঁড়ুজ্জেবাবু খেয়াল করলেন, তাঁর রক্তে ঘুমন্ত বিদ্রোহী বাঙালটি আড়মোড়া ভাংছে। কাঙাল বলে হেলা করলেও করতে পারিস, তোরা হলি গে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী জাত। তা বলে বাঙাল বলেও হেলা? তোর ঘাড়ে কটা মাথা রে সোনামণি ?

পঞ্চমবারের বার সত্যিই ওঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বড়দের সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে? বাড়িতে মা বাবা কি শিক্ষাই দিয়েছে, ছ্যাঃ! শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার সভ্যতা, এ ছোকরা দেখা যাচ্ছে কিছুই শেখেনি! তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে হাতছানি দিয়ে ছোকরাকে নেটের কাছে আসতে বললেন। সে ছেলে সামান্য অবাক হয়ে বিনীতভাবে কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি চোখ পাকিয়ে বজ্রাদপি কঠোর স্ট্রে ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'এইও, তোমার তো দেখ রাহা হ্যায় যে খেলার কোনওরকম ইচ্ছাই নেহি হ্যায়! এতক্ষণ ধরে কেবল শ্যাডোই কর রাহা হায়, শ্যাডোই কর রাহা হ্যায়। হামকো কেয়া উজবুক সমঝা হ্যায় রে ব্যাটা?'

তা ধমকটমক শুনে সে ছোকরা কানটান চুলকে বললো, ' ক্যানো? শ্যাডো ক্যানো করবো? পাঁচটাই সার্ভিস করলুম তো, তুমি দেখতে পাওনি?'

শুনে বন্ধুবর তো স্তম্ভিত! মানে? প্রত্যেকবার ছেলেটি যে র‍্যাকেট নামিয়ে এনেছে তা হাওয়ায় হাওয়ায় নয়?

এতক্ষণে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয় যে আগের পাঁচবারই সার্ভই করা হয়েছে বটেক, কিন্তু তার যা অসামান্য গতি, বন্ধুবরের নশ্বর চোখে ধরা পড়ে নাই! তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন কোর্টের বাইরে ইতোঃনষ্ট স্ততভ্রষ্ট অবস্থায় সেই পাঁচটি আগুনে গোলা পড়ে আছে!

খুব স্বাভাবিক ভাবেই খেলার আর মানে থাকে না এরপর, ওরকম বেগে একটা গোলা যদি বুকে বা মুখে এসে লাগে? তাছাড়া বেশ সন্ধেও হয়ে এসেছে তখন। বন্ধুটি র‍্যাকেট বগলে গুঁজে প্রথামাফিক নেটের ওপরে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠেন ' হেঁ হেঁ, কিছু মাইণ্ড নেহি করনেকা বাছা, বয়েস হয়েছে কিনা, চোখে সবকিছু আচ্ছাসে ঠাহর নেহি হোতা হ্যায়। তবে তুমহারা সার্ভিসমে বেশ জোর হ্যায় দেখছি। চালিয়ে যাও হে, কালেক্কে তুম লায়েক হোয়া, ইয়ে হামকো স্পষ্ট দেখতা হ্যায়। মেরা নাম বন্দোপাধ্যায়, ******* বন্দোপাধ্যায়'।

সে ছোকরা ভারি ভদ্র ও বিনয়ী বলতেই হবে, কারণ এর পরে সেও লাজুক হেসে হাত বাড়িয়ে বন্ধুর হাতটা খপ করে ধরে অমায়িক স্বরে নিজের পরিচয় দিলো,

'আয়্যাম রডিক, অ্যাণ্ডি রডিক!'

মার্কেট ভিজিট ১৬

দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছিলাম দুরন্ততে, কালকেই।

কেন জানি না, আমার সব সফরেই অতি অল্প হলেও বলার মতন কিছু না কিছু ঘটে। তারই কিছু বেঝেবুঝে আপনাদের পায়ের কাছে 'মার্কেট ভিজিট' বলে পেশ করি। আপনারাও যে নেহাত স্নেহজড়িত কারণে নাদান বালকের এই দুর্বল প্রচেষ্টায় করুণাবশতই ঠেকা দিয়ে চলেন তাও বুঝি। এবারেও প্রায় সেরকমই একটা ঘটবে বুঝতে পেরেছিলাম, যখন আমার সিটের উল্টোদিকে তিনি এবং তাঁর দিদিমা এসে অধিষ্ঠান হলেন।

দিদিমার বয়েস পঞ্চাশ প্লাস। 'তিনি'র মা তাঁকে স্টেশনে ছাড়তে এসেছিলেন, মায়ের বয়েস ৩২ এর মতন, এবং অত্যধিক পৃথুলা, দেখলেই আমার নিজের বোনের কথা মনে পড়ে!

বোঝা গেলো যে দিদিমা মাস তিনেকের জন্যে নাতনিকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। মা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তেনার কাজ আছে দিল্লিতে, তাই তিনি যেতে পাচ্ছেন না। আর ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেই বছর তিরিশের মা যখন জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের রক্তপুত্তলিটির দিকে চেয়েছিলেন, সে সজলকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া যাহার হৃদয় দ্রব হয় না, সে পাপমতি নির্ঘাত পাষাণ, অবশ্যই পাষাণ!

ও, বাই দ্য ওয়ে, তেনার বয়েস হচ্ছে দুই!

নাম? টিয়া। মানে Tia.

তা ট্রেন ছাড়ার পর কথাবার্তা শুরু হলো। ওঁরা যে ক্রিশ্চান সেটা দিদিমার মোবাইলের স্ক্রিনসেভারে প্রভু যীশুর ছবি দেখে দিব্যি বুঝেছিলাম। এঁরা সপরিবারে ডেট্রয়েটে থাকেন, দেশে ফিরলে গুরগাঁওয়ে কিনে রাখা দামী ফ্ল্যাটে ওঠেন। দিদিমা কলকাতা যাচ্ছেন তাঁর মায়ের সঙ্গে নাতনির দেখা করাতে! দিদিমার মায়ের বয়েসও আশির ওপর। লাস্ট মোমেন্টে ফ্লাইটের টিকিট পাননি তাই..... এঁদের পরিবারের কথাবার্তার মাধ্যম আবার ইংরেজি। এবং শুধু ইংরেজি নয়, চমৎকার ব্রিটিশ ইংলিশ, মার্কিনি সস্তাংরেজির চিহ্নমাত্র নেই।

কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা খোলাসা হলো। দিদিমা লোরেটো বউবাজারের মেয়ে। একে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তদুপরি লোরেটো। ফলে ইংরেজিটা প্রাণপাত করেই শিখেছেন। এবং শুধু ল্যাংগুয়েজ নয়, লিটারেচারেও দেখলাম তিনি অনন্যা। জেন অস্টেন থেকে বিক্রম শেঠ অবধি অবাধ গতিবিধি!

আমিও মশাই লাইনের লোক, কথায় আলাপ জমাতে দেরি হলো না। আর সামান্য আলাপ জমতেই বাঙালির যা সাধারণ প্রশ্ন, জিজ্ঞেস করেই ফেললাম,

বাড়ি? কোথায় যাবেন কলকাতায়? আমি লেকটাউন যাবো। আপনি?

উই আর গোইং টু বো ব্যারাকস। হার্ড অ্যাবাউট দ্যট?

প্রথম যৌবনের অনেক যন্ত্রণার কথা মহর্ষি অঞ্জন দত্ত বলে দিয়েছেন বছর বিশেক আগে। সেই থেকে বো ব্যারাকস চিনি বৈ কি! কলকাতার মধ্যে সে এক গাঢ়তর কলকাতা! সেলসের কাজেও অনেকবার মার্কেট ভিজিট করতে হয়েছে।

আলাপচারিতা শেষ হয়েছে কি হয়নি, এরপরেই শুরু হলো খেল। এই বুড়ি অওরতের ইতনা বড়া সাহস যে মহারাণীকে মায়ের থেকে কেড়ে আনে? ব্রিটিশ জমানা হলে বোধহয় দিদিমাকে ইণ্ডিয়া গেটের সামনে কোর্ট মার্শাল করা হতো। হায়, সে মিসেস মাউন্টব্যাটেনও নাই সে নেহরুও নাই! ফলে তাঁর মানে টিয়ারাণীর তো ভয়ানক ক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকতে পারে না! তা প্রথমেই বোঝা গেলো

যে কিছুতেই দিদিমার কোলে থাকবেন না। আঁচড়ে কামড়ে নানা অবর্ণনীয় ভাষায় নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করে তো তিনি দিগ্বিদিক সচকিত করে তুললেন। সেই ভাষার সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক দিক থেকে চাইনিজের সঙ্গেই মিল বেশি। তবে মন দিয়ে শুনলে বুঝতে ভুল হওয়ার কথা নয়। আরে চাচ্চু, ভাওনাঁও কো সমঝো!

যাই হোক, সারমর্ম হলো যে ভদ্রমহিলা ক্রুদ্ধ, সাতিশয় ক্রুদ্ধ! নিজের মায়ের আঁচল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলে কারই বা মন মেজাজ ভালো থাকে মশাই! বিশেষ করে তেনার বয়েস যখন দুই?

এখন কথা হচ্ছে যে গান্ধারী বলেছিলেন 'যথাধর্মোস্ততোজয়ঃ'। তিনি স্বেচ্ছান্ধ মহিলা হয়ে যে কথাটা অত সহজে বুঝলেন, 'ন্যায় ও অধিকার' নামের মহিলা সেটা তাঁর কালি কালি আঁখে ড্যাবড্যাব ফ্যায়লাকে বুঝবেন না সেটা হয় না। ফলে মিস টিয়াকে একটা গ্রেসফুল এক্সিট মেরে সাইড চেঞ্জ করতে হলো।

মুশকিল হচ্ছে সাইডের ওপারে দিদিমা তুমি রাধে, এপারে আমি! বেশি কিছু বোঝবার আগেই মিস টিয়া, বয়েস বছর দুই, হ্যাঁচোরপ্যাঁচোর করে আমার কোলে অধিষ্ঠিতা হয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন 'আঙ্কিলাভুমিচংচুংহাম্মা?' এসব প্রশ্নের নঞর্থক উত্তর হয় না, হতেই পারে না, ফলে আমিও একগাল হেসে জবাব দিলুম 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আই অ্যাম ফিলিং চমৎকার সৌভাগ্যবান। আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো মহারাণী? '

এরপর আমাদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় নানা ভব্য আলোচনা হয়। সেসব আধ্যাত্মিক গূঢ় আলোচনার কথা না হয় একদিন আপনাদের সময় সুযোগ পেলে বলবো। তাতে ট্রাম্পের বিদেশনীতি থেকে শুরু করে আইটি ইন্ড্রাস্ট্রির ভবিষ্যৎ সবই ইনক্লুডেড ছিলো। ইন ফ্যাক্ট একবার তো টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে আমাদের গভীর আড্ডার মাঝখানে অরসিকা দিদিমা এসে রসভঙ্গ করলেন, বিরসবদনে শুদ্ধ বাংলায় শুধোলেন, 'টিয়া তুমি কি খাবে?'

আই লা, অ্যাংলো দিদিমা দিব্য ব্রিটিশ ইংরেজি কপচাচ্ছিলেন, বাগবাজারী বাংলায় কি করে ডাইভ মারলেন গা?

এইবার দিদিমা খাপ খুললেন। তেনার বাপ শ্যামবাজারের রকের বিশিষ্ট ইয়ে ছিলেন। সৎমায়ের গঞ্জনায় ভাগ্যান্বেষণে বম্বে যান এবং গিয়ে কার্যসূত্রে আলাপিত এক গোয়ানিজ কন্যায় যদিদং হৃদয়ং মমটি সম্পন্ন করেন। বিয়ের পরে দেশে ফিরে কুলাঙ্গার ছেলেটির আর পৈতৃক বাড়িতে ঠাঁই হয়নি, ফলে কচি বউকে নিয়ে তিনি এক জাহাজি পিদ্রুর সহায়তায় প্রথমে খিদিরপুর, পরে বো ব্যারাকে বাসা বাঁধতে বাধ্য হন।

'বাবা আমাকে সুকুমার রায়ও পড়িয়েছেন, শরতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও অল্প অল্প পড়েছি।' সলজ্জ মুখে জানালেন ভিয়েনা গঞ্জালভেস (নামটা চেঞ্জ করলাম, বোধগম্য কারণেই)। হ্যাঁ, মায়ের পদবীটাই ব্যবহার করেন তিনি।

এদিকে মিস টিয়া তো গোঁ ধরে বসে আছেন, তিনি বর্ডারের ওপারে যাবেন না। ফলে আমাকেই কিছু খাওয়াতে হলো। সেই কবে নিজের মেয়েকে খাইয়ে দিয়েছি..এখন অন্যের মেয়েকে...

আর অন্যের মেয়ে, 'দিডিঘুচিমিংচুং' বলে হাসিমুখে উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকালে কি আর খেয়াল থাকে মশাই যে এ কার মেয়ে?

যাই হোক, বহুকষ্টে কিছুমিছু খেয়ে তিনি আমাকে ধন্য তো করলেন! এরপর শুরু হলো নতুন বায়নাক্কা!

তিনি আমার সঙ্গে শোবেন! কিচ্ছুত্তেই ওই বৃদ্ধা 'আংরদিম্মাম্মন্নেই'এর সঙ্গে শোবেন না!

মাইরি বলছি, আমার মেয়ে যখন এই বয়সের ছিলো, আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ঘুমোতাম। এক বিছানায় শুলেই ভয় হতো ঘুমের ঘোরে যদি আমার ওই ভীমসেন মার্কা হাত পা কচিটার গায়ে উঠে যায়? যদি কোথাও লাগে? বেচারিতো বলতেও পারবে না যে কোথায় ব্যথা লেগেছে!আর এখন এ কি ধর্মসঙ্কট বলুন দেখি!তদুপরি দুবছরের শিশু যদি কোলে উঠে গলা আঁকড়ে ঝুলে পড়ে, তাকে ঠিক কি উপায়ে নিরস্ত করা যায়? গলা আঁকড়ে থাকা কচি হাতের বাঁধন জোর করে খুলতেও তো মায়া লাগে! আর একটিবার চেষ্টা

করলেই ওই দুই বছরের শিশু যা তীব্র অভিমানী চোখে তাকাচ্ছে, তার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিরোধ সূচ্যগ্রপরিমাণধূলসম অর্থহীন!

অবশেষে নিঠুর নিদয়া দিদিমা অসাধ্যসাধন করলেন। নানাবিধ চমকপ্রদ ইংরেজিতে বকাঝকা করে মিস টিয়াকে সিটের ওপর সদ্য পাতা বিছানায় জোর করে শোয়ালেন। তারপর লাইট অফ করে কড়া বললেন, 'লেট বোথ অফ ইউ স্লিপ নাউ'।

অন্ধকার কম্পার্টমেন্ট। মিস টিয়ার খুঁ খুঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। এমন সময়ে দিদিমার অ্যাপোলোজেটিক গলা ভেসে এলো মৃদুস্বরে...'অ্যাকচুয়ালি ওর মা ডিভোর্সি। দিস কিড হ্যাজ নেভার সিন হার ফাদার...দ্যাটস হোয়াই...আই হোপ ইউ ডিডন''ট মাইন্ড'।

এসব কথার উত্তর হয় না, দিতে নেই। চুপ করে শুয়ে রইলাম।

খানিকক্ষণ পর শুনি বাঙালি বাবার মেয়ে তাঁর নাতনিকে গুণগুণ করে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, 'টিয়া টিয়া টিয়া, অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে...'

গাঢ় কষ্টের ঘুম নেমে এলো দুই শিশুর চোখে। একজনের বয়েস দুই।

আরেকজনের?

আটত্রিশ।

রায়, অভিজিৎ রায়

'প্রভু, বলি ও প্রভু, শুনছেন?'

'কে র‍্যা? শান্তিতে যে দুদন্ড ঘুমুব তার জো নেই, অ্যাঁ? রাত নেই, দিন নেই, সকাল সন্ধ্যে এত্ত প্রভু প্রভু কিসের হে?'

'ইয়ে, সকাল হলো যে, সভার কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে যে প্রভু, লোকজন সব আসতে শুরু করেছে যে। (সজোরে) অভয় দিলেন যদি করি নিবেদন/ শুনিতে ইচ্ছা কিছু অমৃতবচন'।

'উরিশ্লা, সক্কাল সক্কাল কোবতে মারাচ্ছ, উমম, চুল উষ্কখুষ্ক, লাল চোখ, নাঃ এখনো তোমার হ্যাংওভার কাটেনি দেকচি। শোন একটা টোটকা বলি, চশমাটা দাও দিকিন,হ্যাঁ। সক্কাল সক্কাল এমন হলে না, একছিপি স্কচ নীট মেরে দেবে, বুইলে? ওইদিকে যাও, বাঁ দিকের তাক থেকে ওই লম্বাপানা বোতলটা নামাও দিকিন, গ্লেনফিডিচ, ওইখান থেকে...'

'আহ, প্রভু, সক্কাল সক্কাল কি শুরু করলেন? একটা কাজের কথা কি বলা যাবে না শান্তিতে? রাদ্দিন মালের ধুনকিতে বুঁদ হয়ে থাকবেন?'

(ব্যাকগ্রাউন্ডে, 'জয় সদাপ্রভুর জয়। ধ্বংস হোক সদাপ্রভুর শত্রুদের জীবন ও সমস্ত সম্পদ। বিধর্মী ও নারীরা নিক্ষিপ্ত হোক নরকের আগুনে। প্রভুর শত্রুদের ঘাড়গর্দানে আঘাত হানো জোড়ায় জোড়ায়। প্রভু অবশ্যই দয়ালু ও ক্ষমাশীল.....')

'না বুঁদ হয়ে উপায় কি বাওয়া? শুনতে পাচ্ছো? অ্যাই শুরু হল। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই রাজ্যের বাজারি কেচ্ছা। রোজ রোজ এগুলো শুনতে ভাল্লাগে না মাইরি, কতবার বলবো অ্যাঁ? আহা, ভাষার কি ছিরি, শুনে তো মাইরি আমি নিজেই ঘাবড়ে গেসলুম, আমি ভগবান না সিসিলির মাফিয়া, অ্যাঁ? '

'ইয়ে ঠিক আছে প্রভু, পরের বার নাহয় ল্যাঙ্গুয়েজটা আরেকটু মিঠে করে দেবো, হেঁ হেঁ... '

'আর বিউগলের সংগে প্যাঁ প্যাঁ করে ওটা কি বাজাচ্ছে হে?'

'হেঁ হেঁ, এটাকে ভুভুজেলা বলে প্রভু, মহর্ষি নারদ এইবার এটি ইডেন গার্ডেনের গেটের বাইরে থেকে কুড়িয়ে এনেছেন'।

'নারুকে বলবে এটা রোজ সকালে, ইন্দ্রের কানের কাছে বাজাতে। সে মহাপ্রভু কোথায় এখন?'

'মহর্ষি নারদ? উনি এখন নন্দনকাননের পারিজাত বনে প্রভু?'

'বাঃ বাঃ, হুলও ফোটাচ্ছে, আবার ফুলও? তা ভালো। কিন্তু নারু নয় চিতু, আমি ইন্দ্রের কথা জিজ্ঞেস করছি'।

'ইয়ে, উনি একটু ব্যস্ত আছেন প্রভু....'

'কিসের ব্যস্ত হে? দেশে ঠিকঠাক বৃষ্টি নেই, একের পর এক ক্ষেতের ফসল জ্বলে যাচ্ছে, আর উনি কি উর্বশীর ভাইটাল স্ট্যাট মাপতে ব্যস্ত? ওটাকে বলবে রোজ সকালে এটা দুঘণ্টা করে ওর কানের কাছে বাজানো হবে, আমার আদেশ। '

'ইয়ে, তাহলে প্রথম আগন্তুককে পেশ করতে বলি প্রভু?'

'বলবেই? আটকানো যায় না? আচ্ছা, বলো।'

'ইয়ে, ওহে প্রতিহারী, প্রথম আগন্তুককে পেশ করা হোক'।

(আগন্তুকের প্রবেশ)

'প্রভু, প্রভু, আপনিই কি সেই? ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং মঙ্গলমূর্তি কাশ্যপেয়ং হে চরাচরসারে দর্শনমাত্রেনমানাকামনাপূর্তি কুচযুগশোভিত মুকুতাহারে জয় জয় বিষহরি....'

'ওরে থাম থাম, ও চিতু একে থামাও, গনশা থেকে মনসা সব ঘেঁটে ঘ করে দিচ্ছে তো। শান্ত হয়ে বসো বাপু। ধীরে সুস্থে, অ্যায়, এইভাবে, থেবড়ে বসো দিকিন। চিতু এর জন্যে একটা বড় দেখে পাতিয়ালা বানিয়ে আনো তো,বাঁ দিকের তাক থেকে ওই লম্বাপানা বোতলটা, হাফ বোতল গ্লেনফিডিচ এখনো রয়ে গেছে বোধহয়, খবদ্দার, জল মেশাবে না....'

'আহ প্রভু, কি করছেন কি? সভার মধ্যিখানে...'

'কেন? ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি লাগছে নাকি? যাগগে যাক। তা ইয়ে, ওহে আগন্তুক, তোমার নামটি কী ঘোঁচুসোনা?'

'কত পুণ্যবলে আপনার চরণসকাশে এসে আজি কি অপার আনন্দের হিল্লোল আমার শরীরে প্রভু, কি দুর্নিবার মোহমায়ার বন্ধন ছাড়িয়ে আমার আত্মা আজ অনন্ত আকাশে...'

'উরিব্বাস, দিব্যি সরেস বাঙলা বেরোচ্ছে তো মুখ থেকে!'

'হেঁ হেঁ, ঠিকই ধরেছেন প্রভু, ওই বাঙলাই আর কি, হেঁ হেঁ... যমদূত দাদাকে বল্লুম যখন খালাসিটোলা হয়েই যাচ্ছি, একটু বসে গেলে হত না? হেঁ হেঁ, অপরাধ নেবেন না কিন্তু স্যার'।

'চিতু, শুনলে?'

'শুনলাম প্রভু, আজকেই ওটার ব্যবস্থা করছি'

'হ্যাঁ হ্যাঁ করে ফেলো, করে ফেলো। রোজই কি আর স্কচ খেতে মন যায় হে? মাঝে মাঝে এসব বাংলা টাংলাও তো....'

'আহ কি হচ্ছে কি প্রভু? আমি কি তাই বল্লুম? সক্কাল সক্কাল কি শুরু করলেন বলুন তো? বাংলা না, যমদূতটার কথা বলছি।'

' অ। যাই হোক, তা বাপু, বাংলু টেনে মেজাজটি যে দিব্বি খোলতাই সে বুঝনু। এইবার খোলসা করে বলতো ছুংকুমণি, কি কি এমন পুণ্যকাজ করে এসেছো পৃথিবীতে যে তোমাকে স্বর্গে হাসিখুশি খেলে বেড়াতে দেওয়া হবে? প্রুভ ইওর পয়েন্ট, বি ক্রিস্প অ্যান্ড শার্প। আমার হাতে টাইম বেশি নেই। কি করতে হে মর্তে?'

'ইয়ে, সেলসে ছিলাম প্রভু'।

'অ্যাঁ? সেলসে? চিতু, একে নিয়ে যাও, স্ট্রেইট রৌরব নরক, পাঁচশো বছর। রাস্তায় কোথাও দাঁড়াবে না। হেব্বি ডেঞ্জারাস মাল। স্ট্যাম্প প্যাডটা এদিকে দাও দিকিন। আহ, পেনটা আবার কোথায় রাখলুম..কি জ্বালা.....'

'প্রভু প্রভু, কি অপরাধ প্রভু? আপনি তো শুনলেনই না....'

'বেশি শোনার দরকার নেই সন্টিমন্টি। সেলসের লোকগুলোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। গতবার এক ছোঁড়া আমাকে একটা বাক্স দিয়ে বলে তাতে নাকি স্পেশাল অ্যান্টিগ্র্যাভিটি সিউয়িং ইন্সট্রুমেন্ট, ও মা খুলে দেখি একবাক্স সূঁচ আর সুতো! এই গছিয়ে দিয়ে স্বর্গে যাবার ধান্ধা আর কি! সাহসটা ভাবো! আরেক মক্কেল তো অথেনটিক ওয়্যারেবল এয়ার কন্ডিশনিং র‍্যাপঅ্যারাউন্ড নাম করে ইয়াব্বড় একটা প্যাকিং বাক্স নিয়ে হাজির, স্বর্গে যাবার নজরানা, আমি তো মাইরি হেবি ইম্প্রেসড, ওমা, খুলে দেখি বারোখানা বাঁদিপোতার গামছা! ওপরে আবার লেখা ওয়র্কস বেস্ট হোয়েন ওয়েট! দুটোকেই দেড় হাজার দেড় হাজার বছর করে কুম্ভীপাকে পাঠিয়েছি। '

'ইয়ে, সব সেলসম্যান তো ওরকম না প্রভু'।

'বটে? প্রভ ইট। আর কি কি করেছো? '

'বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবা করেছি প্রভু'

'সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং। কি রকম?'

'ফেসবুকে একটি বাংলা সাহিত্যমূলক গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলাম স্যার। এছাড়াও আরও অনেক গ্রুপে....'

'চিতু, লিখে নাও, পাঁচশো বছর রৌরবের সংগে আড়াইশো বছর অন্ধকূপ। আর শোনো, ঝটপট রওনা করিয়ে দাও। ইশশ অনেকটা বেলা হয়ে গেলো এই একটা কেস নিয়েই। ন্যাঅ্যাঅ্যাক্সট'।

'প্রভু প্রভু, দয়া করুন। আমি আরও ভালো ভালো কাজ করেছি..'

'শুনি। এইটেই লাস্ট চান্স কিন্তু, বুইলে তো?'

'পাড়ায় পাড়ায় ভোটের আগে দেওয়াল লিখেছি প্রভু, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুজোয় বইয়ের স্টল, রক্তদান শিবির, ফাইভ অ্যা সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট, ব্রিগেডে মিটিং ও চিড়িয়াখানা অ্যান্ড বিরিয়ানি, গণসংগীত ও লোকাল কমিটি। তারপর মোমবাতি মিছিল, ইলিশ ও হাওয়াই চটি উৎসব, ইনফ্যাক্ট একবার তো বইমেলায় ''জাগো বাঙলা''র স্টলের সামনে বাউল অবধি হয়েছিলাম প্রভু।'

'হেঁ হেঁ। তুমি কি লেভেলের আতাক্যালানে পাবলিক সেটা নিজে এখনো বোঝনি, না? নাহ, কৃমিভোজন নরক আরও আড়াইশো বছর, ন্যাঅ্যাঅ্যাক্সট...'

'প্রভু, ও প্রভু, শুনুন না... আহ এই দ্যাখো জাপটে ধরে, উঁহহ, সর না মাইরি, কি বিচ্ছিরি গন্ধ গায়ে...'

(যমদুতেরা চ্যাংদোলা করে আগন্তককে বাইরে নিয়ে যায়).

-' চিতু, পরের ক্যান্ডিডেটকে... এ কি, খামোখা দাঁত ক্যালাচ্ছো কেন? ওরে কে আছিস, চট করে একটা তক্তা কি বাটাম নিয়ে আয় তো, এটার বোধহয় আন্তারা ফাঁচকলিয়ে গেছে...'

-'ও হো, খ্যাঁক খ্যাঁক, খৌয়া খৌয়া.... '

'ইঃ, হাসছে দেখো, যেন দাঁড়কাকে রসগোল্লা খাচ্ছে। বলি এত আনন্দের কি হলো অ্যাঁ ? এমাসের টার্গেট অ্যাচিভমেন্টের স্ট্যাটাস মনে হচ্ছে ভালো, নইলে এতো হেসে কুটিপাটি হবার কারণ কি বাওয়া? কেসটা কি, অ্যাঁ? '

'সে সুখবরটা দিতেই তো সকাল থেকে প্রাণটা আনচান করছে প্রভু। শুনলে আপনি হেসে কুটিপাটি হবেন। এখন মাসের টার্গেট দিনেই হচ্ছে কি না, হেঁ হেঁ। আজকেরটায় অবশ্য আপাতত তিপ্পান্ন কনফার্মড, তবে ওটা বাড়তেও পারে।'

'অ্যাঁ? বল কি? এখন তো ইয়ার এন্ডিং নয় চিতু, তাতেই এই?? বাহ বাহ, শাব্বাস, ব্রাভো। তা কোথাকার কাস্টমার চিতু? ওই বলি ইরাক নাকি নাইজেরিয়া ?'

'না প্রভু, অরল্যান্ডো, আমেরিকা'।

'বাহ বাহ বেশ। তা কোন স্কিমে তুল্লে?'

'সে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার স্যাপার প্রভু, আপনি হয়তো শুনতেই চাইবেন না। হোমো'।

'মোমো? তা তিব্বত না এক্সাইড মোড়েরটা? আমার অবিশ্যি এক্সাইড মোড়েরটাই.....'

'আহ, তা নয় প্রভু, বলতেও যে ছাই কি গা গুলোচ্ছে সে আর কি বলি! বলছি শস্তায় খান পঞ্চাশেক হোমো তুলেছি প্রভু। হোমো, হিজড়ে, বেশ্যামাগী, এগুলো শস্তা মাল প্রভু, তুলতে কষ্টটা একটু কম হয়, কেউ বিশেষ গা করে না কি না। ভ্যালুতে না হলেও, ভল্যুম টার্গেট কিন্তু দিব্যি পুষিয়ে যায় প্রভু, অন্তত আপিস চালানোর খরচাটা উঠে আসে আর কি, হেঁ হেঁ। '

'বেশ করেছ, তা বাপু, এই হোমো না মোমো কি একটা বললে, তা এরা এমন কি করছিল যে এর''ম হোলসেল রেটে খামচে তুল্লে?'

'সে কি অসৈরণ কাণ্ডকারখানা প্রভু, আপনাকে আমি লজ্জায় বলতেই পারবো না, ছি ছি ছি '।

'ক্যানো, ক্যানো?'

'সে সৃষ্টিস্থিতিলয়, সমাজসংস্থিতি লোপ, ইত্যাদি মিলিয়ে খুবই ভজঘট্ট কেস প্রভু। ধরুন অ্যাবস্ট্রাক্ট জিওমেট্রির সঙ্গে খামচা মেরে এট্টু সাব অল্টার্ন স্টাডি, বা স্ট্রিং থিওরির সঙ্গে সুররিয়ালিজম খুব কষে ঘুঁটে দিলে.....'

'ওরে কে কোথায় আছিস, আমার ডাঙ্গশটা নিয়ে আয় তো, এটাকে সামান্য গুছিয়ে ক্যালাই, নইলে মনে হচ্ছে না বাংলা ভাষায় কেসটা খুলে বলবে বলে '।

'না না, তা নয়... '

'তাহলে কেস টা কি হে?'

'ইয়ে, ওরা চুমু খায় প্রভু'

'তো? তো?? তো??? ঘুষ নয়, বিষ নয়, কাটমানি নয়, কারো রক্ত নয়, নিষিদ্ধ নেশার বস্তু নয়, চুমু খাচ্ছে বলে মুঠো ধরে... '

'ছেলে ছেলেকে চুমু খায় প্রভু, মেয়ে মেয়েকে, ছিঃ ছিঃ.... '

'একটু এদিকে এসো তো চিতু, এই আমার কাছে একটু কাছে, অ্যায়, মুখটা একটু নিচে নামিয়ে বাহ বেশ, এই বার....

<চকামগ্ন....

'এ হে হে হে, অ্যা ম্যা, এটা কি করলেন প্রভু, এটা....'

'ভালোবাসা একটু আধটু রেসপেক্ট করতে শেখো, চিতু। তোমায় বোধহয় অনেক দিন কেউ চুমু খায় নি,না? তাই একটু খেলুম, হে হে। তাছাড়া কারো প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলানোটা ইতরামি, সেটা তোমাকে তোমার মা বাবা ছোটবেলায় শেখায় নি চিতু, অ্যাঁ? যাগগে যাক। তা চুমু খাওয়া ছাড়া এরা আর কি কি করছিল বাওয়া?'

'সে বলতে গেলে, ম্যা গো, ওয়াক ওয়াক....'

'ওরে কে আছিস, আমার ডাঙ্গশটা.... '

'না না থাক, ইয়ে ওরা প্রভু, ইয়ে মানে, কি করে বলি, নিজেদের মধ্যে ঝিংকুলুলু করে।'

'অ্যাঁ, কি করে বলে? '

'ঝিংকুলুলু, ইশ ছি ছি, বলতেও অপবিত্র অপবিত্র বোধ হচ্ছে'।

'সেটা কি হে? ঝিংকু... ওরেশশশাল্লা, বুয়েছি। ওলে বাবালে, ঘুঞ্চুপুঁচু নেকুপুষু আমার, তা বাওয়া তুমি করো না? রাত্তিরে বউমার সঙ্গে কি লুডো খেলো, অ্যাঁ? '

'আজকাল তো আর (দীর্ঘশ্বাস),... ইয়ে, লুডোই চলে প্রভু'।

'নইলে আর অন্যের আনন্দ দেখে চোখ টাটাবে কেন বাওয়া? বলি একটু এদিকে এসো তো চিতু.... '

'না না প্রভু, ইয়ে, থাক বরং, আপনার ইয়ে, বক্তব্যটা মানে, যথাযথ ভাবে প্রণিধান কল্লুম। কিন্তু আমার কথা শুনুন, ওসব কি ঠিক? মানে হারাম বা নিষিদ্ধ ইয়ে না? '

' হুমম, তা সন্টুমন্টু বাপিসোনা, আমার নামে আর কি কি হারাম বলে চালিয়ে বাওয়াল দিচ্ছ তার লিস্টিটা এট্টু দাও তো বাপধন। মালঝাল খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকি বলে আমার নামে আর কি কি....'

'খুব ছোওট্ট লিস্ট প্রভু, বিয়ের আগে ভালোবাসা বা জেনা করা, গরু বা শুয়োরের মাংস, বেজাতকুজাতে বিয়ে দেওয়া, এর দেশে ওর পুজোআচ্চা... '

'ফুটবল?'

'ইয়ে, খেলাধুলো তো হারাম তাই....'

'স্কচ?'

'ইয়ে, মদ তো নিষিদ্ধ তাই আর কি... নেহাত বাধ্য হয়েই, হেঁ হেঁ হেঁ...কিছু মাইন্ড করলেন না তো?'

'বিধর্মী মেয়েদের গণিমতের মাল বলে রেপ? বিধর্মীদের সম্পত্তি ''শত্রুসম্পত্তি'' দেগে দিয়ে লুটতরাজ? জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া? বাচ্চা কেটে তারই মা কে খাইয়ে দেওয়া? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের বিক্রি করে দেওয়া? বাচ্চা ছেলেদের ইয়ের চুলের সাইজ দেখে কতল করা? ফ্রিজে মাংস দেখে বুড়ো লোককে পিটিয়ে মারা?'

'ইয়ে না প্রভু, ঠিকঠাক, মানে ধর্মীয় ইয়ে মেনে চললে...'

'বাহ বাহ বাহ, গানবাজনা?'

'হারাম'

'নাচ? অভিনয়? নাটক?'

'মানে, ইয়ে, হারাম প্রভু'

'কবিতা? চিত্রশিল্প? ভাস্কর্য? '

'ইয়ে, মানে এক কথা কেন আমাকে দিয়ে বারবার বলাচ্ছেন প্রভু? এসবই হারাম '

'শাবাস চিতু,ভালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছ হে, বেশ গুছিয়ে বসেছো তো বাপু। আমার তো মনে হচ্ছে যে তোমার রাজত্বে বেঁচে থাকাটাই হারাম চিতু, বেঁচে থাকাটাই হারাম!'

-'অ। আমার দোষটাই চোখে পড়লো, না? বলি রাদ্দিন যে মালঝাল খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন, এই সৃষ্টি সামলায় কে? এই লোকস্থিতি কার দায়িত্বে থাকে, অ্যাঁ? দেখুন প্রভু, এভাবে চলতে পারে না। বিশেষত, আপনাকে ওই ইয়ে, মানে ওদের ব্যাপারে কিন্তু একটা ডিসিশন নিতেই হবে প্রভু। নইলে কিন্তু আমার পক্ষে এভাবে ডিউটি করা আর সম্ভব হচ্ছে না, পষ্ট করে বলে দিলুম, হ্যাঁ'।

'এই দ্যাকো, রাগ কত্তে নেই চিতু। এইখানে বসো দিকিন, অ্যাই দ্যাকো ফেঁতফেঁত করে। একটু বকেছি বলে, ওল্লে বাবালে, ঘুনুমুনুপুচুটা....'

'ইয়ে, না থাক, মানে চুমুটা, ন্না, ইয়ে থাক প্রভু। পষ্টাপষ্টি কাজের কথায় আসুন। বলি ওদের কি ব্যবস্থা করলেন?'

'কাদের?'

'সেই অবাধ্য ত্যাঁদড় ছোকরার দল, যাদের আপনি তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন। হারামজাদাগুলোকে পাঠালেই ঝামেলা কেলেংকারির একশেষ! উঃ দুদন্ড তিষ্ঠোতে দেয় এরা? সব সময় এঁচোড়ে পাকামি, জাত ধর্ম নিয়ম নিষ্ঠা সব কিছু নিয়ে ক্যাচাল, একে খোঁচাবে, ওকে রাগিয়ে দেবে, কিছু বলতে গেলেই উলটে দুটো প্রশ্ন করে, উফফ, পুরো হাড়হারামজাদা দল, জাতবিছুটি এক একটা'...

'উরেব্বাবা থামো, এক্কেবারে মেলট্রেন চালিয়ে দিলে হে? তা বলি বাপু,তাতে তোমার ইয়ে জ্বলছে কেন সন্টিমন্টি?'

'মানে? জ্বলবে না? আজকাল আদ্দেক লোক পুজোআচ্চা শুনলে খ্যাঁক করে হেসে ফেলছে, প্রার্থনা করতে বললে জিজ্ঞেস করছে এই করে কোন মহাভারত উদ্ধার হবে, উফফফ, পুরো ধ্বংস করে দিল, জ্বালিয়ে দিল মাইরি।'

'অ'', তা বাপু এরা খুব মারামারি কচ্চে নাকি আজকাল? বোম? বন্দুক? চাপাতি? ত্রিশূল? নাকি সবকিচু নিয়েই নেমেচে? এক্কেবারে রক্তারক্তিতে বানভাসি কান্ড নাকি হে?'

'ইয়ে, না তা অবিশ্যি নয়'

'তাহলে শোন ভাই, আজ অনেক কাজ কল্লুম, গুন্নাইট। তুমি এখন এসো, আমার অনেক কাজ আছে, আর গ্লেনের বোতলটা এদিকে....'

'উফফ, আবার শুরু হল। বলি মারামারি করচে না বটে, তবে যেটা করচে, সেটা আরও ভয়ংকর'।

'অ্যাঁ ? আরও ভয়ংকর? কি রকম? ইস্কুল কলেজ লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দিচ্চে? সেই নালন্দা কি আলেক্সান্দ্রিয়া টাইপ? সে কি হে? এদ্দিন বলনি'' তো। নাঃ, এবার তো তাহলে গতর নাড়াতে হচ্চে দেখচি। '

'আরে ধুর, সেসব না। এরা খালি প্রশ্ন করে। সে কি বিশ্রী নোংরা নোংরা কথা প্রভু, আপনি হয়ত শুনতেই চাইবেন না'।

'নোংরা প্রশ্ন করছে তোমাকে? বাহ বাহ, বেশ চনমনে ফীল করছি তো, দাঁড়াও বাপু, উঠে বসি, হ্যাঁ তোমার কোন কেচ্ছাটা নিয়ে প্রশ্ন তুলচে শুনি? সেই মামিকে নিয়ে ঢলাঢলির কেসটা? নাকি ছেলের বউ বিছানায় তোলার কেসটা? হেঁ হেঁ, বলি কেচ্ছা কেলেংকারির কি কিছু কমতি তুমি নিজেই রেখেছ? ইদিকে ষোল হাজার, উদিকে এগারো খান ইয়ে তারওপর লুটপাট করে তুলে আনা মালগুলো, মাঝে মাঝে তো মনে হয় তোমাকে শুধু বুঝি লাগাতেই পাঠাই, হ্যা হ্যা হ্যা'।

'উফফফফ ভাল্লাগেনা মাইরি। বলি আআআমাকে নিয়ে নয়, আপনি যে বইগুলো আমার থ্রু দিয়ে আমজনতাকে পাটিয়েচেন মানুষ হবার জন্যে..।

'দেখো বাপু, বার বার বলছি, ঘ্যান ঘ্যান কোর না। তুমি শালা কতটা কি গাঁজা খেয়ে বা খাইয়ে নাচনকেঁদন করে চাট্টি বই বিয়োলে, আর আমার নাম করে পাবলিককে বললে এসবই নাকি সত্য, কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক, এসব ধান্দাবাজির মধ্যে আমার নাম একদম নেবে না। লোকশাসনের বই লিখতে গেলে পড়াশোনা লাগে, ওই আম্বেদকর ছোঁড়াকে দেখে শেখো। যাগগে যাক। তা সেই নিয়ে কি হয়েছে?'

'আরে সে সব বই থেকে লাইন ধরে ধরে প্রশ্ন। কি সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি প্রশ্ন সে সব'

'সে কি হে, সব কটা বই থেকে প্রশ্ন?'

'নইলে আর বলছি কি প্রভু?'

'তার মানে ওরা তোমার অতগুলো গাঁজাখুরি পড়েছে? বাহ বাহ'

'বাহ বাহ? এই আপনার বিচার? আর সেখান থেকে হারামি গুখোরবেটাগুলো শক্ত শক্ত প্রশ্ন করছে যে?'

'উলি বাবা, নেকুপুষু আমার। লাত্তিলে কি খাবাল খাও সোনা? আমছাগলের মানছো দিয়ে, অসগোল্লার অস দিয়ে উটি? ন্যাকামো দেখে ইয়ে জ্বলে যায় মাইরি। বলি তোমারই লেখা ছাইপাঁশ থেকে তোমাকে প্রশ্ন করছে, তাও তুমি ধ্যাড়াচ্ছো, আবার আমার কাছে এসেচ নাকিকান্না কাঁদতে? শোন বাপু, মাথা গরম করিও না, তুমি এসো, আর যাবার আগে গ্লেনের বোতলটা এদিকে....

'প্রভু, প্রভু, শুনুন না, একটা নিবেদন ছিল'।

'উফফ, কি যমযন্ত্রণা মাইরি। বলে ফেল।'

'বলি প্রভু, এই গ্যাংটা কিন্তু আপনার নামেও যা তা বলছে।

'আচ্ছা, কি রকম শুনি?'

'বলছে আপনি নাকি নেই?'

'তো?'

'তো? তো?? তো??? আপনাকে না মানলে যে সৃষ্টিস্থিতিলয় কিচুই থাকবে না প্রভু'।

'সেটা তুমি আমাকে বুঝতে দাও না ডাল্লিং। তারে তোমার ইয়েতে এত কুটকুট করচে কেন হে?'

'আপনার অপমান কি আমারই অপমান নয় প্রভু?'

'উঃ কি সেন্টি মাইরি, পুরো সুখেন দাস! বলি দুনিয়াজুড়ে এতো যে কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে বসেচ তাতে আমার মানসম্মানের কি হাল সে নিয়ে কোন আইডিয়া আছে? যেখানে যেখানে পাঠিয়েছি, সেখানে সেখানে ছড়িয়েছ। বল্লুম, ভাইটি ইন্ডিয়াতে যা, ধর্মাধর্ম শিখিয়ে আয় দিকিন। তা বাপু যা শিখিয়েছ হে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ, দেখে ঘেন্নাপিত্তি চটকে যায়। শেষে চার্বাক আর কপিলকে পাঠিয়ে কিছু সামাল দেওয়া। তাপ্পর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লুম, যা তো বাপু, ওই মরুভূমির দিকটা একটু সামলে আয়, বাপ রে বাপ, কি ঝাম মাইরি। কি জিনিস বানিয়েছ বাপ? ইরাকে নাইজেরিয়াতে, পাকিস্তানে, কি ছেড়ে এলে বাপি? পালে পালে মেয়ে তুলে রেপ করছে, বিক্রি করে দিচ্ছে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে, বাচ্চা কেটে মা'' কে খাইয়ে দিচ্ছে, কি শিখিয়ে এলে চাঁদু?'

'ইয়ে, প্রভু, মানে ওগুলো ইয়ে, মানে সহিহ আমার ইয়ে না'।

'ইশশ, দিন দিন কি বিটক্যাওড়া ন্যাকাচৈতন পাবলিক হয়ে উঠছো খেয়াল আছে? কাল তো তোমার ছেলে নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে হেগে ফেললে বলবে এ আমার সহিহ ছেলে নহে!'

'প্লিজ প্রভু, খ''চে যাচ্ছেন কেন?'

'যাবো না? তারও আগে কি কম ছড়িয়েছ গ্রীসে? এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে চিত্তির করছো দেখে সেই খিটকেল দেখতে ছোঁড়াকে বল্লুম, যাও তো বাপধন, একটু যুক্তিতক্ক নেকাপড়া শিখিয়ে এসো, বলি সেই তাকেই যে ধরেবেঁধে যে বিষটুকু খাইয়ে দিয়ে এলে, বলি আমাকে জানিয়ে করেছিলে?'

'কি করবো স্যার, ওই লোকটা যে প্রশ্ন করতে শেখাচ্ছিল প্রভু, পুরো সিডিশন কেস যে!'

'বাহ বাহ, দুটো প্রশ্ন করতে না করতেই তোমার চেতিয়ে থাকা ঈমানদণ্ড নেতিয়ে পড়লো বাওয়া? পড়াশোনা কি এক্কেবারে অশ্বতরের গুহ্যদেশে দিয়ে এলে ভাইটি?'

'বাদ্দিন প্রভু, বাদ্দিন, যাদের কথা হচ্চিল, এদের কি করবেন?'

'কি আবার করবো? যুগে যুগে যা যা করেছি তাই তাই করবো? '

'মানে?'

'ইশশ, কি অশিক্ষিত মাইরি, মাধ্যমিকে হিস্ট্রিতে কত ছিল হে? মানে আবার কি ? ছোকরাগুলো কে আবার রেডি করো, আবার নামাতে হবে যে। বলি সে ছেলেগুলো কই? হোয়ের আর মাই বয়েজ?'

'ইঃ, এক্কাবারে মাই বয়েজ?'

'হ্যাঁ বাপু যতবার তোমার দালালগুলো আমার নামে খচড়ামি করা শুরু করবে, ততবার এই ছেলেগুলো তোমার ইয়েগুলোকে ঘেঁটে দিয়ে আসবেই।'

'বলি প্রত্যেকবারই তো বেঘোরে মারা যায়'।

'সেইটাই তো ওদের কাজ, মাই ডিয়ার, মশালে আগুনটুকু লাগিয়ে যাওয়া। মশাল একবার জ্বললে হাজার বছরের অন্ধকার কি আস্তে আস্তে পালায় বাপ, একেবারেই পালায়। তা বলি তারা কই? গেলবারে কি কি নাম দিয়েছিলুম যেন? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, রামতনু, শিবচন্দ্র...'

'যাবে আর কই? এক এক করে পাঠাচ্ছি অগত্যা। শুধু রাধানাথকে পাঠাতে একটু দেরি হবে। তা পাঠাবেন কোথায় শুনি?'

'বাংলাদেশে'।

'ফের? তা ভালো। তা পালের গোদাটিকেও পাঠাবেন নাকি? '

'সে তো পাঠাবই। সেইবার বেচারি বিষ খেয়ে মরেছে, গেলবার না খেয়ে, এবারে পাক্কা কোপ খেয়ে মরবে'।

'তবে গেলবার নামটা জব্বর দিয়েছিলেন, ডি-রো-জি-ও। বলি এবারে কি নাম দেবো প্রভু?'

'রায়, অভিজিৎ রায়'।

মার্কেট ভিজিট ১৭

মুড়ির ঠোঙা হাতে নিয়ে ছোকরার দিকে স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলাম!

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি শুনুন।

সেবার গিয়েসলুম জলপাইগুড়ি, বুইলেন। সে ভারী চমৎকার শহর। শান্ত, মধ্যবিত্ত, ভদ্ররুচির জায়গা। ছড়ানো ছিটোনো পাড়া, পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট একতলা বাড়ি, তাদের সামনে বাগান। দেখলেই হাওড়ার শিবপুরে আমার ছোটবেলার শান্ত ছায়াঘেরা পাড়াটির কথা মনে পড়ে যায়। তাছাড়া শহর জুড়ে অত বইয়ের দোকানের কথা ভুললেও চলবে না! একটা শহরে লোকে অত বই পড়ে দেখলেও ভালো লাগে। হাজার হোক, বই বেচুয়ে পাবলিক, কাস্টমার দেখলে ভারী আমোদ আহ্লাদ হয় এই আর কি!

কাজের সূত্রে জলপাইগুড়িতে অনেকবারই গেছি। লোকজন ভারী মিশুকে। দোকানদার থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা অবধি এমন মিঠে ঘরোয়া ভাষায় বাক্যালাপ করে থাকে যে মনেই হয় না ঘরের বাইরে আছি বলে। তার ওপর ডে লা প্রীতম বলে একটা চমৎকার হোটেল আছে, সেখানে সকালে জুতো পালিশ কমপ্লিমেনটারি! সেলসে চাকরি করার সুবাদে আজ অবধি দেশে বিদেশে অনেক হোটেলে থেকেছি, কিন্তু সাতসকালে ঘরে বেল বাজিয়ে "জুতো পালিশ করে দিই বাবু?" বলে মুচি এসে জুতো টেনে নিয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা অদ্যাপি কঁহি নেহি হুয়া!

বলতে বাধা নেই, উত্তরবঙ্গকে আমি বড় ভালোবাসি। তার অবশ্য কারণও আছে। জন্ম ইস্তক আমার বেড়ে ওঠাটা আদ্যন্ত শহুরে/ মফস্বলী হয়ে থাকলে কী হবে, গ্রামবাংলা দেখলেই হৃদয় আমার ময়ূরের মতো ট্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো জিঙ্গো জিঙ্গো নাচে রে করে ওঠে। জন্মসূত্রে আমি কাঠ বাঙাল, আমার চোদ্দ পুরুষ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষ। খুব সম্ভবত তাঁদের রক্তের টান চান্স পেলেই আমার শিরায় শিরায় ডান্স করতে থাকে বলেই গ্রামদেশের প্রতি আমার এই আদিখ্যেতা। তার ওপর বাপমায়ের আশীর্বাদে চাকরিটিও এমন করি যে মাসের বেশ কিছুটা সময় ভারতের "গাঁও দেহাত"এ কাটাতেই হয়। অস্বীকার করবো না, সেই সুযোগ আসা মাত্র বড়ই উৎফুল্ল হই। নিজের দেশ দেখার এই লোভটি আমার বড় প্রবল। গ্রামেগঞ্জের কোনও দোকানে বসে দোকানদার আর ক্রেতার দরকষাকষি আর সুখদুখ কী দো বাতেঁ শোনার মধ্যে আমি অতি বিমলানন্দ উপভোগ করি। ট্র্যা ক্টরের "আয়েল" কিনতে আসা মধ্যবিত্ত কৃষক, "ফারচুনার কা লুব্রিকেন্টওয়া" কিনতে আসা হঠাৎ বড়লোক, "ভটভটি"র তেল কিনতে আসা দরিদ্র অটোওয়ালা, এদের সঙ্গে কথা বলে দিব্যি সময় কেটে যায়। এই সুখটুকুর জন্যই আমার এই অতি অকিঞ্চিৎকর বেচুজীবনযাপন।

সে যাই হোক, বাজে কথায় বেলা চলে গেলো অনেক, কাজের কথায় আসি। কোথা থেকে কথা শুরু হয়েছিলো যেন? ও হ্যাঁ, সেই মুড়ির ঠোঙা।

যাচ্ছিলুম জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার। অমন ছায়াঘেরা, মিঠে রোদ্দুরমাখা ঝকমকে রাস্তার কথা বিস্তারে উল্লেখ করে আপনাদের ঈর্ষা উদ্রেক করবো না। শুধু বলে রাখি যে উত্তরবঙ্গের মতো এমন মায়াভরা চিকনসুন্দর জায়গা কমই দেখেছি। তা সেই ঝরঝরে শরতের সকালে যখন কম্পানীর ভাড়া করা ইনোভা চড়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করলাম তখন সকাল সাতটা নয়, পাক্কা সাড়ে আটটা।

সঙ্গে ছিলো বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ ইস্টের এরিয়া ম্যানেজার। সে ছোকরার সবই ভালো, দোষের মধ্যে স্বভাবে বড়ই কল্পনাপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যেমন ধরুন আপনি খুব মন দিয়ে এই মাসে কোন ডিস্ট্রিবিউটরটিকে চিকেন বানিয়ে মুর্গ মসল্লম খাবেন সেই পাঁয়তাড়া কষছেন, তার মধ্যেই ইনি হঠাৎ ছলছল চোখে, "আচ্ছা বস, কাল যদি আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের ব্যাথাটা চাগাড়

দিয়ে ওঠে তাহলে কী আপনার টার্গেট হবে?'', অথবা ''ধরুন কাল থেকে কম্পানী বললো যে কাজ করতে হবে না, এমনিই মাইনে পাবো, তাহলে কী সঙ্গে ইনসেন্টিভও দেবে? '' ইত্যকার বাজে ও ফালতু সেন্টিমেন্টাল, ডেকামেন্টাল এবং কিলোমেন্টাল ডায়লগ দিয়ে ব্যাপারটা পুরো ভেস্তে দেন। সচরাচর আমি এসব ছল্লিবল্লিতে বিশেষ পাত্তা দিই না, একসঙ্গে ট্যুরে যাওয়ার হলে গাড়িতে উঠে একটা বই খুলে অতি গম্ভীরভাবে চোখদুটো বইয়ের পাতায় চিপকে দিই।

তা এবারেও তাই হলো। আগের দিন রাতে নিতান্ত অকারণে গিন্নীর সঙ্গে ফোনে চাট্টি ফালতু ঝগড়া করে মন মেজাজ ভারী টকে ছিলো। ফলে সকালে রুম থেকে বেরিয়ে গ্যাটম্যাট করে গাড়িতে বসেই খুব ভারী এবং গম্ভীর গলায় ড্রাইভার ছোকরাকে বল্লুম, 'পৌঁছতে হবে জলদি কিন্তু গাড়ি চালাবে ধীরে, তাড়াহুড়ো একেবারেই করবে না আর টাইমের আধঘণ্টা আগে না পৌঁছলে তোমার নামে আমি এজেন্সিতে কমপ্লেইন করবো, মনে থাকে যেন।'

ছোকরা কী বুঝলো খোদায় মালুম। মুখটা খানিকক্ষণ তুম্বো করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর ছলছল চোখে বললো 'আচ্ছা স্যার। ধীরেসুস্থে চালিয়ে আপনাকে ঝড়ের বেগে আলিপুরদুয়ার পৌঁছে দিতে হবে, এই তো? চেষ্টা করছি স্যার।'

ইতিমধ্যে এরিয়া ম্যানেজার সাহেব ভারী চমৎকার পারফিউম লাগিয়ে চুপিচুপি আমার গাড়িতে এসে বসেছেন। বোধকরি আমার মেজাজ দেখেই সামান্য ম্রিয়মান মনে হলো তেনাকে। নইলে সচরাচর তিনি গাড়িতে উঠেই 'বস, যদি কালই ভূমিকম্প হয়ে চাদ্দিকে ধ্বসেটসে যায়, আর যদি কাদাখোঁচাকে হাঁড়িচাচা বলে বলে ভুল করি তাহলে কি আমি নেক্সট ইয়ারে প্রমোশন পাবো?' এইধরণের প্রশ্ন করতে থাকেন। আজ দেখলাম একেবারে স্পিকটি নট।

তিস্তা ব্রিজ পেরোবার পর দুটো রাস্তা আছে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার, একটা জামালদহ হয়ে, বাংলাদেশ বর্ডারের গা ঘেঁষে। তবে নেহাতই বাধ্য না হলে সে রাস্তা কেউ ধরে না। আমরা নিলাম সোজা রাস্তাটা, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা হয়ে সিধে যে রাস্তাটা আলিপুরদুয়ার পৌঁছচ্ছে সেটা।

গাড়ি সবেমাত্র ময়নাগুড়ি এসেছে, এমন সময় আমার হঠাৎ জ্ঞানবিতরণের অভ্যেসটা চাগিয়ে উঠলো!

ব্যাপারটা নিয়ে দু এক কথা খোলসা করে বলা দরকার। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে কচি ছাগলের শিং গজালে সে সর্বত্র তার ধার পরখ করে বেড়ায়। বাঁশগাছ বটগাছে তফাৎ করে না। আমার অবস্থাও খানিকটা তদ্রূপ। নতুন কিছু শিখলেই আশেপাশে সেই জ্ঞানের আলো বিকিরণ করার দুর্মদ ইচ্ছেটা আমার মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, নিজেকে বেশ লাইটহাউস লাইটহাউস ফীল হতে থাকে। কবি সেই কবেই গেয়ে গেছেন শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে ভাট বকা। আমি আমার অতি নিরীহ ও নিষ্পাপ সহকর্মীদের ওপর সেই অর্ধপক্ক জ্ঞান দোর্দণ্ডপ্রতাপে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করতে থাকি। তেনারা অতি সুশীল মানুষ, সহনশীল হৃদয়ে এসব প্রলাপ ন্যালাখ্যাপাষু ইগনোরবৎ করে থাকেন।

আগের রাতেই কোথাও একটা স্ট্যাচু বিষয়ক লেখা পড়ছিলাম। তাতে কোনও অশ্বারোহী শহীদ বীরপুরুষের স্ট্যাচুর অশ্বটির সামনের পা ওঠানো না নামানো সেইটা দেখে আরোহী সমরাঙ্গনে শাহাদাত নসীব করেছেন না শান্তির পায়রা ওড়াউড়ির সময় এন্তেকাল করেছেন সেটার ব্যাপারে ভারী মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। পড়ার পর থেকে রাতে ভালো ঘুম হয়নি, স্বপ্ন দেখছিলাম নাপোলিঁয় বোনাপার্টের সঙ্গে আউট্রাম ঘাটে বসে রাম খাচ্ছি, এমন সময় রাণা প্রতাপ কোত্থেকে এসে মাথায় গাঁট্টা মেরে বলছেন, ' ওই যাচ্ছে ঘটিগরম, ক্যাইক করে দুটো ঠোঙা নিয়ে আয় দিকি।'

সে যাই হোক, হজম না হওয়া সেই জ্ঞানরাজি পেটের মধ্যে বাসি হুইস্কির মতো গজগজ করছিলো। খানিকক্ষণ পর উসখুস করে সে নির্বিরোধী নির্বিবাদী ম্যানেজার সাহেবের উদ্দেশ্যে আলতো করে একটি প্রশ্ন নিক্ষেপ করলাম,

'ভায়া, কখনও শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজীর ঘোড়াটাকে দেখেছো?'

সে ছোঁড়া এতক্ষণ খুবই নিষ্প্রভ এবং ম্রিয়মান হয়ে গাড়ির এক কোণে বসেছিলো। প্রশ্ন শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোৎসাহে বললো, 'হ্যাঁ তো বস, দেখেছি তো। এই কালকেই রাজ মোটর্সে গেছিলাম মার্কেট ভিজিট করতে। সে যে কী বজ্জাত ডীলার আপনাকে কী বলবো! আচ্ছা, বস কাল যদি আমরা ওটাকে বন্ধ করে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে তাঁবু টাঙিয়ে ল্যুব বিক্রি করি?'

'পুরসভা আর পুলিশ যৌথভাবে এসে তোমাকে পালিশ করে যাবে', খুবই বিরক্তি সহকারে খেঁকিয়ে উঠি। কথা হচ্ছে ঘোড়া নিয়ে এমন সময়... 'বলি ঘোড়াটাকে কখনও ভালো করে দেখেছো কি?'

'দেখেছি বৈ কি!'

'দেখেছো তো বুঝলাম, তা সেই ঘোড়াটার মধ্যে বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছো ভায়া?' জলসাঘরের বিশ্বম্ভরবাবুর মত অটল আভিজাত্যের সঙ্গে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম। ডানহাতের কবজিটা অজানতেই নাকের কাছে উঠে এসেছিলো। সেখানে বেলফুলের মালা জড়ানো নেই দেখে নেহাত মনঃক্ষুন্ন হয়েই হাতটা সন্তর্পণে নামিয়ে নিলাম।

'হ্যাঁ তো, তাও করেছি বস।' খোকার স্বরে সেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আমাকে চমকে দেয়।

'সেটা কী?' নিজের স্বরে সন্ধিগ্ধভাবটা আর গোপন করা যায় না।

অবিমিশ্র সারল্যের সঙ্গে উত্তর ভেসে আসে, 'লক্ষ্য করে দেখেছি ওটা একটা পুরুষ ঘোড়া, বস।'

স্তম্ভিত হয়ে সে দিকে চেয়ে থাকি। অমন একটা স্থাপত্যের মধ্যে তুই শুধু ঘোড়ার ইয়েটাই দেখলি? হ্যাঁ রে, তোর চোখে কি ইয়ের ফিল্টার লাগানো আছে? এই অশ্লীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা তীব্র বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। বলি দেশ জাতি সমাজ, এদের কাছে তুই মুখ দেখাবি কী করে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা, কাদের নিয়ে সংসার করি!

ভাবতে ভাবতে নিজেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভাবার চেষ্টা করছি যে হাতিবাগান না বাগবাজার, কোনদিক থেকে এলে ঠিক বোঝা যাবে যে ওটা পুরুষ ঘোড়া কি না, এমন সময় একটা বিচ্ছিরি খুঁক খুঁক আওয়াজ শুনে দেখি আমাদের ড্রাইভার সাহেব গাড়ি চালাতে চালাতে প্রবলভাবে হাসি চাপার চেষ্টা করছেন!

আমরা দুজনেই একটু অবাক হলাম, বলাই বাহুল্য। সচরাচর সেন্টার থেকে ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভাররা অতি ভব্যসভ্য হন। প্রয়োজনের বাইরে একটিও বাড়তি কথা বলেন না। কোনও হাসি ঠাট্টার কথা তো ভাবাই যায় না। ইনি হাসছেন, এবং বেশ শব্দ করে, বডি কাঁপিয়ে হাসছেন।

'স্যার কিন্তু ভারী ইয়ে আছেন' ড্রাইভার সাহেব খ্যাঁক করে হেসে বক্তব্য পেশ করলেন।

'বটে?' ম্যানেজারবাবুর গলায় স্পষ্টই ঝড়ের আভাস।

'আচ্ছা স্যার,' এবার আমার উদ্দেশ্যে, 'আপনি কখনও শিবাজী মহারাজের স্ট্যাচু দেখেছেন?'

দেখেছি তো বটেই, গোটা চারটে বছর মুম্বাইতে কাটালাম, গাদাগুচ্ছের দেখেছি।

'আপনি মুম্বাই ছিলেন স্যার?' সে প্রায় লাফিয়েই ওঠে, 'আমি তো এগারো বচ্ছর ওখানে ছিলাম স্যার। ডোম্বিভিলিতে থাকতাম, আর এক বিল্ডারের গাড়ি চালাতাম।'

এইবার বেশ কিছু টুকটাক কথাবার্তা শুরু হয়। মুম্বাইয়ের লোক ও লোকাল, কাজ ও কর্ম, অটো ও বৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা শেয়ার করি।

এমন সময়ে সঙ্গী ভদ্রলোক ধরে বসেন, 'বস, মুম্বাইয়ের কিছু গল্প বলুন না।'

সেই লোকাল ট্রেনের গল্পটা দিয়ে শুরু করি। এক বেচারা দেহাতি লোকাল ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে কীরকম নাজেহাল হয়েছিলো সেই গল্প। তারপর বৃষ্টির রাতে অটো ধরে বাড়ি ফেরার গল্প। লোকাল ট্রেনেই কার একটা লুঙ্গি উড়ে যাওয়ার গল্প, ইত্যাদি। এবার দেখি খ্যাঁকম্যাক করে দুজনেরই সে কী হাসি! গাড়ি কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রায়!

ততক্ষণে বীরপাড়া পেরিয়ে গেছি, হাসিমারা আসবে আসবে করছে। জলদাপাড়ায় গাড়ি থামিয়ে চা বিস্কুট খাওয়া হলো। বলা বাহুল্য, এসব খরচা যাত্রীকেই মেটাতে হয়। চুক্তিমত এজেন্সিকে ড্রাইভারদের খরচা বাবদ যা পেমেন্ট করি তার মধ্যে খাওয়া খরচাও ধরা থাকে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এঁদের চা বা লাঞ্চ খাইয়ে থাকি বা টাকা দিয়ে থাকি। একে এঁরা যে টাকাটা পান সেটা হাস্যকরভাবে কম, তাছাড়া লম্বা জার্নিতে যাই, ড্রাইভার সাহেবরা খুশি থাকলে কাজেকর্মে একটু সুবিধা হয় আর কি! ক'টা টাকারই বা মামলা?

কুচবিহার পৌঁছত পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা। তারপর সেখানে কাজকর্ম মিটিয়ে যখন শঙ্কর হোটেলে ঢুকলাম তখন বাজে প্রায় দেড়টা, খিদের চোটে পেট চুঁইচুঁই করছে।

খাওয়া দাওয়া মেটাতে মেটাতে প্রায় সোয়া দুটো। লাঞ্চের পর একটা পান খাওয়া আমার বরাবরের শখ। সেসব বায়নাক্কা মিটিয়ে রওনা হতে হতে প্রায় আড়াইটে।

ফিরতি পথে যখন জলদাপাড়া পেরোচ্ছি, রাস্তার ওপর গাছের ছায়া ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে, এমন সময় ড্রাইভার সাহেব, (এতক্ষণে বছর তিরিশেকের ছেলেটির নাম জেনে গেছি, জামাল) ইরশাদ করলেন 'স্যার, জমিয়ে গল্পগুলো বলছিলেন মাইরি, আরও দু এক পিস ছাড়ুন না।'

কী আর করা। আগডুম বাগডুম দু একটা গল্প বলতেই হলো। খেয়াল করলাম বিকেল নেমে আসছে। চারদিকে ঘন জঙ্গল, বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ। মওকা বুঝে একটা চেনা গল্প বলতে শুরু করলাম,

'একটা গল্প বলি শোনো। অনেকদিন আগের কথা, বুঝলে। তখন দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর রাজত্ব। ভোপাল নবাবের একটা গোপন খবর নিয়ে আহমেদ খাঁ বলে একটা লোক যাচ্ছিলো সগরে। সগর মধ্যপ্রদেশেরই একটা শহর। একে সেই সময় দেশে আইনকানুন বলে কিছু ছিলো না, তার ওপর রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিলো খুব খারাপ, প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হতো। কারণ একদল লোক, বুঝলে কী না, গরীব পথিকদের সঙ্গে রাস্তাতেই আলাপ জমাতো। তারপর রাতের অন্ধকারে....'

গল্পটা বলতে লাগলো প্রায় মিনিট কুড়ি। এতক্ষণ দুজনের কেউ কথা বলেননি। গল্প শেষ হওয়ার পর ম্যানেজার সাহেব শুকনো ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় গলায় বললেন, 'জামাল, গাড়িটা একটু সাইড করো তো ভাই, ইয়ে করবো।'

শুধু তিনি কেন, গাড়ি থামিয়ে জামালও যেভাবে ঝোপঝাড়ের দিকে দৌড়ে গেলো, দেখে বোঝা গেলো যে প্রকৃতিদেবী অনেকক্ষণ থেকেই দুজনকে ঢালাও আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। গাড়ি তখন বীরপাড়া ছাড়িয়ে প্রায় ধূপগুড়ির কাছে। গাড়ি থামিয়ে ফের একপ্রস্থ চা জলখাবার খাওয়া হলো।

'আরেকটা গল্প শুনবে নাকি হে?' গাড়িতে বসেই বেশ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলুম।

সঙ্গী ভদ্রলোকটি হাঁ হাঁ করে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই জামাল সম্মতি জানিয়ে ফেলেছে, 'আরেকটা বলুন তো স্যার। তবে অত পুরোনো কালের গল্প নয়, স্যার। শুনলেই কেমন ভূতভুতুম করে। '

'একালের গল্প শুনবে? তাহলে শোনো,' এই বলে আমি আরেকটা চেনা গল্প শুরু করলাম, 'সাউথ কলকাতায় নেতাজীনগর আছে না? সেখানে আমার এক চেনা লোক থাকে, বুঝলে, নাম অতীন। বাপ মা নেই, একটা এফএমসিজি কম্পানীর ট্রেড মার্কেটিং এ চাকরি করে। খুব ভদ্র ছেলে, কোনও নেশাভাং নেই, ব্যবহার অতি মার্জিত। নেশা বলতে শুধু কিউরিও থেকে পুরোনো জিনিসপত্তর কেনা। এইভাবেই একদিন তার হাতে একটা একটা অদ্ভুত মূর্তি এলো....'

এটা শেষ হতে প্রায় মিনিট পঁচিশ। তখন ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে গাড়ি আরেকটু এগিয়েছে, তিস্তা ব্রিজ পার হবো হবো করছি। অখণ্ড নৈঃশব্দের মধ্যে ব্রিজটা পেরোলাম। তিস্তার শুকনো খাতে চাঁদের আলোয় বালি চিক চিক করছে। দু একটা বাইক ছাড়া আর বিশেষ জনমনিষ্যি নেই। আকাশে ভুতুড়ে চাঁদ, ঘোলাটে মেঘে আদ্ধেক ঢাকা।

এমন সময় ব্রিজটা পেরিয়েছি কি পেরোইনি, একটা চায়ের গুমটির সামনে গাড়ি থামালো জামাল। শুকনো গলায় বললো, 'একটু চা খেয়ে নিই স্যার?'

আমারও পরাণডা চা চা করছিলই, ফলে অনুমতি দিতে দুবার ভাবতে হয়নি। ম্যানেজার সাহেবকে দেখে মনে হলো সীটে পুরো জমে গেছেন, তেনাকে বোধহয় বেলচা দিয়ে তুলতে হবে!

সে যা হোক, তিনজনে নেমে টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলা গুমটির দিকে হাঁটা মারলাম। গিয়ে দেখি দোকানী ভদ্রমহিলা উনুনে সবে আগুন দেবেন দেবেন করছেন। জামাল দাঁত কেলিয়ে প্রশ্ন করলো, 'কী গো মাসি, আজ দেরী হলো যে বড়?'

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা পানের ছোপ ধরা দাঁত মেলে বললেন, 'ছেলেটাকে ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছিলুম বাবা। কয়েকদিন ধরে জ্বরজারিতে বড় কাহিল হয়ে আছে বেচারি।'

মাসি ভাইপোর এই স্নেহালাপ হয়তো অনেকক্ষণ চলতো। কিন্তু তখন আমি ফুল নাটুকে মুডে আছি, সাইত্যস্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই সুনীল! উনুনের অল্প আঁচের দিকে চেয়ে হেঁড়ে গলায় আবৃত্তি করলাম, ''নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে।''

বলেই গর্বে ইতিউতি চেয়েছি কি চাইনি, প্রৌঢ়া মৃদু হেসে বললেন, 'আরেকটুকাল বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে!'

আমি তো মাইরি টোটাল হুব্বা! মানে? হাই রোডের পাশের গুমটির মালকিন শঙখ ঘোষ আওড়াচ্ছে?

মাথা নাড়লুম, দিন দিন প্রেজুডিসড হয়ে যাচ্ছি। ভুলে গেসলুম যে এটা নর্থ বেঙ্গল। জায়গাটাকে আমি অকারণে এত ভালোবাসি না।

বাকি দুজন ততক্ষণ আয়েশ করে বসে গপ্প জুড়েছেন। কিছু পরে চা এলো। আমি আবার র''টী খাই। মাসি দেখলাম যত্ন করে একটু আদা আর চাট মশলাও দিয়েছে। তাতে চায়ের স্বাদ দিব্যি খোলতাই হয়েছে, আমি এক চুমুক খেয়ে সজোরে বল্লুম, 'বাহ, চমৎকার চা। সুন্দর চা। দিব্যি ভালো চা।'

চা খেয়ে দাম দিয়ে উঠে আসবো, এমন সময় জামাল বললো 'সে কী স্যার, উঠে যাচ্ছেন যে, মাসীর ইসপেসাল মুড়িটাই তো খেলেন না। ওটার জন্যই তো গাড়িটা দাঁড় করালাম।' বলেই একটা হাঁক পাড়লো, 'ও মাসী তোমার ইসপেসাল মুড়ি তিনটে দাও দেখি।'

তখন যে আমার মুড়ি খাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিলো তা নয়। তবে কি না ''ইসপেশাল'' মুড়িমাখা। ভাবলুম খেয়েই দেখি, খুব খারাপ হলে গাড়ি থেকে জানাল গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো না হয়।

এইবার ভদ্রমহিলা একটা উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ভাঙাচোরা মগে মুড়ি, বাদাম, চানাচুর, সর্ষের তেল নিয়ে মাখতে শুরু করলেন। যে সব রংচটা মলিন প্লাস্টিকের কৌটো থেকে ভদ্রমহিলা এসব মালমশলা বার করছিলেন সেসব দেখলেই সেই অনৈসর্গিক মুড়িমাখার ওপর থেকে ভক্তিশ্রদ্ধা চটে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবুও যাবতীয় বিতৃষ্ণা গোপন করে ওয়েট করতে থাকলুম, হায় আল্লা এসবও খেতে হবে নাকি এখন? তাও পয়সা দিয়ে?

মুড়িমাখা শেষ হলো, ভদ্রমহিলা তিনটে ঠোঙায় মুড়ি ঢেলে এগিয়ে দিলেন। পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে টাকা দিতে যাবো, এমন সময় দেখি জামাল বুক পকেট থেকে টাকা বের করে তার মাসিকে দিয় ঠোঙাগুলো নিজের হাতে নিলো। আমি সামান্য বিস্মিত হলাম, এমন তো হওয়ার কথা নয়। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর আমারই পেমেন্ট করার কথা।

তবে বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিলো। সে ছোকরা একটা ঠোঙা নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে ভারী সলজ্জ ভঙ্গিতে বললো, 'সারাদিন ধরে হেবি এন্টারটেইনমেন্ট দিলেন স্যার। নিন, এইটা আমার পক্ষ থেকে। আপনাকে খাওয়ালুম!'

মুড়ির ঠোঙা হাতে নিয়ে ছোকরার দিকে স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলাম !

খুব ছোটবেলায় একবার মামা''র হাত ধরে যাত্রা দেখতে গেছিলুম। সালটা উনিশশো চুরাশি নাগাদ, তখন আমার বয়েস পাঁচ কী ছয়। তখনও হাওড়ার মফস্বলে যাত্রাটাত্রা হতো, যদিও দ্রুতই সেই পাট উঠে যায়। যাত্রাটা ছিলো কোনও এক ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে, খুব সম্ভবত রাজা হরিশচন্দ্র। সে মশাই মেলোড্রামার একেবারে হদ্দমুদ্দ, কোথায় লাগে সুখেন দাস, কোথায় লাগে নিরূপা রয়! প্রতিটি সীনে সামনের শতরঞ্চিতে মহিলাকূলের রোলারুলি, এদিকে ওদিকে পূরুষ দর্শকদের মধ্যেও ফ্যাঁচফেঁচ। এদিকে কে তার নাক ভুল করে অন্য কারও লুঙ্গিতে মুছে ফেলেছে, সে নিয়ে আবার এক অন্য বাওয়াল।

তবে যেটা আশ্চর্য লেগেছিলো সেটা হচ্ছে যে যাত্রার শেষে মূল চরিত্রাভিনেতারা ধরাচূড়া পরেই সেই তিনদিক খোলা স্টেজে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছেন, আর দর্শকরা স্টেজে উঠে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে সামনে রাখা কৌটোতে প্রণামী রেখে আসছেন। বেশিরভাগই একটাকা বা দুটাকা দিচ্ছেন, পাঁচটাকা দান করা সেযুগে মস্ত বড় ব্যাপার ছিলো। কম লোকই তা করতে পারতেন।

তখন ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছিলো বটে। এখন বুঝি, যাঁরা সেযুগে যাত্রা করে আমজনতার মনোরঞ্জন করতেন তাঁদের টাকাপয়সা এতই কম ছিলো যে পারিশ্রমিকের কিছু টাকা এভাবেই উঠে আসতো।

শুধু কি তাই? তার মধ্যে কি কিছুটা প্রশংসাও মিশে থাকতো না? মিশে থাকতো না এই অনুচ্চ ঘোষণা, ''হে কলাবিৎ, আপনার অভিনয়নৈপুণ্যে আমি তৃপ্ত। দয়া করে তার স্বীকৃতি স্বরূপ এই একটি টাকা স্বীকার করুন?'' সেই একটি টাকার মধ্যে দয়া বা পুণ্যকামনার সঙ্গে শিল্পীর প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাও মিশে থাকতো না কি?

হোটেল পৌঁছনো ইস্তক সেই বিদুরের খুদ একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে খেলাম। তার যেমন সোয়াদ, তেমনই সুতার। এখনও জিভে লেগে আছে।

পাটায়াতে পটলকুমার

ইজ্জত একেবারে ধুলোমে পড়কে বিলকুল গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে হাওয়ার সঙ্গে উড় গ্যায়া!!!

ইণ্ডিগোর ফ্লাইটে রাত আড়াইটেয় ব্যাঙ্কক এসে পৌঁছে শুনি ভোর চারটের আগে ট্রান্সফার দেবে না। এদিকে এয়ারপোর্টের দোকানপাটও দেখি সব ঝাঁপতোলা। অতএব ক-এ কমললোচনে শ্রীহরি আবৃত্তি করা ছাড়া কিছুই করার থাকে কি? লোকজন ইতিউতি ঘুরতে লাগলো, আর আমিও কমলকুমার মজুমদারের ওপর অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর লেখা একটা বই নিয়ে একটা বেঞ্চে লম্বা হবো হবো করছি, ছফুট চার ইঞ্চি হাইট আর একশো কিলো ওজনের তিনসুকিয়ার সেলস অফিসার কার্তিক শুক্লা, আমাকে একবার হাল্কা করে জিজ্ঞেস করে গেলো লাগেজ খুলে একটা ওল্ড মঙ্কের লার্জ বানিয়ে দেবে কিনা। মাতাল আর কাকে বলে?

সাউথ কলকাতার সেলস অফিসার হরিকমল দেখলাম খুব হাসিমুখে আমার দিকেই আসছে। কি রে, ব্যাঙ্ককে নেমেই রাতবিরেতে এত আনন্দ কিসের তোর? লক্ষণ তো ভালো না, অ্যাঁ? সে ছোঁড়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালো একটা বেশ ফাঁকা রুম ও খুঁজে পেয়েছে, একদম খালি, কয়েকটা মাদুর টাইপের কি সব পড়ে আছে, আমি কি গিয়ে একটু গড়িয়ে নেবো?

শুনে তো আমি খুবই ইম্প্রেসড, বলে কি ছেলে? এয়ারপোর্টে আজকাল শিয়ালদা''র ডর্মিটরি খুলেছে নাকি? হাজার হোক সেলসের লোক.... জিজ্ঞেস করলুম, কি রুম রে? ছোকরা সেম হাসিমুখে জানালো, বাইরে লেখা আছে 'প্রেয়ার রুম' !!!

অর্থাৎ, নামাজ আদায়ের রুম! ছোকরার দোষ নেই, পেরথম বার বিদেশে এয়েচে!

সেলসের লোকেদের লাইফে স্কিম আর ইন্সেনটিভ, এই বস্তুদুটি লেগেই থাকে, যাগযজ্ঞে ওম এবং স্বাহা ধ্বনিদুটির মতই। তেমনই এক ইনসেন্টিভের পার্ট হিসেবে এই ব্যাঙ্কক যাত্রা। সর্বসাকুল্যে আটজনের টিম, পাঁচটি ফুলের মতই পবিত্র ও নিষ্পাপ সেলস অফিসার আর দুটো মুশকো টাইপের যণ্ডা চেহারার অত্যাচারী এ এস এম, সবমিলিয়ে সাতভাই চম্পা বললেই চলে, আর পারুল বোন হিসেবে আমি, ইস্ট রিজিওনের আর এস এম, শ্রীলশ্রীযুক্ত....

বাদ্দিন, তা সেই শবরীর প্রতীক্ষার শেষে যখন হোটেলে পৌঁছলুম, সুনয়নী রিসেপশনিস্টটি...

যাদের বাজে ইতরগন্ধী ছ্যাঁচড়াপনা অপছন্দ, তেনারা এখানেই ক্ষান্ত দিলে খুবই ভালো করবেন। এমনিতেই আমার লেখা কেউ বিশেষ পড়েটড়ে না। যেসব রুচিশীল শ্রদ্ধেয় লোকজন তাও ক্ষমাঘেন্না করে মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে দেখেন, এই লেখা পড়ে যদি তেনাদের ব্লাডপ্রেশার অকস্মাৎ গগনচুম্বী হয়ে পড়ে, রাতবিরেতে সরবিট্রেট হাতে ছুটতে পারবো না, আগেই কয়ে রাখলুম বাপু, হ্যাঁ।

যাগগে যাক, তা সেই সুনয়নী রিসেপশনিস্টটি পাসপোর্ট, বুকিং পেপার্স ইত্যাদি চেক করে রাগী ডলপুতুল টাইপের টোনে প্রথমে বললেন 'অল রুমস আর নন স্মোকিং, ইফ ইউ স্মোক, ওয়ান তাউজেন্দ বাত ফাইন', এতটা শুনেই ভাবছি কলকাতায় ফিরে ট্রাভেল এজেন্ট অভিষেককে তিনমাসের জেলই দেবো, না সাতদিনের ফাঁসি, এবং সময় তিনি কাংস্যনিন্দিত ন্ট্রে ফের বলে উঠলেন 'অ্যান্ড ইফ ইউ স্তিল আওয়ার তাওয়েল, দু তাউজেন্দ বাত ফাইন'!!

অয়ি সুন্দরী, আমাদের দেখে কি তোর তোয়ালেচোর মনে হচ্ছে, অ্যাঁ?

পরে বুঝলুম এঁয়াদের দোষ নেইকো। আমাদের দেশোয়ালি ভাইরাই নিশ্চয়ই কেউ এমত নিদর্শন রেখে গেছে আগে, নইলে এরাই বা অমন করে বলবে কেন?

এ বিষয়ে আমার এক পুরোন কলীগের কথা মনে পড়ে গেলো। ভদ্রলোক সমস্ত হোটেলের যাবতীয় জিনিসপত্র নিজের মতো করেই দেখতেন, একদম নিজের মনে করে। রুমে ঢুকেই চটপট সাবান, শ্যাম্পু, ময়েশ্চারাইজার, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, চিরুনি, টি ব্যাগ, সুগার স্যাশে ইত্যাদি যা হাতের কাছে পেতেন সে সওওব দ্রুত নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে, তারপর হাউস কিপিং এ ফোন করে 'এইও, তুম লোগ কা সার্ভিস তো একদম বেকার দেখতা হ্যায় রে, ঘরমে সামানপাতি রাখনেসে কি তোমলোগোকো খুব কষ্ট হোতা হ্যায় রে ব্যাটা' বলে সেইসব জিনিস আরেকদফা আনাতেন। আমরা বলাবলি করতাম দাদার বাড়িতে বিভিন্ন হোটেলের ছাপমারা চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে থেকে শুরু করে আদ্ধেক কনজিউমেবল ইত্যাদি যা আছে, উনি স্বচ্ছন্দে একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হোটেল খুলে বসতে পারেন।

তবে যেদিন দেখলাম দাদা হায়াত রিজেন্সির বাথরুমের মধ্যেকার জুতো পালিশের মেশিনটাকে খুব মনে দিয়ে দেখছেন, আর আমি হালকাচ্ছলে ' কি গো দাদা, এবার কি এটাও নিয়ে যাবার প্ল্যান কষছো নাকি' প্রশ্ন করাতে আক্ষেপের সুরে বলেন 'নারে, অত বড় ব্যাগ আনিনি', সেদিন ওনার প্রতি আমার সম্মান যাবতীয় ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করে ফেলে!

যাগগে, কি বলছিলাম যেন? হ্যাঁ। তা রুমে ঢুকে চটপট ফ্রেশ হয়ে পাটায়ার সী বিচে দৌড়ে গেলুম।

এবং অত্যন্ত নিরাশ হলুম। সরু একটা বিচ, নোংরা, কিছুই তেমন দেখার নেই, চাট্টি বিকিনিপরিহিতা সুন্দরী বাদে। এর থেকে মন্দারমণি কি তাজপুরও অনেক ভালো।

তবে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে রাস্তাটি, অর্থাৎ মেরিন ড্রাইভটি ভারি বাহারি। সুন্দর সাজানো গোছানো ঝকঝকে রাস্তা। তাতে নানা দেশীবিদেশী ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার পাশে মাঝেমাঝে ছোট ছোট কফি বা বিয়ারের ঠেক। মাথা তুললেই নীল আকাশ, তাতে উঁকি দিচ্ছে রাস্তার পাশে লাগানো পাম গাছগুলোর উঁচু মাথা। রাস্তার অন্যফুটে ছোট ছোট দোকান, সেখান থেকে দরদাম করে একটা চপ্পল কিনলুম। সে জিনিস আমি এখনও ব্যবহার করি, যেমন আরাম, তেমন টেঁকসই।

তারপর হোটেলে ঢুকে দেখি সাত ভাই চম্পা গোল হয়ে বসে, মধ্যমণি এক মহিলা, বয়েস আঠাশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যেই কিছু একটা হবে। বুঝলাম ইনিই আমাদের ট্যুরিস্ট গাইড। আমি ঢুকতেই সবাই সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দিলো, হাজার হোক আর এস এম বলে কথা, বয়সে, সম্মানে, পদমর্যাদায়....

ভদ্রমহিলা প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'হোয়েন আর ইউ গোয়িং তু বুমবুম?'

বুমবুম? সেটা আবার কি? ধূপগুড়ির আরতিপিসির নাতির নাম তো বোধহয় শুনেছিলাম বোধহয় এরকম কিছু একটা, নাকি বোমাটোমা নিয়ে কিছু বলছে? কেষ্টদা তাহলে আজকাল এদিকেই নাকি?

সাউথ বেঙ্গলের এ এস এম সুজন অত্যন্ত ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলো, (আমি টার্গেটের কথা বললেই ও গলাটা যেমন ভারি করে ফেলে) 'হোয়াত ইস বুমবুম? '

'ইউ দোন্ত নো হোয়াত ইজ বুমবুম? সাকিং ফাকিং ম্যাসাজ? গুদ প্লেস, বেরি গুদ গার্লস....'

ইজ্জত একেবারে ধুলোমে পড়কে বিলকুল গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে হাওয়ার সঙ্গে উড় গ্যায়া!!!

সেলস অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে খুবই গম্ভীর ভাবে বাঙালি জীবনে বাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ও টাকার অবমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ওপর তার প্রভাব, এই টাইপের একটা সিরিয়াস আলোচনা করার মতো মুখ করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। সুজন, আর বিহারের এ এস এম আশিস ঝা আমার বজ্রাহত মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই গলা খাঁকারি দিয়ে বল্লো 'নো বুমবুম', বলেই স্পষ্ট শুনলুম, আশিস চাপা গলায় যোগ করলো, ''নট নাউ''!

তারপর বেলা দশটা নাগাদ যখন গাড়ি চেপে নং নুচ ভিলেজে পৌঁছলুম, তখনও আমার বুমবুমের ঘোর কাটেনি।

নং নুচ ভিলেজ একটি কৃত্রিম গ্রাম, দুরন্ত সাজানো গোছানো, পর্যটকদের মনোরঞ্জনের যাবতীয় ব্যবস্থা মজুত। কিছু স্থানীয় কালচারাল শো দেখলাম, এদিকওদিক প্রচুর ফটো তোলা হলো। হাতিদের নিয়ে একটা

দুর্দান্ত ভালো শো হয়, যে কোন সার্কাসের থেকে শতগুণে ভালো। হাতিতে ছবি আঁকে, আর্চারি করে, ট্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো জিঙ্গো জিঙ্গো নাচে, ফুটবল খেলে, পেনাল্টি মিস করলে হতাশার ভঙ্গিতে মাথায় হাত, সরি শুঁড় দিয়ে বসে পড়ে, আবার গোল হলে হাইফাইভের ঢঙে হাইশুঁড় করে। মাঝেমধ্যে দর্শকদের মধ্যে কোনও ক্ষীণকটি মধ্যেক্ষামা স্কার্টপরিহিতা বিদেশিনীকে একবার শূণ্যে ঘুরিয়ে মাথায় তোলে, তাতে আবার বিপুল সিটি!!

আর আছে হাতিদের পিঠে চড়ে পুরো জায়গাটা একবার চক্কর দেওয়া, যাকে বলে রীতিমতো পরিভ্রমণ। বেশকিছু দেশীবিদেশী পর্যটকদের দেখলাম হাতির পিঠে চড়ে রাজকীয় আভিজাত্য সহকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মুখ প্রচণ্ড গম্ভীর, সেটা আভিজাত্য যাতে লিক না করে যায় তার চেষ্টা, না হাতির পিঠে ওঠার ভয় বোঝা মুশকিল!

তা এসব দেখেশুনে ভারি আহ্লাদ হলো। আমারও কবে থেকে শখ, হাতির পিঠে হাওদায় চেপে, যাকে বলে রাজেন্দ্রপ্রতিম আভিজাত্যে নগর পরিভ্রমণ করবো, লোকজন রাজামশাই বলে সেলাম ঠুকবে, ওপর থেকে দিব্যাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টি করবেন, পুরোহিতরা স্বস্তিবাচন আওড়াবেন, চারিদিকে ''জয় মহারাজের জয়'' ধ্বনি উঠবে..

ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে বেশ একটা ঘোরের মধ্যে একটা কচি দেখে হাতির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, টিকিট কাটবো কাটবো করছি, ও মা, হাতিটা ওমন ঘন ঘন মাথা নাড়াচ্ছে কেন? ও মাহুত ভাই, হোয়াত হ্যাপেন্দ?

ওপরের মাহুত বন্ধুটি আমার বরতনুটি যাকে বলে পরিপূর্ণরূপে অবলোকন করে ফিক করে হেসে বললেন 'এলিফ্যান্ত অ্যাফ্রেইদ স্যার, এলিফ্যান্ত রিফিউজিং'!!!

ইচ্ছে করে না, এইসব হাতিদের ধরে ধরে আইসিস এর হাতে গণিমতের মাল বলে তুলে দিয়ে আসি???

বিকেলে ফিরে আর হোটেলে ওঠা হলো না, সোজা আলকাজার শো। আমাদের হোটেলের একদম কাছেই অবিশ্যি।

এই শো'র দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। যারা নাচে তারা প্রত্যেকেই অপারেশন করিয়ে ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছে, (শ্রদ্ধেয় সরিৎদা বলছে টেকনিক্যালি বলতে গেলে এরা ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সভেস্টাইট, ট্রান্সসেক্সুয়াল কিচ্ছু নয়, সাপ ব্যাং বিচ্ছুও নয়, এদের কি বলবো আম্মো জানিনা মাইরি), তবে রঙে রূপে বর্ণে আলোতে নাট্যে বিভঙ্গে এ এক অনন্যসাধারণ শো। মনে হয় রামধনুর সাতটি রঙ সারা গায়ে মেখে কয়েকটি অনুপম সুন্দর মানুষী ম্যাকাও যেন সারা স্টেজ জুড়ে আলোকের এই ঝর্ণাধারায় আমাদের ধুইয়ে দিতে এসেছে। কি তার বাহার, কি তার ঔজ্জ্বল্য, যেন সত্যিই একঝাঁক রোদ্দুররঙা পাখিদের মতো এই আলোকউৎসব। এর কাছাকাছি উদাহরণ শুধু ব্রাজিলীয় রিও ডি জেনেইরোর বিশ্ববিখ্যাত কার্নিভালটি (তথ্যসূত্র- পনেরো বছর আগেকার এক ভুলে যাওয়া চ্যানেল, এফ টিভি)। বর্ণোজ্জ্বল পোষাকে, লাস্যনৃত্যে ও কটাক্ষপাতে, অহো, কি মোহময়ীই না ছিল সেই সন্ধ্যা!

তা সেসব দেখে খুবই মোহিত টোহিত হয়ে গাড়িতে উঠতে যাবো, ও মা!! দেখি পাঁচটি টিএসও ভেতরে জবুথবু হয়ে বসে, আর সেলসকুলমার্তণ্ড সেই এ এস এম দুজন দ্রুত গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি 'ওরে থাম, আরে ও ডেরাইভার ভায়া, রোককে রে বাবা, রোককে' বলে দৌড়ে যাবো, আশিস গ্যালগ্যালে টাইপের একটা হাসি দিয়ে বল্লো 'আপ রুমমে বৈঠিয়ে, হামলোগ এক ঘন্টে থোড়া ঘুমকে আতে হ্যায়!'

মানে? হ্যাঁ রে বেয়াক্কেলে ছেলে, তোর ঘাড়ের ওপর ক'টা মাথা আছে বলে তোর ধারণা, অ্যাঁ? আমি হলুম গে আর এস এম, বলতে গেলে ফ্যামিলির হেড, তুই কোন সাহসে আমাকে বাদ দিয়ে...

সুজন ভারি মিষ্টি গলায় (টার্গেট না হলেই ও গলাটা যেমন মিষ্টি করে ফেলে) বল্লো, 'আহা বস, তুমি একটু রুমে গিয়ে, ইয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসো না, আমরা জাস্ট একঘণ্টার মধ্যে একটু ঘুরে টুরে আসছি, আর হ্যাঁ, এই আমার রুমের এন্ট্রি কার্ড, অ্যাগদম নতুন একটা জনি ওয়াকার কাবার্ডেই পাবে। জাস্ট একঘণ্টা.... ' বলে দরজা বন্ধ করেই মাল ধাঁ!!!

রুমে বসে জনি ওয়াকার খেতে খেতে ব্যাটাচ্ছেলেদের মুণ্ডুপাত করছি মনে মনে, আর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের উৎস খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে, ফাঁকা করিডরে...

ওটা কি? আওয়াজটা কিসের?

একটা লম্বা ছায়া হেঁটে আসছে না? আলোটা হঠাৎ কমে এলো কেন? কার পায়ের আওয়াজ? ধীরেধীরে, কিন্তু নিশ্চিত নিয়তির মতন থপথপ আওয়াজ করে কে আসে এদিকে? বুকের ভেতরটা ধ্বকধ্বক করছে অজানা আশঙ্কায়, আস্তে আস্তে ছায়াটা দীর্ঘ হয়ে রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো, গলাটা শুকিয়ে কাঠ, একটা দীর্ঘ কালো হাত দরজা খুলে ঢুকলো, ক্যাঁঅ্যাঅ্যাচ করে একটা লোমখাড়া করা আওয়াজ...তারপরই

' বস, একটা লার্জ হবে?', অত্যন্ত কাঁচুমাচু মুখ করে সামনে কার্তিক শুক্লা।

যত্ন করে বসালাম, তারপর একটা লার্জ নিজে বানিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভারি মিঠে গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যাঁ রে বুঝভুম্বুল, কোথায় গেসলি রে তোরা? খুলে বলতো সন্টিমন্টি, একটু চিকেন নাগেটস আছে, খাবি নাকি? লে''জ এর চিপসও আছে দুপ্যাকেট।'

সে ছোঁড়া একচুমুকে প্রায় গ্লাস খালি করে একথাবায় সবকটা নাগেটস তুলে নিয়ে ব্রীড়ানতা নববধূটির মতই মাটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কোথায় গেছিলাম বলতে পারছি না বস, আপনাকে ওসব বলা বারণ, বুঝতেই তো পারছেন, পাটায়া বলে কথা, তবে কি না....'

'হ্যাঁ বাবা, তবে কি না... বল বল, খোলসা করে বল দিকিন। এই নে চিপস খাবি?'

সে ছোকরা খুবই দুঃখী দুঃখী মুখ করে চিপসের প্যাকেটটা খুলে মুখে প্রায় পুরোটাই ঢেলে দিয়ে বললে ' শেষ পর্যন্ত আর করে উঠতে পারলাম না! '

এতক্ষণে এরা কোন মহান রাজসূয় যজ্ঞে ঘি ঢালতে গেছিলো সেটা অল্প অল্প মালুম হচ্ছে বটে, কিন্তু ''শেষ পর্যন্ত আর করে উঠতে পারলাম না'' কথাটার অনেকরকম মানে হয়। ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে বোঝবার জন্যে সন্তর্পণে খেলিয়ে তুলবো ভাবছি...

এমন সময়ে করিডোরে সে কি গোলমাল!!! উঁকি মেরে দেখি পুরো পল্টন পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজের সৈন্যদলের মত বিধ্বস্ত হয়ে আসছে, পেছনে আশিস ঝায়ের রীতিমতো হাঁকডাক, যদি সেই সেখানে গিয়ে ভেতরে অবধি নাই বা ঢুকবি, তো যাওয়া কেন বাপু? আরে সবাই মিলে ধরে বসলো বলেই না আশিস নিয়ে গেলো সবাইকে? গুর্দা হোনা চাহিয়ে ইয়ে সব করনে কে লিয়ে, হাঁ। এই যদি হতো বিহারের টিম, আজকে পি পি ম্যাসাজ পার্লারে হাহাকার পরে যেত। ডরপোক বঙ্গালি লোকজনের জন্যে ওর নাক যে খুব বিচ্ছিরি ভাবেই কাটা গেছে, সেই কথাটাই রীতিমতো ফলাও করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শোনাচ্ছিল...

আমাকে দেখে তিনি প্রথমে হতচকিত হয়ে থেমে গেলেন তারপর হঠাৎ গলাটা অত্যন্ত আন্তরিক করে বললেন

' বস, ওয়াকিং স্ট্রিট চলেঁ?'

প্রধান যে রিঙ রোডটা সারা পাটায়া শহর ঘিরে আছে, মেরিন ড্রাইভটা ঠিক তার সমান্তরাল। আর এই দুটি রাস্তাকে সমকোণে কেটে খান দশেক যোগাযোগকারী গলি আছে, এরা বলে সয়। সয় ওয়ান থেকে সয় টেন, এই হচ্ছে রাস্তার নাম। বেশিরভাগ হোটেল এই সয়গুলো ঘিরেই। এর সঙ্গে প্রতিটি গলিতে আছে গাদাগুচ্ছের ম্যাসাজ পার্লার, আর ট্যাটু পার্লার। ম্যাসাজ পার্লারগুলোতে নর্মাল ম্যাসাজ তো হয়ই। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুবেশা থাইরমণীরা রীতিমতো হাতফাত টেনে ঢালাও আমন্ত্রণ জানায় ''ফ্যান্তাস্তিক বদি ম্যাসাজ'' এর জন্যে, এবং তার সঙ্গে ''বেরি গুদ বুমবুম গার্লস'' শুনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য কি এবং কেন!

বস্তুত, পুরো পাটায়া একটি, যাকে বলে নিষিদ্ধ আনন্দের শহর। ওখানকার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে শেয়ার বাস, ওরা বলে ভাট-বাস। যে কোন ভাট-বাসেই যেখানে যাবার জন্যেই উঠুন না কেন, প্রথম প্রশ্নই আসবে 'ওয়ান্ত তু গো বুমবুম?' সন্ধ্যের পর পাটায়াতে আপনি পর্যটক বা বিপণীবালা নহে এমন যে কোনও

থাইকন্যাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'অয়ি মনোহারিণী, কত ভাটের বিনিময়ে আপনি এই সুমনোহর রাত্রিটি এই অধমের সঙ্গে লুডো খেলিতে ইচ্ছুক?', চান্স অতি হাই যে উনি সামান্য দরদামের পর আপনার বুমবুমতৃষ্ণা নিবারণে রাজি হয়ে যাবেনই! বুমবুম ইহাদের ভিত্তি, বুমবুমই ইহাদের ভবিষ্যৎ!!!

তা এই দশ নম্বর সয় যেখানে মেরিন ড্রাইভে গিয়ে মিশেছে, সেখান থেকে সমুদ্রের ধার ঘেঁষেই, নেক্সট দুকিলোমিটার মতন রাস্তার নাম ওয়াকিং স্ট্রিট।

ওয়কিং স্ট্রিট নামকরণটি সার্থক, কারণ এখানে হাঁটাহাঁটি ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায়ই নেই, এমনকি বাইসাইকেল অবধি নিষিদ্ধ। তবে হেঁটে না ঘুরলে ওয়াকিং স্ট্রিটে যাওয়া না যাওয়া সমান, এ কথা রসিক জন মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। জনান্তিকে জানিয়ে রাখি যে ওটাই পাটায়ার ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের অমরাবতী!

পুরো ওয়াকিং স্ট্রিটটা আসলে প্রচুর বার আর তাদের বিশাল বিশাল রঙীন নিয়ন সাইনের মালা পরে থাকা একটি জ্যান্ত যৌন কার্নিভাল। ওই যে রাস্তার দুপাশজুড়ে হুল্লোড়ে ট্যুরিস্ট উপচে পড়া বারগুলি দেখিতেছেন, সেগুলি আবার যেমনতেমন বার নহে বাবাসকল, উহাদিগকে বলে গো গো বার। প্রতিটি বারে কয়েকটি করে বড় বড় গোল কাউন্টার, প্রতিটি কাউন্টারেই স্ফটিকনির্মিত আধারে মহার্ঘ মদ্যহস্তে দেশীবিদেশী মৌতাতলোভী পর্যটকবৃন্দ, আর মধ্যিখানে একটি বা দুটি থাই সুন্দরী লাস্যনৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। সময়, অবস্থা ও বারের কৌলীন্য বুঝে সুন্দরীদের পোষাকের পরিমাণ ওঠানামা করে থাকে বটে, তবে কিনা বাঁচোয়া এই যে, সচরাচর বারগুলোর কর্তৃপক্ষ এই সব অপ্সরীদের বিকিনির বেশি পরাটা খুবই অস্বাস্থ্যকর মনে করেন! তদুপরি সারা ওয়াকিং স্ট্রিট জুড়ে হ্রস্বতম বিচিত্র পোষাকে খরিদ্দার আকর্ষণের চেষ্টারত রাশিয়ান আর থাই বেশ্যাদের দল, তাদের বিলোল ছেনালি, হাসির হররা, হুইসল আর ভুভুজেলার আওয়াজ, ড্রামের আওয়াজ, মদ আর সিগারেটের গন্ধ, গো গো বারের উপরে ''স্পেশাল পিংপং শো'' দেখার জন্যে উদার আমন্ত্রণ বিলোনো দালালের দল (''এন্ট্রি ফি এইট্টি ভাত, ওয়ান বিয়ার ফ্রি''), রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুপাশে দুটি বেশ্যা বগলে ছবি তুলতে ব্যস্ত বিদেশীর দল, সব মিলিয়ে এমন জমজমাটি বাঁধনহারা শরীরী উল্লাসের নগ্ন উদযাপন আমি আর দুটি দেখিনি!!

তা এহেন আনন্দবাজারে আমরা ঢোকামাত্র আশিস টিএসওদের বগলদাবা করে উধাও! করুণ মুখে যা বলে গেলো, তার মোদ্দা কথাটা হলো এই যে, ছেলেগুলো পাটায়া এসে হবিষ্যি উইথ আলোচাল মাফিক শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়াবে, এই নির্মম কুনাট্য রঙ্গটি, যাকে বলে, তেনার নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়! আর এহেন বিহারি উদ্যোগপুরুষের পক্ষে জনসেবার এমন সুযোগটা ছাড়া কি উচিৎ, অ্যাঁ? তাছাড়া আমরা, অর্থাৎ আমি ও সুজন যদি একটু আধটু নিজেরাই ঘুরেটুরে দেখেটেখে নিই, তবে সেটাই এইসব নাদান পোলাপানদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না কি? হুইস্কি পেলে এমনিতেই আমাদের দুজনের আর কিছু লাগে না, এ কথা লাতেহার থেকে তিনসুকিয়া অবধি সব্বাই জানে, অতএব...

তা সব্বাই চলে যেতেই সুজনের প্রথম বক্তব্য, 'বস, মদ লাগে।'

এইজন্যে ছেলেটাকে আমি এত্ত ভালোবাসি। আমার মনের কথাটা টক করে বুঝে নেয়।

তা অনেক মনোজ্ঞ আলোচনার পরে একদম কাছের গো গো বারে ঢুকে পড়াটাই সাব্যস্ত হলো। সেখানে গিয়ে পেগ দুয়েক ব্ল্যাক লেবেলে কলজেটা ঠাণ্ডা করে, সূক্ষ্মতম রুমাল পরিহিতা থাইকন্যাদের পোলডান্সের সঙ্গে কুচিপুড়ি বা মোহিনীঅট্টমের একটা তুলনামূলক নৃত্যতত্ত্ব আলোচনা করে সবে বেরিয়েছি, দেখি সে এক অপূর্ব মনোহর দৃশ্য!

একটি গোরা নবদম্পতির (বয়েস দেখে নবই মনে হলো) পিছনে আবেদনপটিয়সী খানপাঁচেক থাইরমণী। প্রত্যেকের একই দাবি, ইহারা যদি ইহাদিগের নৈশক্রীড়ায় কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চবর্ধনমানসে অ্যাডিশনাল সঙ্গিনীমৃগয়ায় এসে থাকেন, তবে ওহে থ্রিসামপিয়াসী বন্ধু, আমিই তোমায় সে গান শোনাব রাতের বেলা! যদি একটিবার তোমাদের দলে নাও খেলায়... ইত্যাদি প্রভৃতি। খানিকক্ষণ বাদে নাস্তানাবুদ হয়ে সে নববধূটি

সরোষে কত্তাটিকে তাহাদের দিকে ঠেলে দিয়ে যা বললেন, তার বাংলা দাঁড়ায় ''রহিল তোদের এ পাপ ভাগাড়, (এই) ক্যালানে রে লয়ে থাকো''!!! নবকাত্তিকের মতন দেখতে ছোকরাটির অবস্থা হে মরমী পাঠক, নিজের মানসনেত্রে কল্পনা করে নিন!

দুজনেই রুমাল বার করে ঘাম মুছলাম। এই ট্যুরে গিন্নিদেরও নিয়ে আসার একটা প্রস্তাব উঠেছিল বটে, রিজিওনাল ম্যানেজার হিসেবে তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবের ওপর ভেটো প্রয়োগ করি। আজ নিজের দূরদর্শিতা দেখে ঝপ করে নিজের ওপরেই খানিকটা শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো, হাজার হোক রিজিওনাল ইয়ে তো বটেক...

ভাবতে ভাবতে গর্বে বুক ফুলিয়ে হাঁটছি, এমন সময়ে দুইটি রাশিয়ান তন্বী, (আহা,ভোল্গার মতই তাদের নীল আঁখি, উজ্জ্বল সোনার মতই তাদের গায়ের রঙ, ঝর্ণাধারার মতই তাহাদের হাস্যলহরী) দ্রুত আমাদের দিকে ধেয়ে এসে বিশুদ্ধ হিন্দিতে শুধোলে, 'হেই শারুখ, হেই অমিতাভ, চলেঁ? আচ্ছা বুমবুম করুঙ্গী, টু থাউজ্যান্ড ভাট, ওক্কে? চ্যলো।'

এই আকস্মিক আক্রমণে দুজনেই অ্যাজ ইউজুয়াল স্তম্ভিত ও দিশেহারা! দুজনেই ''ইক্কিরে বাওয়া'' টাইপ ভঙ্গিতে ঘনঘন মাথা নেড়ে বোঝালুম যে ন্না ন্না, আমাদের একটুও বুমবুমে মতি নেই, আমরা খুব ভালো লোক, আমরা শুধু চাদ্দিকে একটু ঘুরেটুরে দেখতে এইচি, আমাদের যেন এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া হয়, আমাদের খুব হিসি পেয়েছে, আমরা বাড়ি যাবো!!

দুই কন্যে তখন বিশুদ্ধ হিন্দিতে যা বললেন, তার মর্মার্থ এই যে এঁয়ারা আমাদের প্রত্যঙ্গবিশেষের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাতিশয় সন্দিহান তো বটেই, বা থাকলেও সেদুটিকে পাটায়ার সমুদ্রে ''চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'' বলে বিসর্জন দেওয়াটাই রীতিমতো উচিতকর্ম বলে তেনাদের দৃঢ় অভিমত। বিনামূল্যে এই দামী সদুপদেশখানি বিলিয়েই তাঁরা পরবর্তী শিকারের দিকে দ্রুত ধাবমান হলেন!

এই আকস্মিক ব্লিৎজক্রিগ্রের সামনে পড়ে গলাটলা শুকিয়ে গেছিলো, ফলে রাস্তার ধার থেকে একটা বিয়ার কিনে দুচুমুক মেরে দুজনেই একটু ধাতস্থ হতে বাধ্য হলাম।

তারপর আরও গভীরে গিয়ে দেখি কেস আরও গভীর! ওয়াকিং স্ট্রিটের একটু ভিতরের দিকের গো গো বারগুলো প্রায় সবই রাশিয়ান, তাদের বাইরে বিশাল বিশাল শোকেস, সেখানে সামান্য বস্ত্রাবৃতা হইয়া একাধিক রাশিয়ান নর্তকীরা নৃত্যরতা। উহা আসলে জীবন্ত ম্যানেক্যুইন, বারের অভ্যন্তরে আরও মনোহারী শো দেখিবার বিজ্ঞাপনী আমন্ত্রণ!

ততক্ষণে দুজনেরই কিঞ্চিৎ সাহস বেড়েছে, পারিপার্শিকের প্রভাবে না ব্ল্যাক লেবেল তথা হাইনিকেনের কল্যাণে, তা বলা মুশকিল। দুজনেই একটা উদার আভিজাত্যপূর্ণ হাসি বিলিয়ে ঢুকে পড়লুম।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম যে ইহা, যাকে বলে প্রিমিয়াম গো গো বার। কারণ এন্ট্রি ফি আশির জায়গায় আড়াইশো ভাট, (সঙ্গে একটি হাইনিকেন বিয়ার ফ্রি) এবং ঢুকতেই আসতে আজ্ঞা হোক বসতে আজ্ঞা হোকের ঘটা দেখলে নিজেকে জমিদার বলে ভ্রম হতে থাকে।

যে রাশিয়ান ভদ্রমহোদয়া কান এঁটো করা হাসি হেসে দুইজনার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন তাঁর উচ্চতা ছ ফুটের এক ইঞ্চি কম হবে না, আর কবজিটাই প্রায় আমার থাইয়ের সমান। হাতটা খুব সম্ভবত প্রেমপূর্বকই ধরেছিলেন, তবে কি না গত হপ্তাতেও একবার কবজিটা মচকে যেতেই কেন জানিনা সেই স্নেহময় পাণিপীড়নের কথা মনে পড়ে গেসলো !

ভেতরে গিয়ে বেশ একটা প্রশস্ত গদিআঁটা সোফাতে বসেছি, বিয়ার দিয়ে গেছে, ভেতরে পার্পল রঙের ধোঁয়াটে অন্ধকার বেশ চোখ সয়ে এসেছে, মিষ্টি হুক্কার গন্ধে ভরপুর আবহাওয়া এমন সময় একফুট দূরের স্টেজটি বেশ পরিস্ফুট হলো চোখের সামনে।

বেশ চওড়া স্টেজ, দেড় ফুট উঁচু মতন, ধীরেধীরে ঘুরছে। আর সেখানে পোলড্যান্সরতা চারটি উদ্ভিন্নযৌবনা রাশিয়ান কন্যে।

সত্যি বলছি, প্যারিসেও স্ট্রিপটিজ দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দরী খুব কমই দেখেছি জীবনে। বাইশ পঁচিশের বেশি বয়েস হতে পারে না। নীল চোখ, বাদামী চুল, পদ্মডাঁটার মতন হাত দুখানি, তিলফুল জিনি নাসা, আর গায়ের রঙ নিয়ে কিছু বলার কোনও মানেই হয় না। শরীরীসম্ভারের বর্ণনা করি এমন কলমের জোর আমার নেই। শরীরের মধ্যাঞ্চলটি দেখেই কালিদাসের সেই দিলতোড় শ্লোকটির কথা মনে পড়ে আর উত্তুঙ্গ বক্ষসৌন্দর্যদুটির প্রশংসা করার যোগ্য বিশেষণ আজ অবধি শিখিনি। মানুষের শরীরও যে কবিতা হতে পারে...

এমন সময় শ্রীমান সুজন তেনাদের নিম্নাঙ্গে পরিহিত অধোবাসটির দিকে আমার দৃষ্টি উল্লেখ করে আমার সেই আকণ্ঠ সৌন্দর্যসুধা পানে রীতিমতো ব্যাগড়া দিলেন। বেশ কিছু শাস্ত্রসম্মত আলোচনার পর দুজনেই সবে একমত হয়েছি যে আমাদের এক একটি রুমাল কেটে অমন দুটি করে অধোবাস হতে পারে, ইভন কিছু কাপড় হয়তো বেঁচেও যাবে, এমন সময় দেখি...

যাক্কলা, আমরা কি করলাম? হঠাৎ দেখি দুটি অপ্সরী মঞ্চ থেকে নেমে, বিলোলমদির নেত্রপাতে প্রেমসুধারস বিতরণ করতে করতে আমাদের দুজনের গা ঘেঁষে এসে বসলেন, মানে এক্কেবারে ঘেঁষে! খুব করে ঘেঁষে!!

গলা শুকিয়ে গেসলো, রবীন্দ্ররচনাবলী ছুঁয়ে বলছি মাইরি। খানিকক্ষণ কাষ্ঠহাসি হেসে রসালাপ করার পর আমাদের এহেন সৌভাগ্যের কারণ জানতে চাইলে তন্বীটি হাস্কি স্বরে জানালেন 'গিভ আস সাম টিপস!'

হাজার হোক সেলসের লোক, গলির ডাস্টবিনে মাছের কানকো আর মরা বেড়ালের ছানা ফেলে দেবার আগেও একবার ভেবে নিই, কোথায় ফেলছি, কেন ফেলছি, এবং এতে আমার কি উবগার হবেক! তাই গলাটা খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলুম, যে অয়ি বরবর্ণিনী, এত্ত লোক থাকতে আমরাই ক্যাঁও? ইত্যবসরে ঘাড় ঘুরিয়ে সুজনের দিকে তাকাতেই সুজন খুবই বিপন্ন গলায় (টার্গেট কেন হয়নি জিজ্ঞেস করলেই ও গলাটা যেমন বিপন্ন করে ফেলে) বললো, 'বস, এরা যা যা চায় দিয়ে দাও, কেটে পড়ি, অবস্থা ক্যাডাভারাস'।

ফলে একটা একশো ভাটের নোট বার করে দিতে গেছি, সেই তন্বীগৌরী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তেনার দেবতনুটি বিশিষ্ট বিভঙ্গে বাঁকিয়ে, শরীরের একটি বিশেষ ভাঁজ নির্দিষ্ট করে বললেন নোটটি সেখানে গুঁজে দিতে।

আল্লাহ কসম, সেই শরীরী ভাঁজটির উল্লেখ আমাকে মেরে ফেললেও করতে পারবো না!

নবারুণ পড়ার একটা বিচ্ছিরি সাইড এফেক্ট এই যে, প্রায় নেই হয়ে যাওয়া ছ্যাঁচ্চড় বিবেকটা মাঝেমধ্যে অকারণে চাগাড় দিয়ে ওঠে, পুষে রাখা অম্লশূলের মতই। সয় নাম্বার নাইন ধরে, টুকটুক চেপে হোটেলে ফিরে যাবার সময় একবার মনে হলো, সত্যিই কি রাশিয়া নামের দেশটা ড্রাগ মাফিয়া আর মাগি সাপ্লায়ারদের হাতে তামাদি হয়ে গেছে?

কি জানি, হয়তো গেছে। কমিউনিজমে কোনওদিনই রুচি ছিল না আমার, তদুপরি ঘোর অ্যান্টি সিপিএম, কিন্তু সোভিয়েত নারীর এই দুর্দশা দেখে কিছুতেই ভেতর থেকে খুশি হতে পারলুম না। কোথাও যেন মনে হলো আমার নিজের খুব নিজের কাউকে রাস্তায় টেনে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে!

কেন মনে হলো, জিগাইবেন না প্লিজ!

পরের দিন একটু তাড়াতাড়িই উঠতে হলো, আমাদের বুমবুমি গাইডটির দাবিদাওয়া ছিল সেরকমই। ফলে তখনও খোঁয়ারি না ভাঙা পাবলিককে টেনেটুনে পাটায়া জেটিতে নিয়ে গিয়ে দেখি একটা ওয়াটারজেট এক্কেবারে সেজেগুজে তৈরি।

তা সেই ওয়াটারজেটে করে মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে যখন কোরাল আইল্যাণ্ডে নামলুম, মাইরি বলছি, শুধুমাত্তর জলের রঙ আর বীচের ছবি দেখেই মনটা দিব্যি তরর হয়ে গেলো।

আগেই বলেছি যে পাটায়ার বীচ অতি জঘন্য। ইন্টারনেটে ''পাটায়া বলে সার্চ মারলেই যে সব দুর্দান্ত সিনিক বিউটিওয়ালা ছবিগুলো ভেসে ওঠে, সেগুলো আসলে পাটায়া থেকে একটু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

এইসব আইল্যাণ্ডের বীচগুলোর ছবি। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো এই কোরাল আইল্যান্ড।

ছোটবেলা থেকে দীঘা আর পুরী যে কতবার গেছি তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন রূপে বঙ্গোপসাগর ভালোই দেখা আছে। এছাড়া গোয়া, ভাইজ্যাগ, পণ্ডিচেরি, আন্দামান, চেন্নাই, কম সীবীচ দেখিনি জীবনে। এতদসত্ত্বেও প্রথম যখন কোরাল আইল্যাণ্ডে নামলুম, সেই অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যে মুহূর্তেকের জন্যে আত্মহারা হয়ে গেছিলুম, সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

প্রথমেই বলতে হয়ে এমন স্ফটিকস্বচ্ছ নীলাভ সবুজ রঙের জল আমি আজ অবধি কোনও সমুদ্রতীরে দেখিনি। জলে নেমে দাঁড়ালে জলের নিচে সাদা বালি স্পষ্ট দেখা যায়, সে জল এতই স্বচ্ছ। আর খুবই ফ্ল্যাট বীচ, মোটামুটি সমুদ্দুরের ভেতর কিলোমিটার খানেক গেলে তবে কোমরসমান জল ওঠে। পুরো ব্যাপারটাই চোখের পক্ষে যেমন আরামদায়ক, মনের পক্ষেও তেমনই প্রশান্তিকর। আর ঢেউয়ের যা বহর দেখলুম, আমাদের মাছের বাজারের জয়ন্ত ওর কই মাছ জিয়োনো বড় মুখওয়ালা হাঁড়িটাতে হাত ঢুকিয়ে জলের ওপর চাপড় মারলে এর থেকে বেশি ঢেউ ওঠে। এই ঢেউয়ে স্বচ্ছন্দে বিচে বসে হাঁটু অবধি জলে ডুবিয়ে আপনি দাস ক্যাপিটাল বা মোহমুদগর পড়তে পারেন, জাঙিয়া অবধি ভিজবে না, গ্যারান্টি দিলুম। তার ওপর গাঢ় ফিরোজানীল উজ্জ্বল আকাশ, বীচের অন্যদিকে সবুজ কালো পাহাড়, বীচের দুই সুদূরপ্রান্তে সমুদ্রের জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের ছবি দেখতে থাকা পামগাছের সারি, আহা, মায়াময় সেই সমুদ্রতীরটির ছবি এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

পুরো বীচটি বেশ চওড়া, অর্ধচন্দ্রাকারে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার ছড়িয়ে। অন্যদিকে বালি শেষ হলে রাস্তা, আর তার ওপর গাদাগাদা দোকান, খাবারের, মদের, বিভিন্ন স্যুভেনিরের ইত্যাদি।

একটা কথা বলে রাখি, পরে ভুলে যাবো, হার্ড লিকার আপনি অনেক ব্র্যাণ্ডেরই পাবেন পাটায়াতে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে হাইনিকেন ছাড়া আর কোনও বিয়ার পাওয়া যায় না! কেন পাওয়া যায় না সেটা বলা খুব মুশকিল। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই একই হাইনিকেন ষাট থেকে দুশো ভাটের মধ্যে বিভিন্ন দামে পাবেন, স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে। আইন্সটাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির এমন প্র্যাকটিকাল প্রয়োগ আর কোথাও দেখিনি বললেই চলে!!

তা কোরাল আইল্যাণ্ডেও দেখলুম একই ব্যাপার। বাহারি ওপেন রেস্তোরাঁতে যে হাইনিকেন একশো ভাটে বিকোচ্ছে, ঠিক দু পা দূরে এক থাই বুড়ি আর তার ছেলের হোগলাপাতার ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী দোকানে সেই একই হাইনিকেন ষাট ভাটেই সগৌরবে অ্যাভেলায়মান!!

তা সেরকমই একটি দোকান থেকে একটি বিয়ার তুলে, পুরো বিচটি, ভালো বাংলায় বললে, পরিপূর্ণরূপে অবলোকন করতে শুরু করলুম!

স্পষ্ট বুঝলেম যে এথনিক আইডেন্টিটির দিক থেকে, এই বীচটির তিনটি ভাগ। একদম ডানদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের আম জেনেগেন, একদম বাঁদিকে ইওরোপীয় তথা গোরা চামড়ার লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আর মধ্যিখানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পীতপাবলিক, অর্থাৎ হলদেম্যানেরা! প্রত্যাশিত ভাবেই মাঝখানে আর বাঁদিকে যেসব ফেয়ারার সেক্সের পরিব্রাজিকারা ইতিউতি পরিদৃশ্যমান, প্রত্যেকেরই পরণে নানা বর্ণের বিভিন্ন ডিজাইনের বীচওয়্যার, যত বাঁদিকে সরবেন, সাইজে তা ততই হ্রস্বতর হতে থাকে, একদম বাঁদিকে গিয়ে প্রায় ছায়ার মতই ধোঁয়াধোঁয়া হয়ে পড়ে, আছে কি নেই ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না!

ওয়াটারজেট তীর ছুঁতে না ছুঁতে, টিএসওরা তীরের মতই ছুটে বেরিয়ে গেসলো, কারও কোন খোঁজপত্তর ছিলো না। আশিস আর সুজনও উদাসমুখে "আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে" গাইতে গাইতে ধাঁ!

আমিও ভাবলুম যাগগে, আমি সামনে থাকলে এরা এমনিতেও একটু কাঠ হয়ে থাকে, আড়ালে একটু হুল্লোড় করুক গিয়ে। এই ভেবে বেশ প্রসন্ন হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে, হাতে একটা বিয়ার নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় নেহাত অবহেলা করেই সেই মধ্যিখানের জলকেলিরত পীতরমনীদের দিকে একটা আলতো করে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছি কি করিনি...

উরিত্তারা, ই ক্কি ক্কাণ্ড? সাধে কি বলে সেলসের ছেলে, অ্যাঁ? আমার এক ওল্ড বস বলতেন কমপক্ষে সাতটা করে অ্যানাকোণ্ডা মরে একেকটা সেলসের লোক জন্মায়। কথাটা যে ভুল কিছু নয় সেটা নিজেকে দিয়েই বুঝতাম..এখন তো..

প্রত্যেকটি ওস্তাদ টিএসএ দেখি সেই মধ্যিখানের বিকিনিনন্দিনীদের সঙ্গে দিব্যি হা হা হি হি এবং ভাব জমিয়ে সে কি কোলঘেঁষা অন্তরঙ্গ গল্প!! পুরো "সে কথা শুনিবে না কেহ আর, নিভৃত নির্জন চারিধার" কেস! তারপর তাদের গলা জড়িয়ে সেল্ফি তোলাতুলি, বা অন্যকে ডেকে সেই সিক্তবসনা স্বল্পবস্ত্রাদের সঙ্গে নিজেদের দ্বৈত ফটো তোলাবার ধুম দেখে, আমি তো মাইরি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত!!

দেশে ফিরেই এদের টার্গেট কতটা বাড়ালে ব্যাপারটা বেশ সুন্দর প্রতিশোধমূলক হবে সেইটে হিংস্রভাবে ভাবতে ভাবতেই দেখি এদিকে নিজের পা দুটো কিন্তু নেহাত অবাধ্যের মতই আরও বাঁদিকে চলেছে।

তা গিয়ে দেখি সাদা চামড়ার লোকজন বেশ খোলামেলা ভাবেই রোদ পুইয়ে চামড়াটাকে খোলতাই রকমের বাদামী করে তোলার সাধনায় মগ্ন। আমার একটু লজ্জা লজ্জা করছিলো বটে, তবে কিনা আগের দিন থেকেই মনটা কেমন নলেজ নলেজ করে হাঁপিয়ে উঠছিলো তো, তাই ভাবছিলুম গিয়ে ওই কৌপীনধারিণী স্বর্ণকেশী কন্যেটির কাছে গিয়ে কিছু গভীর তত্ত্বালোচনার অবতরণ করবো কি না। আহা, নেহাতই শুদ্ধ জ্ঞানার্জনের খাতিরে আর কি, যেমন ধরুন জেমস জয়েস পুঁইচচ্চড়ি ভালোবাসতেন কি না, বা থিওরি অফ রিলেটিভিটির ওপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব, অথবা ফুকো দিনে কতবার ফুঁকতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তা এইসব ভেবেটেবে মুখচোখে বেশ একটা গ্রাম্ভারি ইয়ে নিয়ে এগিয়েছি..

এমন সময় দেখি, একটু দূরে দাঁড়িয়ে পরের গাসের পানে মিটমিট্যায়া চায়্যা আসে কেডা রে?

দুটি কেশবতী কন্যে আক্ষরিক অর্থেই কটিমাত্র (একটিমাত্রও বটে) বস্ত্রাবৃতা হইয়া বীচ ফুটবল খেলছিলেন। তা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কার্তিক ভায়া জগতের এই আনন্দযজ্ঞে নিজেই নিমন্ত্রণ নিয়ে এসে হাজির। হাতে একটা বিয়ারের বোতল, খোলা কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এক ফেঁটাও খায় নি। একটা আনন্দবিহ্বল দীপ্তি চোখেমুখে। সারা শরীরে একটা রোমঞ্চের হিল্লোল স্পষ্ট।

আমি কাছে গিয়ে খুব স্নেহভরে মিষ্টি করে শুধোলুম, 'হ্যাঁ রে কাত্তিক, এখেনে কি করছিস? টার্গেট করার জন্যে কি কিছু অ্যাডিশনাল বাজেট ফাজেট পাবি?'

ছেলে চকিতে ঘুরে আমার দিকে তাকালো বটে, কিন্তু যাকে বলে রেকগনাইজ করতে খানিকক্ষণ সময় নিলো (স্বর্গের পারিজাতবন থেকে কঠিন রুক্ষ বাস্তবের জমিতে নেমে আসতে যতটা সময় লাগে আর কি!), তারপরেই একটা সলজ্জ হাসি হেসে বললো, 'না না বস, ভাবছিলুম ওদের যদি রেফারিটেফারি লাগে, তাই আর কি, হেঁ হেঁ। ইয়ে, এই বিয়ারটা আপনার কথা ভেবেই কিনেছিলাম, নিন ধরুন', বলে আমার হাতে ওর বিয়ারের বোতল ধরিয়ে ছোকরা যে দৌড়টা দিলো সেটা দেখবার মতন!

যত্তসব, পারভার্ট লোকজন, হুঁ। এই জন্যেই ইণ্ডিয়ার এত বদনাম বাইরে, সাদা চামড়া দেখলেই নালেঝোলে একাকার কাণ্ড... দুশ্চরিত্র লম্পট পাজির পাঝাড়া..

মনে মনে একচোট গালাগালি দিয়ে বেশ আয়েশ করে বিয়ারটা খেতে লাগলুম।

কোথায় খাচ্ছিলুম? কেন, ওইখানেই দাঁড়িয়ে তো!!

আহা, সত্যিই যদি ওদের একটা রেফারিটেফারি লাগে? আমার থেকে যোগ্য লোক ওরা আর পাচ্ছে কোথায় তক্ষুনি তক্ষুনি, অ্যাঁ? নেহাত ওদের অসুবিধের কথা ভেবেই আর কি, নইলে আমার আর কি বলুন? সকলের তরে প্রত্যেকে আমরা বলে হিতোপদেশে কি একটা কথা লেখা ছিলো না?

যাগগে যাক। তাপ্পর সারাদিন হুটোপাটি করে, জলকেলি করে দিব্যি চনমনে হয়ে উঠে যখন পাটায়া ফিরলুম, তখন প্রায় দুটো। লাঞ্চটাঞ্চ সেরে, দুপুরে একঘুম দিয়ে উঠে বিকেল সন্ধ্যে নাগাদ নিচে হোটেলের লবিতে বেশ একটা প্রসন্ন মেজাজ নিয়ে নেমেছি,

আবার সেই দৃশ্য!! সাতভাই চম্পা সেই গাইডটিকে ধরে বসে কি যেন একটা গম্ভীর আলোচনায় মত্ত!

আমি ঢুকতেই সবাই সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দিলো, হাজার হোক আর এস এম বলে কথা, বয়সে, সম্মানে, পদমর্যাদায়....

গাইড ভদ্রমহোদয়া চোখ টিপে বললেন, 'নো বুমবুম?'

অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললু'অ্যাগদম নো বুমবুম।'

চারিদিকে যা সম্মিলিত চাপা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনলুম, শেষ শুনেছিলাম সচিন তেন্ডুলকর ওঁর রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্স করার পর।

মহিলা আবার চোখ টিপে বললেন, 'দেন, রাশিয়ান শো?'

এইবার ঘেঁটে গেলুম। কাল রাত্তিরে রাশিয়ান গো গো বারে যা হেনস্থা হয়েছি তা আর কহতব্য নয়। এটা আবার নতুন কি সার্কাস হে? না করে দেবো কি না ভাবছি, এমন সময় সুজন গলাটা খুবই করুণ করে (অ্যাপ্রেইজালের সময় এলেই ও গলাটা যেমন করুণ করে ফেলে) বললো, 'ছেলেদের খুবই ইচ্ছে বস, না করাটা কি ঠিক হবে? আবার কবে এরা আসে না আসে... '

উহঃ, সেন্টিমেন্টের পুরো পাইনবন মাইরি!! আচ্ছা, চল, দেখি কি বস্তু এই রাশিয়ান শো!

সন্ধ্যে নাগাদ যখন রাশিয়ান শো''র অকুস্থলে গিয়ে সদলবলে বডি ফেল্লুম, তখন উমম, প্রায় ছটা মতন বাজে!

সিকিওরিটি দেখলুম হেবি টাইট। মোবাইল টোবাইল সব নিয়ে তো নিলই, তারপরে যা চেপেচুপে বডি সার্চ শুরু করলো, বেশ অস্বস্তিই হতে লাগলো। এসব আদিখ্যেতার বখেড়া মিটিয়ে হলের ভেতরে যখন ঢুকলুম..

দেখি গ্যালারির মতনই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, অর্ধবৃত্তাকারে, আর তার সামনেই সামান্য উঁচু স্টেজ, সমস্ত আলো শুধুই তাহারে লক্ষ্য করে। সিট আপনি নিজের ইচ্ছেমতন বেছে নিতেই পারেন, তবে কিনা প্রথম দুটো রো ততক্ষণে অনেকটা ভরেই গেছিলো। আমি, আশিস অ্যান্ড সুজন থার্ড রোতে বসলাম। টিএসওরা ইদিকউদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলো, দুয়েকজন আবার সাইড দেখে প্রথম রোতে গিয়েই বেশ গুছিয়ে যাকে বলে আসন পরিগ্রহ করলো।

হে পাঠক, যদি কখনও পাটায়াতে যাবার সৌভাগ্য হয়, আর ইতিউতি ঘুরতে ঘুরতে রাশিয়ান শোতে ঢুকেই পড়েন, অধমের এই চেতাবনিটি দয়াপরবশ হয়ে মনে রাখবেন, প্রথম দুটো একটু রো ছেড়ে বসবেন প্লিজ!

কারণ হ্যাজ!

তারপর শুরু হলো রাশিয়ান শো।

আগেই বলে রাখি, নির্মোকনৃত্য বা স্ট্রিপটিজ কম কিছু দেখিনি। প্যারিসের স্ট্রিপটিজ দেখে যে রীতিমত আমোদই পেয়েছিলুম ও প্রচুর বাহবা দিয়েছিলুম, স্পষ্ট মনে আছে। আগের রাতেই রাশিয়ান গো গো বারে হলিউডি সিনেমা মার্কা পোল ড্যান্স দেখে যে খুব ব্যাড লেগেছিলো তাও বলা যাবে না।

কিন্তু এই রাশিয়ান শো হচ্ছে আদিম যৌনতার নির্লজ্জ মাংসগন্ধী খেলা। সেসব খেলার বর্ণনা দেবো না। আমি কামগন্ধহীন নিকষিত হেম নই, নীতিপুলিশ তো নইই, কিন্তু আকাট যৌন সুড়সুড়ি মার্কা মাংসখেলার অযথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেইলস দিতে আমার সখত আপত্তি আছে।

তা তেনাদের একপ্রস্ত বিচিত্র ভঙ্গিমায় নগ্ননাট্য শেষ হলে আমরা একটু নড়েচড়ে নিজেদের একটু ''ঠিকঠাক'' করে নিচ্ছি, এমন সময়ে দেখি,

আইলা, ই ক্কিরকম দাবিদাওয়া? দু তিনজন নৃত্যপটীয়সী রমণীরত্ন দেখি মঞ্চ থেকে সহাস্যমুখে নেমে দর্শকবৃন্দের দিকে এগিয়ে হাতটাত ধরে ভারি অন্তরঙ্গ এবং উদাত্ত আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এই খেলায় তাঁদের সঙ্গী হতে। না, দর্শকাসন থেকে নয়, একেবারে মঞ্চে গিয়ে!!

তা জনগণ দেখলুম সেই দুরন্ত সম্ভাবনাময় মঞ্চসফল প্রযোজনাটির অংশ হতে মোটেই উৎসাহী নন। লোকজন টকাটক ছিটকে সরে যেতে লাগলো, দুয়েকজন গোরাচাঁদকে তো রীতিমতো হাত জোড় করে মাফটাফ চেয়ে পেছনের সিটে এসে বসতে দেখলুম। বাঁচোয়া এই যে বিনা স্ক্রিনটেস্টে হিরো হবার এই ঢালাও নেমন্তন্ন অবিশ্যি প্রথম দুটো রো''য়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মানে 'হ্যাঁ রে সন্টিমন্টি, একদম সামনে থেকে এইসব দেখার খুউব শখ, তাই না রে? আয় তো বাপধন, ইদিকে আয়, আমাদের সঙ্গে এট্টু ন্যান্নো ম্যান্নো খেলবি আয় দিকিন' টাইপের বার্তাটি ছিলো বড় স্পষ্ট আর কি!! প্রথম সারিতে উপবিষ্ট দর্শককুল দেখলাম এই অযাচিত সৌভাগ্যে ভারি বিব্রত হয়ে পড়েছেন, পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না!

তবে কি না তেমন করে ডাকলে ভগবান যে আর্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেনই, মুনিঋষিরা তা স্পষ্ট করে শাস্ত্রে লিখে দিয়ে গেছেন, এর অন্যথা হবার যো''টি নেই। তাই খুব সম্ভবত নিজেকে ভগবান টগবান ভেবেই একটি দেড়েল ভারতীয় যুবাপুরুষ সেই নির্বস্ত্র গোপিনীদের কাতর ডাকে সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন!!

সারা হলে চাপা খুশির হিল্লোল ছড়িয়ে পড়লো, সিটি আর হাততালির আওয়াজে কান পাতা দায়! উল্লসিত নর্তকীসম্প্রদায় তো তৎক্ষণাৎ তেনাকে বগলদাবা করে ভেতরে উধাও।

পাঁচ মিনিট পর যখন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হলো, মুখে একটা অত্যন্ত ক্যালানেমার্কা হাসি ঝুলিয়ে ভগবান দর্শন দিলেন!

শুদ্দুমাত্তর জাঙিয়াটুকু পরে!

তারপর যে বর্ণনাতীত সার্কাস শুরু হলো তার যুৎসই আলেখ্য হাজির করতে এই কিবোর্ডচির অঙ্গুলিগুলি বিলক্ষণ থরথরায়মান। সমবেত বুভুক্ষু ম্যাঙ্গো পিপলের সামনে একজন বেচারাটাইপ পুরুষ মানুষের মানসম্ভ্রম, ইজ্জৎ, মর্দানির ওপর যে এইভাবে কার্পেট বম্বিং করে ধূলিসাৎ করে দেওয়া যায়, আগে দেখি নাই! আনন্দ নিচ্ছিলুম খুবই, কিন্তু মনে মনে ভাবছিলুম, বাপ্পোস..কি ভাগ্যি আমাকে ধরে নিয়ে যায় নি!!

তা সেই ধূলোখেলা শেষ হলে ভদ্রলোকটি একটি সলজ্জ হাসি ঠেঁটে এবং পরনের বস্ত্রখণ্ডদুটি হাতে ঝুলিয়ে স্বদেশে ফিরে এলে তুমুল হর্ষধ্বনি ও শাবাশির মধ্যে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হলো, বীরের সংবর্ধনাই পেলেন প্রায়!

আমরাও মৃদুমধুর হাস্যধ্বনির মধ্যে পরের অ্যাক্টোর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় দেখি সেই অপ্সরারা আরেকজন হতভাগ্যকে প্রায় নড়া ধরেই স্টেজের উপর নিয়ে এলেন। আমরাও ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে নতুন মুর্গিটির দিকে চোখ তুলে চাইতেই...

চোখ দুটো কুলফিমালাইয়ের মতই জমে গেলো প্রায়!

এ যে হরি, আমাদের হরিকমল, সাউথ কলকাতার টিএসও!!

সারা হল জুড়ে খুশির হররা আর সিটির আওয়াজের মধ্যে আমরা সাতজন ক্রমেই যেন সোফার আরও ঢুকে যেতে লাগলুম। হরি, ওরে হরি, তুই কি করে এদের খপ্পরে পড়লি বাপ? এবার তোর কি হবে? তোর এই হেনস্থা এখন আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, অ্যাঁ? ওরে তোর ঘরে রাঙা টুকটুকে বউ আছে যে, চুন্নুমুন্নু বাচ্চা আছে দুটো...

গেলো না, সে বিপর্যয় কিছুতেই আটকানো গেলো না। বেচারিকে যে আর জামাটামা খুলে নেয়াপাতি ভুঁড়িটি জনসমক্ষে দেখাতে হয় নি, সেই যা রক্ষে, বাকি সব ঐ ঐ!!

তা সেই আধ ঘন্টার আনন্দ শো''টি খতম হলে হরি যে দৌড়টা দিলো সিটে ফিরে আসার জন্যে, সে দেখলে উসেইন বোল্ট অবধি হিংসেয় জ্বলে যেতে বাধ্য। অবশ্য হরিকে মাঝপথেই আবার ফিরে যেতে হয়, একদম শেষে যে তন্বঙ্গীটি হরির কোলে চড়ে বাৎসায়ন বাবুর প্রেস্ক্রাইব করা একটি বিচিত্র কসরত প্র্যাকটিসে রত ছিলেন, তেনার অতি সংক্ষিপ্ত অন্তিম অধোবাসটি তখনও হরির মাথায় লেপ্টে ছিলো। ভদ্রমহিলা সেটি উদ্ধার করে হরিকে যে হামিটি দিলেন, খুব সম্ভবত তার টানেই হরি বার বার পাটায়া ফিরে আসতে চাইবে!

ফিরে আসার পর হরিকে পাকড়াও করে আমি ধরা গলায় প্রথম প্রশ্ন করলাম, 'হ্যাঁ রে হরি, তোর কি আমাদের কথা একটুও মনে পড়লো না? তুই কি ভেবে ওখানে গেলি? বলি তোর ইচ্ছে ছিলো, নাকি জোর করে ধরে নিয়ে গেলো, সত্যি করে বল দিকিন। তোকে ধরে নিয়ে গেলো আর তুই হাসিমুখে চলে গেলি? না না করতে পারলি না?'

হরি মাথাটাথা চুলকে বললো, 'আসল, স্যার, এমন হাসি হাসি মুখে হাত ধরে টানলো, আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম, স্যার, আর না করতে পারলাম না'।

বুঝলুম, কামাখ্যাতে ভেড়া বানিয়ে রাখার গল্পগুলো তাহলে খুব মিথ্যে নয়! তবে কি না সত্যের খাতিরে আমি উল্লেখ করতে বাধ্য যে হরি গুপ্তিপাড়ার ছেলে, আর গুপ্তিপাড়ার ছেলেরা কি করতে পারে আর কি করতে পারে না, সে নিয়ে আমার মনে এখনও ধন্ধ আছে খুবই!

তার পরে যেটা ঘটলো সেটা অবশ্য এক্কেবারে অপ্রত্যাশিত, আমরা কেউই তৈরি ছিলাম না। একটি মুখোশধারী পুরুষ, (মুখোশ ছাড়া গায়ে আর একটি বস্তুই ছিল, সেটি ছোট্ট, পাতলা এবং রাবারের তৈরি, হিন্টটা ডিকোড করতে অসুবিধা হবার কথা নয়) আরেকটি নগ্নসুন্দরীকে (এনার গায়ে অবশ্য সুতোর আঁশটুকু অবধি ছিল না) বগলদাবা করে স্টেজে নিয়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে যা করতে শুরু করলেন...

সে সব আমরা শুধু অত্যন্ত, যাকে বলে হাই ক্লাসের সিনেমাতেই আজ অবধি দেখিয়া আসিয়াছি। সানি লিওনি, মিয়া খলিফা, পিটার নর্থ প্রমুখ সেইসব উচ্চথটের সিনেমার দিগবিজয়ী বিশিষ্ট কলাকুশলী। শুধু সেসব জিনিস চোখের সামনে বাস্তবে কাউকে করতে দেখলে যে গলাটা বিস্ময়ে বন্ধ হয়ে আসে, এইটে প্রথম উপলব্ধি হলো।

এর পরে আর কিছু দেখার বা বলার থাকে না। বেরিয়ে আসতেই হয়।

পাশেও একটি শো ছিলো, এই রাশিয়ান শো'' র অনুকরণেই, থাই শো। অতি উগ্র, নোংরা এবং বমনোদ্রেককারী। শরীরের অস্থান কুস্থান থেকে পিংপং বল বা ব্লেডের সারি বার করা, অথবা সেইখানে ব্লো পাইপ গুঁজে ব্লো ডার্ট দিয়ে মোমবাতি নেভানো, এতে গোদা শারীরিক কসরত থাকতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক উপভোগ্য আর্ট থাকতে পারে না।

যৌনতার প্রদর্শনীও একটি শিল্প বলেই মনে করি, দক্ষতা, পরিমিতি বোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান সেখানেও ততটাই লাগে যতটা লাগে নাইট ওয়াচম্যান আঁকতে বা ওয়েস্টল্যাণ্ড লিখতে।

তা ছেলেপিলেদের মন দেখলাম দিব্যি ফুরফুরে। আমিও খুশি, শুধু ভাবছি এই মওকায় পরের কোয়ার্টারের টার্গেটটা আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে এখনই কমিট করিয়ে নেবো কি না, এমন সময় দেখি আশিস আর সুজনের মধ্যে কি একটা চোখাচোখি হয়ে গেলো, সুজনও কি একটা ঈঙ্গিত করলো টিএসও দের দিকে, পাবলিক মুহূর্তের মধ্যে ধাঁ!!

এরপরে দুই মক্কেল ভারি অন্তরঙ্গ ভাবে গা ঘেঁষে এসে বললো, 'বস, চলিয়ে'।

কোথায় চলতে হবে জিজ্ঞেস করার আগেই দেখি একটা ভাট-বাস এসে হাজির এবং সেই গুণ্ডাগোছের ম্যানেজার দুটি আমাকে বেশ ভব্যতা সহকারে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিয়ে নিজেরা আমার দুপাশে বেশ আয়েশ করে বসলেন। বিনা প্রশ্নে যখন সেই বাস চলতে শুরু করলো, সন্দেহ হতে লাগলো, ষড়যন্ত্রটা পুরোটাই পূর্বপরিকল্পিত।

আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছিসই যখন তখন চল, শুধু এইটি মনে রাখিস ভাইডি, আর দুমাস বাদেই কিন্তু অ্যাপ্রেইজাল!

যদিও এদের ফুরফুরে মেজাজ, শেয়ানা মার্কা হাসি, আর নিজেদের মধ্যে ঠারেঠোরে নানারকম ঈঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিলো না যে এরা সেসব নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত। তা এসব ভাবনাচিন্তা শেষ হবার আগেই গাড়ি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো, আর এরা দুজনে তড়াক করে নেমে ''আসুন, বসুন, কি খাবেন বলুন'' টাইপের কান এঁটো করা হাসি হেসে আমাকে ক্যাঁক করে ধরে হাজির করলো..

একটা তিনতলা কি চারতলা বড় বাড়ি, বাইরে বিশাল বড় নিয়ন সাইন। জায়গাটা একটা গলির মধ্যেই, একটু অন্ধকার যদিও, বস্তুত ঝলমলে ওয়াকিং স্ট্রিট, বা সুন্দরী মেরিন ড্রাইভের তুলনায় জায়গাটা বেশ নিরেস। গেটের সামনে স্যুট কোট টাই পরে জনা দুয়েক স্থানীয় পাবলিক দাঁড়িয়ে, সতর্ক চাউনি ও কাঠকাঠ হাসি।

নিয়ন সাইনে লেখা ''পি পি ম্যাসাজ পার্লার''।

নামটা আগের দিনই কোথায় একটা শুনেছিলাম বলে আবঝা করে মনে পড়ছিল, কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। তা ম্যাসাজ পার্লার রংচঙে আর এত বড় হয় বাপের জন্মে দেখিনি, ভাবলুম এটাই বোধহয় ''নিখিল বিশ্ব দেহমর্দন সমিতি''র হেড অফিস। তা লোকজন দেখলুম ভারি শশব্যস্ত হয়ে আমাদের আদর ভেতরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিলো।

বেশ আরামদায়ক সোফা, কয়েক ইঞ্চি বসেই গেলাম প্রায়। আশেপাশে দেখলাম আরও অনেক সোফাতে আমাদের মতই অনেকানেক মহাত্মা উপবিষ্ট। প্রায় প্রত্যেকের কাছেই স্যুট টাই পরা ধোপদুরস্ত চেহারার খিদমদগারের হাজির, হাতে ছোট নোটবুক, নিচু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আলাপে ব্যস্ত। আরামদায়ক এসি, হালকা লাল আলো, ব্যাকগ্রাউন্ডে বিদেশী সঙ্গীতের মূর্ছনা, চট করে দেখলে পাঁচতারা হোটেলের রেস্তোরাঁ বলে ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু না।

কিন্তু দেখার বিষয় ছিলো সামনে। এ জিনিস আগে কোনওদিন দেখিনি, পরেও কোনওদিন দেখবো বলে মনে হয় না।

যে হলে বসেছিলুম সেটা কম করে হলেও তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের লম্বাটে হল। তার একটা সাইড ছাদ থেকে মেঝে অবধি কাঁচ দিয়ে ঢাকা। তার ওপারে প্রচুর আলো টালো ফোকাস দিয়ে রেখেছে। ছোটো ছোটো গ্যালারি টাইপের সিঁড়ি।

আর তার ওপরে বসা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন থাই মেয়ে!!

প্রত্যেকে বিকিনি পরে, যাতে অঙ্গসৌষ্ঠব স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রত্যকের ব্লাউজে গোল করে চাকতি আঁটা, তাতে নম্বর লেখা। কিছু চাকতি লাল, কিছু চাকতি নীল।

বিষয়টা বুঝতে কষ্ট হলো না, এটিই পাটায়ার সবচেয়ে খানদানি বুমবুমগৃহ। ইচ্ছেমতন চাকতির নাম্বার দেখে সঙ্গিনী বেছে নিন। নাম্বার বললেই কোটপ্যান্ট পরা দালালটি হাতের ইশারায় মেয়েটিকে উঠে আসতে বলছে আর এতক্ষণ ধরে অতল শূণ্যতা চোখে নিয়ে নির্নিমেষে সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকা মেয়েটি একটা শেখানো প্লাস্টিক হাসি মুখে ঝুলিয়ে পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে, তারপর তারা দুজনেই মিলিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির বাঁকে।

নবমীর দিনে লেকটাউনের হামিদের পাঁঠার দোকানের কথা মনে পড়লো। বিভিন্ন সাইজের কাটা পাঁঠা হুক থেকে ঝুলছে, কাস্টমারের দীর্ঘ লাইন। হামিদ চিল্লাচ্ছে 'ও দাদা রাং থেকে কতটা দিবো হাপনাকে? আর কলেজা? রাং চাই না? সিনা থেকে দিই? আরে ও আকবর, ছোটটার গুর্দা কাট বেটা, দুকিলোর বাটখারা চাপা, বাউদিকে দিতে হোবে', দীর্ঘ লাইনে সোল্লাস লোভ চোখেমুখে মেখে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেররা, ওজন আর সাইজ মিলিয়ে ঝুলিতে মাংসখণ্ড নিয়ে ঘরের দিকে দ্রুত প্রস্থান করবেন বলে, আহা দ্বিপ্রহরের স্বাদু ভোজনটির জন্যেই না এত কষ্ট স্বীকার!

একটা মোলায়েম হাসি ঝুলিয়ে অনতিবিলম্বেই এক স্যুটটাইধারী উপস্থিত হলেন, চোখেমুখে ''কাস্টমার ইজ কিং'' টাইপের আদিখ্যেতা। আমাকে গুছিয়ে কিছু বলবার আগেই আমার প্রশ্ন, কিছু মেয়ের চাকতি নীল আর কিছু মেয়ের চাকতি লাল কেনে?

সুসভ্য উত্তর এল, লাল চাকতি লাগানো মেয়েগুলো একটু বয়স্ক, দেড় হাজার ভাটেই লভ্য। নীল চাকতির মেয়েগুলো লতুন ছম্মকছল্লুঁ, টাইট কচি মাল, একদম নিউ ইন ট্রেড, আড়াই হাজার ভাটের নিচে এই দুর্মূল্য মাংসপিণ্ড কি আপনার হাতে তুলে দিতে পারি স্যার?

বুমবুমে আমার বিলক্ষণ রুচি আছে, আমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নই, এ বিষয়ে আমার ছুঁৎমার্গও একদমই নেই। কিন্তু এভাবে পয়সার বিনিময়ে নারীমাংস ভোগে আমার তীব্র আপত্তি আছে। ফলে এই বাঙালকে সেই বুমবুম হাউস থেকে নিজের যাবতীয় হাউশ নিবৃত্ত করে বেরিয়ে আসতেই হলো।

বাইরে এসে তিনজনে বিভ্রান্ত চোখেমুখে দাঁড়িয়েছি কিং করিষ্যতি অবস্থায়, আশিস সবিনয়নিবেদনমিদং ভঙ্গিতে যা বললো তার সরলার্থ এই যে, বসের তো এমন সেবাও যে সখত না-পসন্দ সে তো বোঝাই যাচ্ছে, তবে কি এই ঝানন্দনকে তার বসের জন্যে একটা লেডিবয়েরই ব্যবস্থা করতে হবে নাকি? বসের পচুন্দ যে ''ইটস ডিফারেন্ট'' সেটা আগে জানলে অবিশ্যি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা আগে হয়েই যেত... এতটা বলেই সেই দুই ভীষণদর্শন ম্যানেজারদুটি প্রাণান্তকর দৌড় দিতে যে বাধ্য হলো তার একমাত্র কারণ যে আমি, এবং আমার অত্যধিক হিংস্র মুখভঙ্গি করে দৌড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা, সেটা অনুমান করতে বেশি কষ্ট হবার কথা নয়। অবশ্য তিনজনেরই যে যথেষ্ট বয়েস ও যথেষ্টতর ভুঁড়ি হয়েছে সেকথাটা মাথায় থাকলে এই অপচেষ্টা করতুমই না, বলাই বাহুল্য। ফলে তিরিশ সেকেণ্ডের মাথায় কোমরে হাত দিয়ে হ্যা হ্যা করতে করতে তিনজনেই ডিসিশন নিলুম যে অগত্যা পাটায়ার শেষ রাতটা ফের ওয়াকিং স্ট্রিটেই কাটানো যাক।

পরের দুদিন কাটাই ব্যাঙ্ককে। সেখানেও বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা করে এসেছিলুম স্পষ্ট মনে আছে, যেমন একরাত হাজতে কাটানো, সুজনের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রভৃতি। তবে কিনা আমার গুরুদেব বলেছেন 'সব গুফন কথা হগগলডিরে কইয়া ফালান ঠিক না', আর আমার যে ''যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়'' কেস, এ কথা আসমুদ্র লেকটাউন জানে। ফলে ''পাটায়াতে পটলকুমার'' কাহিনীর নটেশাকটি আপাতত এইখানেই মুড়োলো। পরে যদি কোনওদিন মেজাজ মর্জি দিব্যি শরিফ থাকে, সেই হুইস্কিভেজা সন্ধ্যায় সেসব কথাও না হয় আয়েশ করে খুলে বলা যাবে''খন, কি বলুন, অ্যাঁ

একটি শোকাহত ভ্রমণকাহিনী

আমি না কিচুতেই বুইতে পাচ্চি না যে এরা এরম বিহেভ কচ্চে কেন! আপনি এট্টু দেকুন দিকি মশাই, কি কেস...

পুরী এসেছি গতকাল ভোরে। সচরাচর ম্যানেজারদের নিয়ে মান্থলি মিটিংটা আমি কলকাতায় অফিসেই সেরে নিই। তবে লাস্ট দুটো কোয়ার্টার খুব ভালো পারফর্মেন্স করার পর ছেলেরা ধরে বসলো যে জানুয়ারির মিটিংটা কলকাতার বাইরে করতে হবে।

আজকালকার ছেলেপিলে, কবে কার মতিগতি বিগড়ে যায় কে জানে, তাই রাজি হতেই হলো। এমনিতেও লাস্ট কোয়ার্টার শুরু হয়ে গেছে। থার্ড কোয়ার্টারে কয়েক ইঞ্চির জন্যে নর্থ রিজিয়ন আমাদের ফেলে গেছে এগিয়ে। এখনইই তো সময়, খাইয়ে পরিয়ে, তুইবে বুইয়ে, ধুয়েমুছে এদের মার্কেটে নামিয়ে দিতে হবে। টার্গেটের ওপরেও এক্সট্রা একশো কিলোলিটারের মামলা, এরা যদি ''উর্ধগগনে বাজে মাদল'', বা ''শুণ্ডিরও দেবো পিণ্ডি চটকে'' গাইতে গাইতে একশো কিলোলিটার নামিয়ে দেয় তাহলে...জয় জগন্নাথঅ... ভাবতেও বুকটা সামান্য কেঁপে উঠলো...এই দরিদ্র কায়স্থসন্তানের পকেটে কিছু ইনসেন্টিভ ঢোকে। যদিও অতিইইই সামান্য, তবুও মানি ইজ মানি দাদা, হানি বললেই চলে। মেয়ের হায়ার স্টাডিজ , হোম লোনের ইএমআই...জীবনে কি লোড কম নিয়েছি, অ্যাঁ?

কালকে মিটিং এর হদ্দমুদ্দ করে, প্রেমাশ্রুর সঙ্গে বাবা বাছা মিশিয়ে, তিন পৌয়া ইমোশনের সঙ্গে কিলোখানেক ধমকধামক পাঞ্চ করে ইহাদের টার্গেটটি গিলাইয়াছি। শেষে চিরতার জলের সঙ্গে কুইনাইন মিশিয়ে খেলে যেমন মুখ হয়, তেমন মুখ করে ছেলেপিলেরা বায়না ধরলো পরের দিন চিল্কা যাবে,

চিংড়িভাজা দিয়ে হাণ্ড্রেড পাইপার্স খাবে আনলিমিটেড, আর সেই বিমলানন্দে আমি যেন 'তাউজী জ্যায়সা টিকটিক করকে' বাধাদান না করি!

ইনসেন্টিভের অ্যামাউন্টটার কথা মনে করে অপমানটা স্রেফ হজম করে গেলুম, বুইলেন। আমিও তক্কে তক্কে আছি, আসুক অ্যাপ্রেইজাল.. তোরই একদিন কি আমারই...

তারপর দুপুর নাগাদ এসে সতপড়া এসে পৌঁছেছি। দরদাম করে একটা বোট নিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে জলপথ পরিভ্রমণে (উভয়ার্থেই) নিবিড় মনোযোগ দিয়েছি, এমন সময় প্রথম কেলো!

আমার টিমের বঙ্গাধিপতি ভদ্রলোক এমনিতে জিমটিম করে একটি দেড় বা আড়াইপ্যাক মার্কা বডি বানিয়েছেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোক রোডেশিয়ান কুত্তা থেকে টিকটিকি অবধি বেহুদ্দ ''ডরিয়ে'' থাকেন। আজ তিনি সতপড়া নেমেই বললেন যে আমরা যেন জলবিহার সমাপ্ত করে সহি সলামত ফিরে আসি এই কামনা বুকে চেপে ইনি একটি ওল্ড মঙ্কের ফুল বটল হাতে তীরেই অপেক্ষা করবেন!

কেন রে সোনা? তোর বুঝি জলে ভয়?

তারপর তিনি যতই ''অমাবস্যাতিথিতে শুক্রবার পড়লে শিবুখুড়ো জলের নামতে খুব করে মানা করেছে'' বা ''বাবার ছোটমেসোর মেজোপিসিশ্বাশুড়ির ননদের গুরুদেব বলেছিলেন যে পুকুরের পাশে একানড়ে থাকে.. ' টাইপের যুক্তির অবতারণা করুন না কেন..আমরা তো মশাই সমবেতভাবে ভদ্রলোকের খিল্লি উড়িয়ে নেচেকুঁদে একশা।

অবশেষে উনি আমাদের সঙ্গ দিতে রাজি হলেন!

এইবার তিনি বোটে চড়েছেন। বডি ল্যাঙ্গুয়েজে স্পষ্ট যে অত্যন্ত টেনশনে আছেন। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সিটের হ্যাণ্ডেল দুটো এমনভাবে ধরে আছেন যেন স্পুটনিকে বসে আছেন, এই উড়লেন বলে..এমন সময় বোটটা অযথাই দুলে উঠলো।

এরপর ভদ্রলোক আমার প্যাঁকাটির মতো সরু হাতটা আঁকড়ে ধরতেই যারপরনাই বিরক্ত হলুম। অমন তরিবৎ করে বানানো নেশাটি, তারপর চিল্কার হাওয়ায় দিব্য ধুনকিটি জমে উঠেছে, এমন সময় এমন ইল্লুতেমার্কা ব্যাভার কার রে?

পেচুন থেকে খ্যাঁকম্যাক ধ্বনি ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেলস অপারেশনস ম্যানেজার পদাধিকারী মহিলাটি কানে কানে আমাকে জানালেন, ' বস, আশিসজী বোট হিলা রহে হ্যাঁয়'।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে সেই উত্তরপ্রদেশনাথের প্রতি একটি বজ্রকঠিন হুঙ্কার ছাড়লুম, 'আশিস, বোট মত হিলাও। হিলানে কে লিয়ে আউর ভি বহুত কুছ হ্যায় তুমহারে পাস!'

বলে ফের ঘাড় ঘুরিয়ে সমাধিস্থ হতেই খেয়াল করলুম যে বোট জুড়ে আশ্চর্য নৈঃশব্দ নেমে এলো! কেন কে জানে!

যাই হোক, তারপর ডলফিনের নাচনকেঁদন দেখে, (উফ, চাট্টি কচি ডল্ফিনের পেছনে মশাই কম করে খান পঁচিশেক বোট, তাতে কিলো কিলো লোক পিলপিল করছে.. বেচারিরা মাথা তুলতেই গগনভেদী রব উঠছে, ' ওই যে ওই দিকে।' সে বেচারারা তো 'বিশ্বাস করুন স্যার, আআআমরা কিছু করিনি' টাইপ ভঙ্গি করে যে বেগে চম্পট দিচ্ছে, খুব সম্ভবত থাইল্যাণ্ডেই গিয়ে ল্যাণ্ড করবে মনে লয়!) আমরা চল্লুম ডোপ না ঝোপ এইরকম সরল নামের দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

দ্বীপের মাঝখানে অস্থায়ী ঝুপড়ি গাদাখানেক। সেখানে গিয়ে নামতেই একটা বুড়োমত লোক বেশ অভ্যর্থনা করেই নিয়ে গেলো ভেতরে। দেখেই মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। আহা, আমার মধ্যে যে বেশ একটা রাজকীয় আভিজাত্য আছে, সেটা তো আর অস্বীকার করলে চলছে না দেখছি!

আমি তো একটা রংচটা প্লাস্টিকের চেয়ারে আমার এই রাজকীয় বপুখানি স্থাপন করা মাত্র চারটি পায়াই বালির মধ্যে অর্ধেকখানি গেঁথে ফেলে প্রবল ক্যাঁচকেঁচ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। আমি

তাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে নীলদর্পণের ব্রিটিশ সায়েবের মত, ''হেই খেডমটগার, ব্রাণ্ডি লাও, ব্লাটি পানি লাও'' আদেশ দিয়ে ''তাজা বতাজা'' গান গাইতে লাগলুম।

বলা বাহুল্য ব্রাণ্ডির বদলে এক কোয়ার্টার রদ্দি হুইস্কিই এলো। প্রথমে ভাবলুম বুড়োকে বাছাবাছা দিই কিছু। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে মালুম হলো যে এই দ্বীপে এই যে পাচ্ছি তাই ঢের!

তারপর লোকজন তো খ্যা খ্যা করে হেসে, নেচে কুঁদে, আজাইরা প্যাচাল পেড়ে জায়গাটাকে যা নরক গুলজার করে তুললো তা আর কহতব্য নয়। তার ওপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বুড়ো হাতের কাছে গরমাগরম প্রণফ্রাই দিয়ে যেতেই দিব্যি চনমনে হয়ে চেগে উঠলাম। সমুদ্দুরের হাওয়ায় খিদেটাও পেয়েছিলো জব্বর। তারপর হুইস্কি যে ক্ষুধাবর্ধক, সে কথা সুরসিক মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য। আমি তো প্রসন্ন মুখে 'বেশ বেশ ' বলে দুটো ডোঙা টেনে কাজে লেগে পড়লুম।

তারপর মশাই বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের হাই থট ভাবতে ভাবতে তো আমি তো প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে গেছি। আমার আবার প্রতিভা খুবই উমদা কি না, ব্রহ্মযোগে প্রায় উঠে গেছিলুম আর কি! মানে সাধনফাধনের টপ লেভেল মেরে এনেছি প্রায়, ইড়া পিঙ্গলা ইত্যাদি হাত ধরাধরি করে নেচেগেয়ে সহস্রারে পৌঁছে যায় যায় করছে, জাস্ট টিকিটের পয়সা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখার ওয়াস্তা, এমন সময় কানের কাছে শুনি খুবই শুকনো স্বরে কেউ বলছে, 'আপনি কি আরও প্রণফ্রাই খাবেন?'

তাকিয়ে দেখি সবাই খুবই ক্ষুধার্ত ও বেদনাহত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে, আর আমার হাতের কাছে সাতপ্লেট, থুড়ি সাতডোঙা প্রণফ্রাইয়ের ধ্বংসাবশেষ!

এসব ক্ষেত্রে গম্ভীর হতেই হয়। আমি গলাফলা ঝেড়ে বুড়োর উদ্দেশ্যে কম্বুকণ্ঠে একটা হাঁক পাড়লুম, 'কি কাকা, আর প্রণ নেই?'

ও মা, বুড়ো দেখি দাঁতফাঁত বার করে যা জানালো তার মর্মার্থ এই যে ''বড়াবাবু''র এইরকম রাক্ষুসে মার্কা ক্ষিদে পেয়েছে সেটা তার অভিজ্ঞতার র‍্যাতডারে ধরা পড়ে নাই। এই লেভেলের দানবীয় খিদে দেখে সে চট করে তার নাতিকে জাল হাতে জলের ধারে এইমাত্তর বসিয়ে দিয়ে এইচে ..'চিঙুরি' ধরা পড়িলেই সে আরও কয়েক প্লেট তাজা প্রণফ্রাই ভেজে দিতে পারবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তার আছেই !

চারিদিকের সেই হিংস্র নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমি শুধু শুকনো ঠোঁট চেটে এইটুকুই জিজ্ঞেস করতে পারলুম, 'ইয়ে, প্রণ ছাড়া আর কিছু নেই?'

বুড়োর হাসি আরও চওড়া হলো 'চা আর চিপসঅ আছে ভাইনা!'

তা সেই চিপসই এলো, সঙ্গে হলদে রঙের কাপে জণ্ডিস রঙের চা গোলা। চারিদিকে প্রসন্ন দুপুর, সাগরের জল ছলাৎছলাৎ করে পা ধুইয়ে দিচ্ছে, মিঠেকড়া রোদ আশেপাশের বালিতে ছড়িয়ে আছে লাবণ্য হয়ে। এরই মধ্যে আমি ছেলেপিলেদের অসম্ভব বিতৃষ্ণ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সেলস ম্যানেজারদের অবশ্যকর্তব্য আর ঘোরতর দায়িত্ব বুঝিয়ে চলেছি, এমন সময় দেখি কি একটি অতি নিরীহ গোছের নখদন্তহীন কেঁউসর্বস্ব একটি নেড়ি এসে আমাদের উৎকলাধিপতি ম্যানেজার, নাম হরিপ্রসাদ, তার পায়ের কাছে বসে অতি নিরীহ ভাবে লেজ নাড়তে ভুকভুক করতে লাগলো। ভাবখানা যেন 'কি দাদা, এট্টুস চিপস হবে নাকি? হবে না বলছেন? তাহলে প্রণফ্রাই? তাও না? তাহলে কী আছে, রাজভোগ? বিরিয়ানি? মাটন দোপেয়াজা? হাক্কা চিলি চিকেন? বাদশার এগরোল? প্যারামাউন্টের শরবৎ? শ্রীহরির রাবড়ি? গোলবাড়ির কষা মাংস? কি বললেন? এসব কিছুই নেই? তাহলে এসেছেন কেন এখানে? এটা কি নাট্যশালা, অ্যাঁ? এটা কি নাট্যশালা? দেব নাকি ঘ্যাঁক করে...'

এইভাবে দুইজনের মধ্যে আলাপ ঝালা ইত্যাদি বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় কেউ একজন যেন পেছন থেকে বললো, 'শায়েদ ইস ডগি নে হরি কো পসন্দ কর লিয়া।'

আমিও তক্ষুণি তেড়েফুঁড়ে উঠে সমর্থন করে (আহা, এমনিতেই পাঁকে পড়ে আছি, এখন একটু ''আমি তোমাদেরই লোক'' ইয়ে না দেখালে চলে কি করে?), দ্রুত ঘাড়ফাড় নাড়লুম 'হাঁ হাঁ জরুর। আওর হরি কো

ভি ডগি বহোত পসন্দ হ্যায়, মুঝে পতা হ্যায়।' বলেই একটা শ্রীচৈতন্য মার্কা উদার হাসি বিলিয়ে হরিপ্রসাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম, ' তাই না হরি? তুঝে ডগি বহোত পসন্দ হ্যায়, নেহি ? উসদিন ইওর ওয়াইফ ওয়াজ অলসো টেলিং মি দ্যাট। শি সেইড শি অলসো লাইকস ডগি আ লট!'

সঙ্গে চারিদিকে এত খুঁকখুঁক হাসি কেন শুরু হলো কে জানে? আমি কি তেমন হাসির কিছু বল্লুম? আপনারাই বলুন দেখি। আর তার ওপর সেই ভর দুপুরে হরির চোখেমুখে যা জিঘাংসা দেখলাম, আমার তো ইয়েটা কেমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো। আমি চটপট করে বল্লুম 'ওরে চল, বেলা যে পড়ে এলো, বাসনায় আগুন দে, ওঠ...তোদের যে খেলা শেষই হতে চায় না দেখছি।' এই সব ইত্যকার বলে ঝটপট করে সেই বোটে চড়ে বসলুম।

ফের সেই বোট চলেছে। চারিদিকে অখণ্ড শান্তি। আমাদের বোটে কেউ কোনও কথা বলছে না। প্রত্যেকের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তীরে পৌঁছোবার ওয়াস্তা, তারপর আমারই একদিন কি এদেরই একদিন। আমি তো মশাই সদ্যবোধিপ্রাপ্ত তথাগত''র মতন শান্ত সমাহিত হয়ে চাদ্দিকে দেখছি। ডলফিনদর্শনাভিলাষী ব্যাকুল পর্যটকেরা নিজনিজ কুলায় ফিরে গেছেন। স্থির জলে পড়ে আছে শেওলা, চিপস-কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল আর লোভী সভ্যতার অশ্লীল থাবা। আমিও নেশার ঝোঁকে ভাবছি এই নিয়ে একটা জ্বালাময়ী পোস্ট যদি ফেসবুকে ছাড়ি তাহলে কটা লাইক আর কটা শেয়ার আসার চান্স হউছি। এমন সময় খেয়াল করলুম পেটের মধ্যে কে যেন একবার চুঁই করে উঠলো।

কে রে?

কে আবার, আমার পেট। আরে হ্যাঁ মশাই, আমারই পেট। স্তম্ভিত হয়ে পেটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হ্যাঁ রে, এই মাত্র সাতপ্লেট প্রণফ্রাই বুকে টেনে নিলি, তার ওপর আবার এখনই এসব কিসের আবদার?

কিন্তু ভবা ভুললেও ভবী ভোলে না। তাকে অনেক তুইয়ে বুইয়েও যখন বাগে আনা গেলো না, তখন আমাদের টিমের একমাত্র মহিলা সদস্যাটিকে বললাম, 'হ্যাঁ রে, খাওয়ার কিছু আছে?'

টের পেলুম ছ''জোড়া চোখের অবাক অবিশ্বাসী দৃষ্টি আমার দিকেই তাক করা। স্বাভাবিকভাবেই পাত্তা দিলাম না। অত লাজলজ্জা থাকলে মশাই এ বডি টেঁকানো মুশকিল, দেখছেনই তো মাগ্যিগণ্ডার বাজার...

খুঁজেপেতে একটা পট্যাটো চিপসের প্যাকেটই এলো। বুভুক্ষুর মতো সেই ছোট্ট প্যাকেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম বললেই চলে।

কিন্তু না, হাতে তখনও সেই প্রণফ্রাইয়ের তৈলাক্ত সুবাস লেগে। যতবারই হাত দিয়ে প্যাকেট খোলচেষ্টা করি, সে শুধুই পিসলাইয়া পিসলাইয়া খ্যয় দেহি! অনেকক্ষণ কসরৎ করার পরেও ব্যাটা যখন বাগে এলো না, গান্ধীজির কথাটা মাথায় এলো। মহাত্মা বলেই গেছিলেন করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! ফলে খুবই হিংস্রভাবে চোখমুখ পাকিয়ে দাঁত বার করে প্যাকেটটা ছিঁড়তে যাচ্ছি, এমন সময় সেই ভদ্রমহিলা খুবই বিরক্তি সহ বললেন, ' আমাকে দাও, আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি।'

আমিও তৎক্ষণাৎ গ্যালগ্যালে হাসি হেসে প্যাকেটটা তেনার হাতে দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ ভাই ছেঁড় তো, তুই ভালো ছিঁড়িস!'

তারপর?

তারপর আর কী! হোটেলে এসে চুপচাপ বসে আছি আর মশার কামড় খাচ্ছি। দু একজনকে ব্লেণ্ডার্স প্রাইডের লোভ দেখিয়ে ডাকলুম বটে, বিশেষ পাত্তাটাত্তা দিলো না।

আচ্ছা, এরা অমন কচ্ছে কেন বলুন তো? আমি কী তেমন ভুল কিছু বলেছি, অ্যাঁ?

সুরা, নারী এবং সেলসের চাকরি

ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে সেলসে চাকরি পেয় খুবই আনন্দের সঙ্গে খবরটা যখন আমার শ্বশুরমশাইকে সোল্লাসে জানাই, ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ থেকে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'সেলস ছাড়া আর কোনও প্রফেশন পছন্দ হলো না বাবা?'

প্রৌঢ় মানুষটির মনোকষ্টের কারণ বুঝতে অবশ্য বেশী দেরি হয়নি। সেলসের লোকেদের নিয়ে প্রচলিত ধারণাই হচ্ছে যে এরা আদ্যন্ত মিথ্যাবাদী, ওভারস্মার্ট, দেখানেপনায় অভ্যস্ত, সুরাসক্ত এবং দুশ্চরিত্র! এমন ছেলে জামাই করে কোন শ্বশুরই বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বলুন?

প্রথম তিনটি অভিযোগের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। সেলসের চাকরিতে এত বিচিত্র চরিত্রের লোকের সঙ্গে সদাসর্বদাই ডিল করতে হয় যে একটা বাহ্যিক চালাকচতুরতা এসেই পড়ে। বস্তুত অত্যন্ত সহজসরল মাটির মানুষ হলে সেলসে টিকে থাকা একটু মুশকিল। এখানে একটু বাগ্বিস্তারের দরকার আছে। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে সেলসে সফল হতে গেলে এক্সট্রোভার্ট হওয়াটা অন্যতম আবশ্যিক শর্ত। কথাটা আদ্যন্ত ভুল। চালাকচতুর হওয়ার সঙ্গে এক্সট্রোভার্ট বা ইনট্রোভার্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই, আমার দেখা সবচেয়ে প্রতিভাবান সেলস ম্যানেজাররা প্রায় প্রত্যেকেই খুবই ইন্ট্রোভার্ট। কিন্তু তাঁরা অসামান্য ধীশক্তির অধিকারী, যুক্তিতর্কে তথ্যে তত্ত্বে প্রতিপক্ষকে অনায়াসে ফালাফালা করে দিতে সিদ্ধহস্ত। মোদ্দা কথা তুমি তোমার আইডিয়া সামনের লোকটিকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিক্রি করতে পারছো কি না তার ওপরে নির্ভর করছে তোমার সফলতা, তার সঙ্গে মিথ্যাকথা বলার বা দেখানেপনার কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ অন্যকে টুপি পরাতে পারো কি না সেটা ততটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, তোমাকে টুপি পরাবার যাবতীয় প্রয়াস হেলায় এড়িয়ে যেতে পারছো কি না, সেটাই বিশেষ বিচার্য। কামড়াবার দরকার নেই, তুমি যে ফেঁস করতে পারো সেটা জানান দিলেই হবে। আর মিথ্যাকথা বলে সেলস প্রফেশনে আজ অবধি কেউ টিকে থাকতে পারেনি, ইন্টিগ্রিটি বা সততা হচ্ছে সেলসে সফল হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। আমার অভিজ্ঞতা বলে ডিস্ট্রিবিউটর ও ম্যানেজাররা সেই সেলস অফিসারকেই একমাত্র পছন্দ করেন যে সৎ, পরিশ্রমী, ডেডিকেটেড এবং কমিটেড। মিথ্যাকথা ধরে ফেলতে ঘাঘু সেলস ম্যানেজাররা একমুহূর্তের বেশী সময় নেন না, প্রতিটি সিনিয়র সেলসম্যানেজার লোকচরিত্র চেনার ক্ষেত্রে বড়বড় সাইকোলজিস্ট ও রাজনৈতিক নেতাকে বলে বলে দশ গোল দিতে পারেন।

পরের দুটো অভিযোগ আকারে প্রকারে ও ওজনে কিঞ্চিৎ গভীর ও সিরিয়াস। প্রতিটি সেলসজীবিকেই পেটের ধান্দায় মাসের অনেকটা সময় ঘরের বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। দিনের বেলাটা না হয় মার্কেটে মার্কেটে কেটে যায়, সন্ধ্যেবেলায় হোটেলে ফিরে মানুষটার আর করে কী? এখানে থেকেই অনেকে ধান্যেশ্বরীর কৃপাপাত্র হয়ে পড়েন। তদুপরি মানুষের শরীর বলে কথা, অনেকেরই ইদিকউদিকের প্রলোভনে মতিচ্ছন্ন হতে আর কতদূর? প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে ধরা পড়ে কে জানে? তবে তার জন্যে অনেকেরই সংসার কেরিয়ার সব ছারেখারে যেতে দেখেছি। কথিত আছে একটি বিখ্যাত কম্পানীর রিজিওনাল ম্যানেজার একবার শিলং এর হোটেলে এক স্থানীয় বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন। যদিও ভদ্রলোক উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ওঁরা বৌদ্ধতন্ত্রে ফার্মা''স লাস্ট থিওরেমের প্রয়োগ অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর ওপরে জাপানের আপেলের সাইজের প্রভাব এইরকম বিষয়ের ওপর খুবই মনোজ্ঞ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, অশিক্ষিত ইতর জনতা সে

কথায় বিন্দুমাত্র পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওই শীতের রাতে, শিলং এর রাস্তায় ভদ্রলোককে টাই পরিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আপনারা বোধহয় কথাটা ঠিক বোঝেননি, ভদ্রলোককে শুধুমাত্র টাই পরিয়েই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়!

এই লাইনে আরও অনেক অম্লমধুরতিক্তকষায় গল্প এই কলমচি''র জানা আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে সবিশেষ ভয় পাচ্ছি বলাই বাহুল্য। একে দিনকাল খারাপ, তার ওপরে কুশীলবরা অনেকেই ফেসবুকে বহাল তবিয়তে বিরাজমান। কোত্থেকে কোথায় কে একটা চিরকুট ছেড়ে দেবে, তারপর সেটা পত্রবোমা হয়ে আমার ইয়েতে আছড়ে পড়ুক, অমন চাইবার মত আহাম্মক আমি নই বাওয়া।

বরং মদ্যপান নিয়ে চারটে ছোট্টখাট্টো গল্প বলে আপনাদের মনোরঞ্জন করি, ক্যামন? এমনিতেই জাত বেচুবাবু, কাস্টমারের মনোরথগতিতে মলয় সুপবন সাপ্লাই করা ছাড়া আর কিই বা বিশেষ কাজ থাকে বলুন?

ঘটনা এক। পাত্র সদ্য বিয়ে করেছে, চোখে তার রঙিন মধুচন্দ্রিমার রঙ তখনও ফিকে হয়নি, তাহার চোখে তো সকলই নবীন, সকলই বিমল সকলই শ্যামল... এমন সময় সুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী, রম্যকপর্দিনী নববধূর কথায় তার মনোজগতে ধেয়ে এলো সে কোন সর্বনাশী ভূমিকম্পের আভাষ? এ কোন সকাল? এ যে ড্রাই ডে''র চেয়েও অন্ধকার..

বিয়ের সবে একমাস হয়েছে, ছুটির দুপুরে দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে দুইজনে কিঞ্চিৎ বুলাদি''র হাডুডু খেলে ক্লান্ত, পরের রাউন্ডের প্রস্তুতি নিচ্ছেন , এমন সময় সেই সুতনুকার পদ্মডাঁটার মতো হাতখানি আমাদের নাটকের হিরোর বুকে উঠে এলো, 'তুমি মদ খাও? বাবা বললো যে! ছিঃ। '

পাত্রের তো হাতে এলইডি! আর কোথায় কি সেটা বললাম না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ছে, রামোঃ।

পাত্র কিছু বলার আগেই সেই পদ্মপলাশলোচনা মহিলাটি তাঁর বিপুল আঁখিদুটি পাত্রের মুখের ওপর এনে বললেন, 'কথা দাও, এক পেগের বেশি খাবে না। আমার ফ্রেণ্ড শকুন্তলা বলেছে যে দিনে এক পেগের বেশি খেলে মানুষ মরে যায়। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না? বলো, বলো, বলো যে তুমি এক পেগই খাবে এবার থেকে।'

পাত্রটি চ্যাম্পিয়ন সেলসমহারথী, গাঢ় গলায় উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ প্রিয়ে, এবার থেকে আমি এক পেগই কিনবো, এক পেগই খাবো। ত্বমসি মম জীবং ত্বমসি মম... ' ইত্যাদি প্রভৃতি...

এইভাবেই চলছিলো, মহিলাও খুশি ছিলেন, আমাদের গল্পের হিরোও তদ্রূপ। কিন্তু একদিন সব পাখি ঘরে আসে, সব সুখের শেষ হয়। আমাদের হিরো একদিন লম্বা ট্যুর শেষে ট্রা লা লা লা টিং টং গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে দেখেন যে গিন্নিমা কালবৈশাখীর মত মুখ করে সোফায় বসে।

ততদিনে বিয়ের চার কি পাঁচ বছর হয়ে গেছে। ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরী এখন ভৈরবীরূপেন অধিষ্ঠিতা। গিন্নির মুখ দেখেই কর্তা মনে মনে প্রমাদ গণলেন, মুখে যদিও মধুহাসিটি অমলিন, 'কি খবর প্রিয়ে?'

শান্ত গলায় ইস্পাতের ছুরির মত ঠাণ্ডা ধারালো প্রশ্ন ভেসে এলো, 'কত মিলিলিটারে এক পেগ হয়?'

পাত্র বুঝিলেন যে অদ্যই শেষ রজনী। দাবার বোর্ডে আজ তিনি অভিমন্যুসম একাকী , চারিদিকে প্রতিপক্ষের গজ নৌকো ঘোড়া মিলে সপ্তরথীর অক্ষৌহিনী কমপ্লিট। কিন্তু তিনিও উচ্চঘর, সেলসোরাজার বংশধর। তিনি কি ডরান সখা বিবাহিত বৌয়ে? মসৃণভাবে উচ্চাঙ্গের হাসি বিলিয়ে তিনি বললেন 'আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর এলো, 'শকুন্তলা ইউ এস থেকে ফিরেছে, আজ দুপুরে বাড়িতে এসেছিল। আমাকে বলে গেছে যে সিক্সটি মিলিলিটারে এক পেগ হয়। আর তুমি.....' বলে অপরিসীম ঘৃণা সহ একটি নিঃশেষিত পাঁইটের বোতল বিজিতের ছিন্নকন্ঠাটির ন্যায় তুলে ধরে বললেন, 'আর তুমি আজ অবধি যে আমাকে বুঝিয়ে এলে এটাই এক পেগ?'

সেই সেলসকুলমার্তণ্ডের খবর জেনে আপনাদের আর লাভ নেই। সে ছোকরা এখন বিলকুল শুধরে গেছে। লেকটাউনের কাছাকাছি কোথাও বউ আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তার সুখের সোমসার। এসব কথা

যেন খবদ্দার তাদের কান অব্দি না পৌঁছয়, এই বলে দিলাম, হুঁ!

দ্বিতীয় গল্প, এটা আমার স্বচক্ষে দেখা। তখন আমি একটি প্রসাধনী-সামগ্রী বিক্রেতা কম্পানীর রিজিওনাল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। প্রথম বছর অকথ্য পরিশ্রমের পর দ্বিতীয় বছরে কিছু ভালো ব্যবসার মুখ দেখেছি। কানাঘুষোয় শুনছি যে সে বছর বেস্ট রিজিওনের অ্যাওয়ার্ড আমাদের কপালে ড্যান্সরত। ফলে ঢাকঢোল পিটিয়ে সেই বছর ইস্টের সেলস কনফারেন্স ফেলেছি রায়চক র‍্যানডিসন ফোর্টে। আহা, অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিটাও ত্যামন জমকালো হওয়া চাই কি না?

তা সেই ফাংশন শেষ, আমরা বেস্ট রিজিওনের অ্যাওয়ার্ড পেয়ে নেচেকুঁদে একশা। আমি নিজেও অত্যন্ত প্রীতিভরে কোমর দুলিয়ে আমার দুর্দান্ত নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করে আবেগের একশো আট নম্বর মেঘে ভাসছি, এমন সময় দেখি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের এরিয়া ম্যানেজার নেই! মানে অমন মন মাতানো হুল্লোড়ের মধ্যে তিনি জাস্ট গায়েব।

চার পেগ গলাধঃকরণ করেও চিন্তায় পড়ে গেলুম। সে ছোকরাকে আপনারা অনেকেই চেনেন, ''পাটায়াতে পটলকুমার''এর সৌজন্যে। অমন চৌখস ছেলে চট করে আজকাল পাওয়াই যায় না। এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে বউ হারালে বউ পাওয়া যায় রে পাগলা, এরিয়া ম্যানেজার হারালে এরিয়া ম্যানেজার পাওয়া যায় না। আমার চার পেগের নেশা টুক করে নেমে গেলো, আমি টর্চ জ্বালিয়ে ছোঁড়াকে খুঁজতে বেরোলুম।

অবশ্য বেশীদূর যেতে হলো না, রাস্তাতেই তার সঙ্গে আমার মোলাকাত। ছেলের চোখ উস্কোখুস্কো, মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে। ছোকরাকে দেখেই বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেসলো, আমি স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি রে ভাই, খুব টেনশনে আছিস নাকি? এই যে বেস্ট এরিয়া ম্যানেজারের অ্যাওয়ার্ড পেলি, তাতেও এই অবস্থা কেন? মাল খাবি ভাই? আয় দেখি, আমার রুমে এখনও হাপ্পবোতল... '

সে ছেলে আর্তনাদ করে উঠলো, 'না বস, তুমি জানো না কি হয়েছে। ঈশান আর হরিকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

খানিকটা আশ্চর্যই হলুম, দুজনেই বেঙ্গল টিমের চ্যাম্পিয়ন সেলস অফিসার, 'তারা মালফাল খেয়ে ইয়ে উলটে পড়ে আছে কোথাও, তাতে তুই এত চিন্তিত হচ্ছিস কেন?'

'বস, তুমি ওদের চেনো না। দুটোই সকালে বিয়ার দিয়ে দাঁত মাজে, হুইস্কি দিয়ে রাত্রে মুখ ধোয়। মদ খেলে দুটোরই কোনও হুঁশ থাকে না। সারা তল্লাট খুঁজে খুঁজে পেলাম না, মালদুটো যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে থাকে?'

'মানে?' এবার আমারই মাথার চুল খাড়াখাড়া হয়ে যায়, 'খামোখা ওরা মাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপাতে যাবেই বা কেন? হোয়াই? আন্সার মি'।

'আরে বস, তুমি জানো না, দুটো পগেয়ামার্কা পাজির পাঝাড়া, প্লুরো বিষ মাল। গতবার দোলের সময় তো তুমি ট্যুরে গেসলে। আমরা নিজেদের মতো করে অফিসে দোল খেলছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি দুটোতেই হা রে রে রে করে তেড়ে গিয়ে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া এক মাড়োয়াড়ি মহিলাকে রংফং মাখিয়ে... উফ সে কী হুজ্জোতি.. তোমাকে তো বলিনি। তারপর মহিলার কাছে হাতেপায়ে ধরে ক্ষমাটমা চেয়ে কোনওমতে সেট তো করলাম। ও মা, তারপর দেখি দুজনেই একটা রোগাভোগা বেওয়ারিশ বলদ পাকড়েছে, আর তারপর তার পিঠে চড়ার সে কী মরণপণ চেষ্টা! পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছে, আর রাস্তায় গড়িয়ে পড়েই বলছে জ্জ্যায় সিয়ারাম। তারপর...'

আর তারপর শোনার অবস্থায় আর ছিলাম না। ধরা গলায় বললাম, 'হ্যাঁ রে, এসব তো আগে বলিসনি। তা তারা কোথায় যেতে পারে বলে তোর মনে হয়?'

চোখমুখ লাল করে সে ছোকরা বললো, 'বলা যায় না। মালমূল খেয়ে ফোর্টের সাইড থেকে গঙ্গায় ঝাঁপালেই বা আটকাচ্ছে কে? আশিস ঝা বললো ও না কি স্বকর্ণে শুনেছে যে আজ দুজনের মধ্যে বাজি

ধরাধরি হয়েছে, রাতে মাল খেয়ে গঙ্গায় নেমে সাঁতরে যে ওপারে উঠে, কোলাঘাটের থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের চিমনির মাথায় নিজের জাঙিয়া টাঙিয়ে আসতে পারবে, তাকেই অন্যজন মর্দ বলে মেনে নেবে।'

শুনে, আমারই শুকিয়ে গেলো। মানে বুক। সেলস কনফারেন্সে এসে টীমের ছেলে গঙ্গায় ডুবে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটলে কী পরিমাণ স্ক্যান্ডাল ছড়াবে ভেবেই আমার নেশার অবস্থা চমকে চোদ্দ। চমকে চমচম বললেও চলে। আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, 'চল ভাই, আমিও খুঁজি।'

যাঁরা কখনও রায়চক র‍্যাআডিসন ফোর্টে গেছেন তাঁরা জানেন যে মেন বিল্ডিঙের পেছনে একটা নরম ঘাসে ছাওয়া একটি বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। তার মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটি নালা বয়ে গেছে, তার ওপরে একটি রূপকথা সাইজের সাঁকো। রাতের বেলা জায়গাটি ভারী মনোরম দেখায়। আমরা দুইজনে ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর স্কীমে আহিড়ি পিহিড়ি করে এসে দূউউর থেইক্যা দেহি ঘাসের উপর শুয়্যা আছে কেডা রে?

আর কে? দুই মক্কেল দেখি হাসি হাসি মুখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে নির্মল আকাশ অবলোকন করছেন। সুজন, বেঙ্গলের এএসএম গিয়ে আগেই ডান পা তুললো কোনও একটার গলায় তুলে দেবে বলে। তারপর কি মনে হতে পা''টা নামিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'কি বে *তু* রা, এখানে শুয়ে শুয়ে কি আকাশের তারা গুণছিস নাকি বে?'

দুই স্যাঙাতের কোনও একজন ঠেঁটে একটা শেয়ানা মার্কা হাসি ঝুলিয়ে বললো, ' গুউউ, আকাস্টাম্মাইরি হেবিব্লু দেকাচ্চে, তুমিওসুয়ে পড়ো..মেয়াজটা একদমসরিফ হয়ে যাবে।'

শুনে আমিই ওদের কারো একটার কোথাও পা তুলে দিতে যাচ্ছিলাম। তার অবশ্য দরকার হলো না, সুজন নীচু হয়ে দুটোকেই নড়া ধরে দাঁড় করালো, তারপর দুটো ক্যাঁৎ করে লাথি মেরে বললো 'চুপচাপ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বি। যদি বেগড়বাঁই দেখেছি, কাল সকালে দুটোকেই কান ধরে তুলে গড়িয়াহাটে মার্কেট ভিজিটে পাঠাবো, মনে থাকে যেন।'

তারপর সেই চাঁদনি রাতে দুটোয় যখন টলমল করতে করতে একে অন্যকে জড়িয়ে হাডা মাল্লে, দেখে মনে হলো দুটো রোগাসোগা গরিলাই যেন মহুয়া খেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে মিনিট দশেক ধরে আমি আর সুজন আধুনিক যুবসমাজের ওপর মদ্যপানের কুফল এবং তজ্জনিত কারণে সমাজের সার্বিক অবক্ষয় সংক্রান্ত একটা ছোটখাটো সেমিনার সেরে নিলাম। সুজন পকেটে করে একটা বিপি''র পাঁইট এনেছিল, সেইটে খেতে খেতে! তারপর বোতলটা ছুঁড়ে দিয়ে দুজনেই হোটেল বিল্ডিং এর দিকে রওনা দিলুম।

তারপর রাস্তায় এক বিদেশিনী সুতনুকাকে দেখে সুজনের আবার স্বভাবজাত আলাপপ্রিয়তা উসকে উঠলো, ছোকরা বেশ রমনীমোহন হাসি ঠেঁটে ঝুলিয়ে, 'হ্যাল্লো ম্যাডাম,নিউ ইন ইণ্ডিয়া' বলে খেজুর করতে গেলো। সুতনুকা জাস্ট পাত্তা দিলেন না। ছোকরা বেজার মুখে ফেরত এসে আমাকে আধুনিক বিদেশী সভ্যতার হিংস্র অবক্ষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ নিয়ে ছোটখাটো ভাষণ দিতে দিতে সিঁড়ির কাছে এসে দুজনেই বাক্যিহারা!

এসে দেখি সেখানে সেই দুই মক্কেল যে সতর্কতার সঙ্গে সিঁড়ির রেলিং ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় মাইনশোভিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কম্যাণ্ডোবাহিনীর শঙ্কিত পদচারণা! আর তো আর, দেওয়ালের টিকটিকি গুলো অবধি সেই বিচিত্র কুচকাওয়াজ দেখে হাঁ করে অবলোকয়মান! আর পা যে রেটে টলছে সে আর কহতব্য নয়। সিঁড়ি বেচারার যদি কোনও হুঁশপর্ব থাকতো, সে ব্যাটা পাক্কা উঠে এসে এই দুই মক্কেলের কানের গোড়ায় ঠাটিয়ে দুটো থাপ্পড় মেরে বলতো, 'বাঁ., গুছিয়ে হাঁটতে পারো না, সিঁড়ি চড়তে এয়েচো?'

কিন্তু আমরা যেটা দেখে সম্পূর্ণ বাকরহিত হয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের বগলে ছলছলায়মান দুটি পাঁইটের বোতল! যাতে সে দুটি পড়ে ভেঙে না যায় তার জন্যেই এত উতরোল, এত সশঙ্ক পদবিক্ষেপ !

আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময়ে দুই মক্কেল টুলটুল করে হাঁটতে ফার্স ফ্লোরে পৌঁছলো। ওদের রুমও ওই ফ্লোরেই, ল্যাণ্ডিং এর পাশেই। আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেখি একজন কী কার্ডের বদলে ওয়ালেট থেকে ক্রেডিট কার্ড বার করে অত্যন্ত মন দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছে, অপর জন দুবগলে দুটি পাঁইট হস্তে দণ্ডায়মান। তার অষ্টাবক্র দেহবল্লরীতে এক অদ্ভুত প্রসন্নতার আমেজ, মুখে শ্রীচৈতন্য মার্কা এক ভাববিহ্বল হাসি। আমাকে দেখে বিলোল মদির কটাক্ষে খ্যাঁক করে হেসে সে বললে, ' গুউউ, কেমন আছেন, খওরটওর সব ভাও?'

চণ্ডীদাস কহে নবপরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে!

দুটোকে ওখানেই বলি দেবো নাকি উল্টো করে সারারাত ঝুলিয়ে রাখাটাই ঠিক হবে এসব ভেবে ওঠার মাঝেই দেখি আমার গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো, ' তোরা আবারও খাবি? এর পরেও?'

রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহিনী হাসি হেসে দুই মক্কেল আমাকে বললো, 'গুউউ, তুমিইই তো বয়েচিলে, ওয়ান ফদ্দ্যা রোড!'

ঘরের চৌকাঠ থেকে বিছানা অবধি রাস্তার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার সুপর্ণা? সে রাস্তা কতদূর?

বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো মিশ্রাজীর কথা। আমার চাকরির প্রথম দিকে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। ইচ্ছে করেই পিতৃদত্ত আসল পদবীটি চেপে গেলাম, কার মনে কী আছে সে তো বলা যায় না। সে যা হোক, মিশ্রাজী যে অতি ভালো মানুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাস্তি। দোষের মধ্যে ভদ্রলোক বড় প্রেম বিলোতে ভালোবাসতেন। সেই প্রথম শতাব্দীতে মানুষকে ভালোবেসে ক্রুশকাঠে আত্মবলিদান দেওয়া মহামানবটি, আর নবদ্বীপের পথে পথে হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে আচণ্ডালে কোল দেওয়া যুবকটি ছাড়া এমন সার্বিক প্রেমোন্মাদ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কমই এসেছেন। তবে কিনা মিশ্রাজী ভবভূতির লেখা আদ্ধেকটা বিশ্বাস করতেন, লিমিটেড টাইম আর বসুধা বিপুল, অতএব উনি ব্যাপারটা বেশী ছড়াননি, মহিলামহলের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে এই প্রেমাকুল ভদ্রলোকটি বিশ্বাস করতেন জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা, প্রেম করতেন প্রায় ফিবোনাচ্চি সিরিজে। কুলোকে বলতো পাটনা শহরে ড্যুরেক্সের ব্যবসার নেট প্রফিটের অনেকটাই মিশ্রাজীর পকেট থেকে আসে। তবে কুলোকে মুক্তকণ্ঠে এও স্বীকার যেতো যে, ড্যুরেক্স নামের আবেগরোধী ব্র্যা।গুটি না থাকলে মিশ্রাজীর ''কর্মক্ষম সময়ের'' মধ্যে বিহারের জনসংখ্যার ওপর যে আশঙ্কাজনক চাপ পড়তো, তা সামলাবার জন্যে সঞ্জয়-গান্ধী ছাড়া পথ ছিলো না! আমি শুধু সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য যে এই প্রাচীন অরণ্যের প্রবাদ আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। কারণ স্বচক্ষে দেখেছি যে মিশ্রাজীর প্রথমা কন্যাটি যখন কলেজে পাঠরতা, তখন মিশ্রাজীর নবতমা বান্ধবীটি প্রথমা কন্যার থেকে মাত্র দুই বছরের বড়!

গোলমাল হলো যেদিন মিশ্রাজীর বড় মেয়েটির গ্র্যা জুয়েশন পাশের উপলক্ষে তাঁদের ভদ্রাসনে ছোট একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। মিশ্রাজী তাঁর নৈমিত্তিক অভিসার সেরে, বাবার কেনা ল্যামব্রেটা স্কুটারে চড়ে চিৎকোহরা থেকে কঙ্করবাগস্থ নিজ আলয়ে ফিরছিলেন।ঐতিহাসিকদের মতে সেদিন ছিলো ঘোর অমাবস্যা আর দিনের বেলা পাটনা শহরে ''গোবর বিকাস রেইলি'' বা এইজাতীয় কিছু র‍্যা লী ছিলো। অথবা মিশ্রাজীর মনে স্ফূর্তি কিছু বেশী হয়ে থাকবে, মোটমাট রাস্তায় পড়ে থাকা গোবরে স্কুটারের চাকা স্কিড করে মিশ্রাজী খুবই অনিচ্ছাপূর্বক পাটনা মেডিক্যাল কলেজে নিজের শ্রীচরণদ্বয়ের ধূলো দিতে বাধ্য হলেন!

আর সেইদিনই একটু রাতে খবর পেয়ে মিশ্রাজীর যাবতীয় বান্ধবীরা এবং মিশ্রাজীর অর্ধাঙ্গিনী একইসঙ্গে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন!

খুব সম্ভবত হাউণ্ড অফ বাস্কারভিলসেই শার্লক হোমসের জবানীতে আর্থার কোন্যান ডয়েল বলেছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর একটি নারীও চোখের জল ফেলে না, তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই। মহামতি ডয়েল এইটে বলে জাননি যে যার জন্যে কম করে জনা তিরিশেক নারী একই সঙ্গে চোখের জল ফেলতে হাজির

হন, তার কী অবস্থা হয়! ভূষণ্ডির মাঠের হালহকিকতের খবর রাখা কেমিস্ট্রি বিশেষজ্ঞ ক্ষণজন্মা ভদ্রলোকটি হয়তো জানলেও জানতে পারতেন!

এখনও পাটনা মেডিক্যাল কলেজে গেলে দেখবেন যে সদর দরজায় সশস্ত্র সান্ত্রীরা অত্যাধুনিক অটোমেটিক রাইফেল হাতে সতর্ক চোখে পাহারা দিচ্ছে, একসঙ্গে অনেক মহিলা ঢুকলে কড়াকড়িটা কিছু বেশিই হয়। এখন আপনি যদি সেই রাতের ঘটনার সঙ্গে এই সতর্ক সাবধানী এন্ট্রি চেকিং এর কোনও কার্যকারণ খুঁজতে চান তো আমি নাচার!

পুরুষ মাত্রেরই বুড়ো হওয়ার দোরগোড়ায় এসে ছোঁকছোঁকানি বেড়ে যায়, এ কথা সর্বনারীবিদিত। কথাটা প্রথম শুনি আমার মেজদির এক বান্ধবীর কাছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার বড় হয়ে ওঠাটা সম্পূর্ণ নারীবেষ্টিত, পাঁচজন দিদি আর তিনটি বোনের মধ্যে একমাত্র ভাই হিসেবে বেড়ে উঠলে যা হয়। সেই থেকে মেয়েলি আড্ডা, মেয়েলি কূটকচালি (কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। পরনিন্দা পরচর্চায় ছেলেদের উৎসাহ কিছুমাত্র কম না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি) এসবে আমার তুমুল উৎসাহ। মেজদির সেই বান্ধবী স্পষ্টই বলেছিলেন যে বাসে ট্রামে যারা মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করে তাদের বেশীরভাগই আধবুড়ো পুরুষ। বরং ইয়ং ছেলেপিলেরা তুলনায় অনেক ভদ্র ব্যবহার করে। কথাটা খুব সম্ভবত সত্যি। আমার দেখা যে কটি নারীঘটিত কর্পো-কেলেঙ্কারি আছে, তার সব কটিতেই টপ লেভেলের পঞ্চাশোর্ধ বসেদের নবযৌবনসুলভ ছল্লিবল্লি দেখে কম আমোদ পাইনি। তবে যেটা স্বীকার না করলে নেহাত অন্যায় হবে, সেটা হচ্ছে যে এর প্রতিটি কেসে উল্টোদিকে যে মহিলাটি ছিলেন, এসবের মধ্যে তাঁরও অবদান কিছু কম ছিলো না। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অনেকবারই এক্সপ্লয়েটেড হতে দেখেছি, নারীলোভী দাপুটে বসের নির্লজ্জ হিংস্র যৌন আগ্রাসনও দেখেছি। কিন্তু যেখানে পারস্পরিক সম্মতিতে অবাধ লীলাখেলা চলছে সেখানে কেবল একপক্ষকে দায়ী করাটা বোধহয় ঠিক নয়।

কর্পো লাইফে ইন্টুমিন্টু নিয়ে তিনটে প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বারো বছর হয়ে গেলো , এই হাটে করেকম্মে খাচ্ছি। এই তিনটেই দেখলুম। অন্য ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে জানি না বললেই চলে।

কর্পো লাইফে তিন ধরনের ইয়ে চলে, (১) বসের সংগে, এক্সট্রা সুবিধার বিনিময়ে (২) যৌন হেনস্থা (৩) বহুদিন একসংগে কাজ করতে করতে এক্সট্রা সখ্য গড়ে ওঠে। কখনোসখনো সেটা একটু বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ে। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে.. ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদিগকে আমরা অফিস স্পাউস বলিয়া থাকি।

১. যে কম্পানির কথা বলছি, তখন সে কম্পানি আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমারই এক বন্ধু ইস্টে রিজিওনাল ম্যানেজার হয়ে এসেছে। কম্পানি ছাড়লে কি হবে, সেলস অনেকটা আর্মির মতন, ওয়ান্স আ কমান্ডার, অলওয়েজ আ কমান্ডার। তা আমার টিমের লোকজন মাঝেমাঝেই ফোন করে আমার খোঁজখবর নিতো। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, নতুন আর এস এম চালাচ্ছে কি রকম? ওপারে যিনি ছিলেন, তিনি খ্যাঁক করে হেসে বললেন, 'অফিসটা পুরো মধু বৃন্দাবন হয়ে গেলো স্যার'। কেচ্ছাকাহিনী শুনতে আমার চিরকালই হেবি ইন্টারেস্ট। সোৎসাহে বল্লুম ''বল বল, বেশ গুছিয়ে বল তো বাপু''।

খবরে শুনলুম সেই লতুন লতুন রিজিওনাল ম্যানেজারের সঙ্গে নাকি রিজিওনাল এইচ আর এক্সিকিউটিভ বংগললনাটির ভাবভালোবাসা একটু অতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বক্তার দাবি, সে ও তার সংগীরা নাকি একাধিকবার মহিলাটিকে ম্যানেজারের কেবিনে বসে রিজিওনাল ম্যানেজারকে হামি খেতে দেখেছে। যথারীতি আমি গুল বলে উড়িয়ে দিই। তারপর শোনা গেলো সমস্ত আউটস্টেশন মার্কেট ভিজিটে নাকি এইচ আর না গেলে চলছেই না, যদিও সেলস ভিজিটে এইচ আরের কোন কাজই নেই। খবরে আরও প্রকাশ, প্রায়ই নাকি বিভিন্ন হোটেলে রুম বুক করে দুই জনের মধ্যে অত্যন্ত দুরূহ স্ট্র্যাটেজিক আলোচনা চলছে সারাদিন ধরে। মাঝেমাঝে সারা রাত ধরেও!

পাপ আর পেরেম গোপন থাকেনা, ওপন হতে বাইধ্য। ভদ্রমহিলা শেষে স্যাবাটিকাল নিতে বাধ্য হন। এখন ইউ এস এতে বরের কোলে হামি খাচ্ছেন বোধহয়। রিজিওনাল ম্যানেজারটিকে ট্রান্সফার করা হয়।

২. আমার প্রাক্তন কম্পানি, কেভিনকেয়ার। চার বছর আগে যখন জয়েন করি, এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ এইচ আর হেড ছিলেন। সেলস বা মার্কেটিং হেডরা অব্ধি তাকে সমঝে চলতেন। ভদ্রলোক খুবই কাজের লোক ছিলেন সন্দেহ নেই। হঠাত একদিন শুনি তিনি নেই!! না না, দেহ রাখেননি, রেজিগনেশন লেটার রেখেছেন! কি ব্যাপার, চারিদিকে তীব্র কৌতূহল। কিন্তু টপ ম্যানেজাররা সব্বাই মুখ বুজে মৌনীবাবাসুলভ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছেন। আমার বস,তৎকালীন সেলস হেড, তো আমার ফোন দেখলেই কেটে দিচ্ছেন। অতএব এইচ আরের এক জুনিয়ার ছোকরা কে পাকড়ালুম। সে মাল কিছুতেই কিছু বলে না। শেষে তাকে মিষ্টি দই দিয়ে বোঁদে মেখে খাওয়াবো, এই প্রতিশ্রুতি দিতে ছোকরা মুখ খুলল।

খবরে প্রকাশ, এইচ আর হেড ভদ্রলোকটি নাকি তেনারই ডিপার্টমেন্টের একটি কচি বয়েসী রূপবতী কন্যেকে বহুদিন ধরেই ছুটির দিনে তেনার ফাঁকা ফ্ল্যাটে গিয়ে সম্বর রসম ইত্যাদি খেয়ে আসার ঢালাও আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। মেয়েটি সংগত কারণেই এড়িয়ে চলছিল। প্রবলপ্রতাপ এইচ আর হেড, কাকে কি বলবে বেচারি? শেষে এক মন উচাটন বসন্তের বিকেলে ভদ্রলোক এই মেয়েটিকে নিজের কেবিনে ডেকে, খুব সম্ভবত নিষ্পাপ মনেই, শরীরের বিশেষ অংশে স্নেহপূর্বক সুড়সুড়ি দিয়ে ফেলেন। মেয়েটি কথা না বাড়িয়ে সোওওজা এমডি র কাছে (যিনি মালিকও বটে) কেঁদে হত্যে দেয়। মালিক ভদ্রলোকটির সংগে কাজ করেছি অনেকদিন।আদ্যন্ত প্রফেশনাল ভালোমানুষ। তিনি ওইদিনই এইচ আর হেডকে ডেকে রেজিগনেশন নেন। ফিনান্সকে বলেন সমস্ত দেনাপাওনা চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মিটিয়ে দিতে।

৩. এইটে বলতে সামান্য সংকোচ বোধ করছি। কারণ এটি আমারই, যাকে বলে "শাসনামলে" ঘটে।

বিশেষ কিছু না। আমারই অফিসের এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা একে অন্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। দুজনেই অনেকদিন এক সঙ্গে কাজ করেছেন, খুবই এফিশিয়েন্ট। বন্ধুত্ব আগেও ছিল। হঠাত করে দুই জনেই "বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও" করে প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেলেন। দুইজনেরই ভরভরন্ত সংসার।

তাতে ব্র্যাঞ্চ হেড হিসেবে আমার কিছু বলার ছিল না। আমি তো আর কারও মর্যাল সায়েন্সের টিচার নই রে ভাই!! কিন্তু ঘটনা ক্রমেই ঘনঘটা হয়ে উঠতে লাগলো। লোকজন এসে কম্পলেইন করতে লাগলো যে ভালোবাসার যা বহিঃপ্রকাশ এদিকওদিক ছিটকে পড়ছে, তাতে অফিসে কাজ করা দায় হয়ে উঠেছে। আমি নিজেই একদিন দেখি মেন'স টয়লেটে দুজনে খুব মন দিয়ে চুমু খাচ্ছেন। আমি তাও কিছু বলিনি। শোনা গেলো অফিস শেষ হবার অনেক পরেও দুজনে থেকে যাচ্ছেন অনেক্ষণ, আমারই কেবিনের দরজা বন্ধ করে নাকি অনেক শিশিরভেজা গল্পগুজব হচ্ছে, তখনও কিছু বলিনি। কিন্তু একদিন যখন অফিসে এসে, আমার কেবিনে রাখা কালো ভেলভেট মোড়া সোফাটির ওপর কিছু সন্দেহজনক সাদা দাগ দেখতে পেলুম, সেদিন তাকে ঠিক শিশিরের ফোঁটা বলতে মন চাইলো না। ফলে নেহাত বাধ্য হয়েই দুজনকে ডেকে বল্লুম, ভাই,ভালোবাসা তোদের হৃদয়ে রহিল গাঁথা, কালেক্কে রোমিও জুলিয়েট, মীনাকুমারি কামাল আমরোহী, দেব শুভশ্রীর পরেই তোদের নাম নেওয়া হবে।কিন্তু এখনকার মতন তোরা আয়।

ভদ্রলোকটি কেটে পড়েন। মহিলাটি থেকে যান। পরের ঘটনা আর বিস্তারিত বলে লাভ নেই।

এইসব খুচখাচ সব জায়গাতেই থাকে। স্কুলের টিচার, প্রফেসর, এদেরও প্রেম ও পরকীয়া করতে দেখেছি। গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রিতে পারসেন্টেজ একটু হাই হতে পারে, তবে লোকে শুধুমাত্র শুয়েই ওপরে উঠছে এমন দাবি করা মূর্খামির পরিচয়। তা হলে এদ্দিনে ইচ্ছে করলে সানি লিওনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন, মিয়া খলিফা প্রেসিডেন্ট!!!

সেলসের লোকেদের ব্যাপারে আরও একটা দোষারোপ হলো যে এরা বড় মুখ আলগা, সামান্য বেশিই খিস্তিপ্রবণ। কথাটা যে আদ্যন্ত সত্যি, সে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝি। এই খিস্তিপ্রিয়তার সামাজিক তথা

মনস্তাত্ত্বিক কারণ আমি জানি না, এসব উঁচু দাগের আলোচনার ঈথারতরঙ্গ আমার মত আদ্যন্ত অশিক্ষিত বেচুবাবুর নলেজ-অ্যান্টেনার অনেক ওপর দিয়ে বয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতে, সম্ভবত আর্মিসুলভ দলীয় সংবদ্ধতা আর টার্গেট মিট করার মানসিক চাপ এর কারণ, গালাগালি দেওয়াটা প্রেশার কুকারের সিটির কাজ করে। চোদ্দ পনেরো বছর হলো, সেলসের লাইনে আছি, বহু বিচিত্র গালাগালি শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে সেইসব সুভাষিতাবলীর মধ্যে মনে গেঁথে আছে জনৈক চক্রবর্তীবাবুর বাঁধা লব্জ। সেলসের টিম মিটিং হোক বা ডিস্ট্রিবিউটদের সঙ্গে নেক্সট ইয়ারের স্ট্র্যা টেজি নির্ধারণ, সামান্য প্ররোচনাতেই তিনি ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। আর তারপরেই পাঁচফুট উচ্চতার, পঞ্চাশ কিলো ওজনের, বাহান্ন বছর বয়সী গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণসন্তানটি ক্রোধভরে কাঁপতে কাঁপতে দক্ষিণহস্তের তর্জনী তুলে রাগী দুর্বাসার স্টাইলে বলতেন 'আমাকে চেনো না বাঁ*, মার্কেটে আমার নাম শুনে নিও, আমি জাস্ট চোখে দেখে প্রেগন্যান্ট করে দিতে পারি, বুয়েচো? জাস্ট চোখ দিয়ে অ্যামন করে দেখবো আর পেট হয়ে যাবে...আমাকে চেনো না বাঁ...'

নেহাত মহারাজ যুবনাশ্বের পর ভারতবর্ষে আর কোনও পুরুষের গর্ভবান হওয়ার ইতিহাস নেই, তাই অমন ব্রহ্মতেজোময় অভিশাপটি বিফলে গেলো। নইলে অমন অন্তঃস্তল, তথা অন্তঃস্তলপেটভেদী দৃষ্টি কজন অনিচ্ছুক ডিলারই যে ''রোধ'' করতে পারতেন তা খোদায় মালুম!

এবার আরেক দাদার গল্প। একবার এক ডিলারের সঙ্গে মীট করতে গেছি, তখন আমি কচি এরিয়া ম্যানেজার, দুনিয়ার হালহকিকত সম্পর্কে নিতান্তই নাদান বললে চলে। সঙ্গে আমার আটান্ন বছর বয়সী এক সেলস সুপারভাইজার। পদানুযায়ী তাঁর অবস্থান আমার একধাপ নীচে হলে কি হবে, সেলসাভিজ্ঞতায় ইনি অফিসে ভীষ্মপিতামহসম মর্যাদা পেয়ে থাকেন। অফিসের টিকটিকিগুলো অবধি আরশোলা ধরার আগে নতমস্তকে দাদার পার্মিশন নিয়ে থাকে বলে অফিসে কানাঘুষো আছে।

তা সেই ডিলার কথঞ্চিৎ কারণে খচে পুরো কেষ্টদা হয়ে ছিলেন। দোষটা আমাদেরই, তাই আমিও যারপরনাই ডিফেন্সিভ মোডে ম্রিয়মাণ ছিলাম। তা আলোচনা চলতে চলতে সেই ডিলারের গোলাবাজী চরমে, আমি ডানকার্কে আটক ব্রিটিশবাহিনীর মতই অসহায় বোধ করছি আর আড়ে আড়ে সেই সেলসশাস্ত্রে অধিরথ পণ্ডিতটির দিকে কাতরস্বরে তাকাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি ঝিমুনি ছেড়ে তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। ডিলারের দিকে সরু চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, 'চ্যাচাঁচ্ছিস কেন?'

কিন্তু ডিলারের মেজাজও সেদিন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের আবহাওয়ার মতই গরমাগরম। তিনিও বাছাবাছা ক''টা কুকথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের সুপারভাইজার দাদা ততক্ষণ ধরে একটা দেশকাঠি নিয়ে নিমীলতনয়নে নিজের কান খোঁচাচ্ছিলেন। ডিলারভদ্রলোক সামান্য চুপ করতেই বললেন 'দ্যাখো সামন্ত, ইয়ে দুটো (এই বলে দুই হাতে গোলাকার কিছু ধরার মতো ভঙ্গি করলেন) যতই বড় হোক, এইটার (বলে ডানহাতের মধ্যমাঙ্গুলিটি অত্যন্ত কনস্পিক্যুয়াসলি বাগিয়ে ধরলেন) থেকে নীচেই থাকে বুঝেছো? তাই কম্পানীর ওপর বেশী রঙ নিও না, ক্যামন?'

আমি আর সেই বাৎসরিক পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা দেওয়া ডিলার মহোদয় দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম এই মহাপুরুষপ্রবরটির দিকে!

এই ঘটনার প্রায় ছয়বছর পরে গ্যাঙস অফ ওয়াসেপুর নামক অসামান্য চলচ্চিত্রটিতে এমনই একটা ডায়ালগ শুনে সেদিনের সেই মহাপুরুষবাণীর প্রকৃত নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হই!

যাক কথায় কথায় অনেকটাই বলে ফেললাম। এবার তৃতীয় গল্প।

আগেই বলে রাখি যে গল্পটা আমার শোনা, আমার প্রত্যক্ষ করা নয়। ফলে কাহিনীটা যিনি বলেছেন তাঁর জবানীতেই শোনা যাক।

'সেবার আমাদের অ্যানুয়াল কনফারেন্স রাখা হয়েছে আইটিসি সোনার বাংলাতে। সে বছর ইস্ট রিজিওন ভালো ব্যবসা দিয়েছে। ফলে কম্পানীও খুব খুশি, ঢালাও দারুমুর্গী চলছে। শেষে যখন টয়লেটে হিসি করতে

গিয়ে দেখলাম আমাদের রিজিওনাল ম্যানেজার আট পেগ মাল চড়িয়ে খুবই নিবিষ্টচিত্তে দেওয়ালের আয়নার গায়ে তোড়ে হিসি করছেন, তখন মনে হলো এবার বাড়ি যাওয়াটা সত্যিই প্রয়োজন।

আমার বাড়ি, তুমি তো জানই, সল্টলেকে। সেদিন আমার পাঁচশো সিসির এনফিল্ডটা নিয়ে এসেছিলাম। আমার এই একশো কুড়ি কিলো ওজনের জন্যে ওই বাইকই ঠিক, দিব্যি মানিয়ে যায়। তা বাইরে এসে একটা সিগারেট খেয়ে বাইক বার করেছি, এমন সময় দেখি আমার টীমের মদনগোপাল, ওরফে মগাই গৌরাঙ্গের মত দুহাত তুলে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। আমি তো বাইকে স্টার্ট দিয়ে দাঁড়ালাম। মদনা টলতে টলতে এসে বললো, 'গুরু, উল্টোডাঙ্গা অবধি নামিয়ে দেবে প্লিজ?'

আমার কেমন যেন বড় মায়া হলো। ছোকরার তিন কূলে কেউ নেই, একাই থাকে। তার ওপর বড় প্রেমপ্রেম বাই আছে, মেয়ে দেখামাত্র প্রপোজ করে, কিন্তু কেউ পাত্তা দেয় না। ওজনে বড়জোর চল্লিশ কিলো, খ্যাংরাকাঠির মতো চুল, বড় বড় গোরুচোরের মত চোখ। বাড়ি বাঙ্গুরে। আমি বললাম 'আচ্ছা বোস, তোকে বাঙুর অবধি পৌঁছে দিচ্ছি।'

তারপর তাকে নিয়ে তো চলছি। ফাঁকা শুনশান রাস্তাঘাট। এপ্রিল মাস, একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, ঠাণ্ডা মিঠে ফুরফুরে হাওয়া। ছোকরা বাইকে বসেই আমার পিঠে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি অবশ্য কিছু মাইণ্ড করিনি। বাইপাসের পাশের ওই পুকুরটার ওপারে মস্ত চাঁদ উঠেছে, তার ওপরে বাতাসে শিরশিরানি ভাব। নেশাটা দিব্যি জমে উঠেছে, চিংড়িহাটার মোড়ে পৌঁছেছি, এমন সময় অচানক রেড সিগন্যাল। যেই জোরে ব্রেক কষেছি, অমনি মদনবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টুক পেছন থেকে উলটে রাস্তায় পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ রাস্তায় শুয়ে থাকা একটা নেড়িকে জড়িয়ে ধরে 'ওহ স্যুইটি, ইউ আর সো সফট' বলে ঘুমিয়ে পড়লেন।'

আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে আমি একটি মশামারা কম্পানির মাছিমারা এরিয়া ম্যানেজার ছিলুম। মানে আমাদের ব্যবসা ছিলো মশা মারার কয়েল, মেশিন, লিক্যুইড রিফিল, আরশোলা মারার স্প্রে ইত্যাদি বিক্রি করা। ব্র্যাণ্ডের নাম? গুডনাইট আর হিট।

আমি যখন জয়েন করি তখন কম্পানির বৃহস্পতি তুঙ্গে। তিন বছরের মধ্যে টার্নওভার ডাবল, বিদেশভ্রমন (মল্লিখিত ''প্যারিসে নিশিবাসরে'' পড়ার দুর্ভাগ্য হয়েছে কি? ওই, তখনই যাওয়া আর কি), ইত্যাদি তো ছিলই, আর পেয়েছিলাম রেকর্ড পরিমাণ ইন্সেনটিভ, যা এখনও চঞ্চঞ্চও ইন্ডাস্ট্রিতে অবিশ্বাস্য বলে ধরা হয়।

তা এমনই এক সময়ে মার্কেটিং এর এক কর্তাব্যক্তির মাথায় এলো ওডোমসের সঙ্গে সমানে টক্কর দেনেওয়ালা প্রডাক্ট বার করার কথা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, হা রে রে রে করে , ঢাকঢোল পিটিয়ে আমরা বাজারে আনলুম হার্বাল বডিক্রিম, মশাও মারবে সলমান খানের মতন দাবাংবিক্রমে, আর ত্বকও হবে ক্যাটরিনা কইফের মতন মখমলি, এই ছিলো প্রডাক্টের গুণাবলীর নির্যাস। কুলোকে অবশ্য বলতো মশা মারে কেষ্ট মুখার্জির মতন আর ত্বকের টেক্সচার প্রায় ওম পুরীর কাছাকাছি পৌঁছয়, তবে সেসব হিংসুটেদের কথা পাত্তা দেওয়ার কথাও নয়, আমরা দিইও নি।

আমাদের ব্রা ণ্ডের ট্যাগলাইন ছিলো, ''মচ্ছরোঁ সে করে ওয়ার, ত্বচা সে করে পেয়ার''। বলা বাহুল্য, হিন্দিতে ওর থেকে ভালো ট্যাগলাইন আর হয়না। এদিকে আবার যেহেতু সেবছর কলকাতা ডিপো সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করে (করবে নাই বা কেন শুনি? এরিয়া ম্যানেজার কে সেটা একবার দেখবেন না মহাই? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পৌরুষে, সাহসে,চরিত্রে, রূপেরঙেগন্ধেবর্ণেস্পর্শে অমন ''সেকেন্ড টু নান এরিয়া ম্যানেজার আর কটা দেখেছেন মশাই খুলে বলুন দিকিনি, হুঁ হুঁ), ফলে কলকেতা শহরের যন্যি বিশেষ মার্কেটিং প্ল্যান বানানো হচ্ছে, এবং বাংলা ভাষায় লিখিত পোস্টারে পোস্টারে চারিদিক ছয়লাপ করে দেওয়া হবে।

সাধু উদ্যোগ। আমরা তো মশাই সেলসম্যান এবং মার্চেন্ডাইজার বাহিনী নিয়ে রেডি, এমন সময় মার্কেটিং হেডের ফোন, 'তুঝে বাংলা পঢ়া আতা হ্যায় কেয়া?'

মানে? খাজা কাঁঠাল নাকি ব্যাটা? আতা হ্যায় কি রে, আম হ্যায়, জাম হ্যায়, জামরুল হ্যায়, কাঁঠালি কলা ভি হ্যায়। তোর দরকারটা কি সেইটে খুলে বল দিকিন।

'পোস্টার কা বাংলা ভার্শান আয়া হ্যায়, পঢ়কে বাতা, সব ঠিকঠাক হ্যায় ইয়া নেহি।'

আচ্ছা, পাঠাও।

এলো, মানে তিনি এলেন। আর সে কি আসা! আমরা তো মশাই সেই হিন্দি ক্যাচলাইনের বাংলা অনুবাদ পড়ে হেসে কুটিপাটি! মাইরি! সে অনুবাদ শুনলে কলকাতা ইউনিভার্সিটি যে আমাদের ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াতো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! চাইকি 'গুডনাইটের ফাঁসি চাই, দিতে হবে, দিয়ে দাও' বলে কলেজ স্কোয়ারে চাট্টি মিছিল বেরোলেও আশ্চয্যি হতাম না!

যথারীতি হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে মার্কেটিং ম্যানেজারকে শুধোলাম, 'কৌনসা চু** ইয়ে বানায়া হ্যায় ভাউ' (মারাঠিতে ভাউ মানে সম্মানীয় বড়দা)।

তিনি রোষকষায়িত লোচনে (মানে টেলিফোনে যতটা লোচন বোঝা যায় আর কি!) 'ঠিক হ্যায় বে, ফির তু হি বানা!'

বাঙালকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ পার পায়নি একথা সর্ববাঙালবিদিত। ফলে সেই ''মচ্ছরোঁ সে করে ওয়ার, ত্বচা সে করে পেয়ার'' নিয়ে বসতে হলো। শেষে দমদম পার্কের নাইট ক্যুইন ডান্সবারে চার পেগ মাল চড়িয়ে, লাভলির ডান্স দেখতে টক করে বাংলাটা মাথায় চলে এলো, 'মশার জন্যে সর্বনাশা, ত্বকের প্রতি ভালোবাসা'।

সেইদিন লাভলি ওরফে পাকিজাকে পাঁচশো টাকার বকশিশ দিয়েছিলুম,স্পষ্ট মনে আছে! সেদিন আমার অনারে স্পেশাল 'কাজরা রে' নেচেছিলো, আহা, সে অসামান্য নাচ এখনও চোখে লেগে আছে।

এত কথা বলার কারনটা হলো যে আজ সকালের আনন্দবাজারে এয়ারটেলের একটি অকথ্য এবং অশ্রাব্য বাংলায় লেখা অ্যাড বেরোয় বলে শুনেছি। আমার বাড়িতে গত দশ বছর ধরে আনন্দবাজার ঢোকে না। ফলে এহেন কীর্তিটির খোঁজ পাই ফেসবুকে। আর তারপর সেই স্টেটাস সুনামি।

এখানে একটি কথা খুবই সাহস টাহস করে অতি সন্তর্পণে অভিজ্ঞজনের চরণে পেশ করি। তেরো বছর হয়ে গেলো কর্পোরেট লাইনে আছি। মার্কেটিংএর অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এতে আনন্দবাজারের কিছু মাত্র দোষ লেই কো! কম্পানির মিডিয়া এজেন্সি আর মিডিয়া হাউসের মধ্যে এই চুক্তিই হয় যে এজেন্সি হাতি ঘোড়া গু গোবর যা ছাপাবে, মিডিয়া তাই ছাপতে বাধ্য। একটি অক্ষর ইদিকউদিক করার কথা, বা কালার টোন সামান্য বদলে দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না! পরে যদি এজেন্সি এসে তেড়েমেড়ে বলে যে 'ওইটেই আমাদের ক্লায়েন্ট চেয়েছিলেন, আপনি ফোঁপরদালালি করার কে মশাই? এই যে মুমুর্শুর বানান বদলে মুমূর্ষু করে দিলেন, জানেন এতে করে আমার ক্লায়েন্টের আড়াই জন কাস্টমার কমে গেছে, ফলে উহাদিগের সতেরো নয়া পয়সা প্রফিট ক্ষতি হইয়াছে, এ ক্ষতিপূরণ কে করবে? আপনি?' তাহলে মিডিয়ার কুচ্ছু করার থাকে না। ফলে তিনি যা পান, অম্লানবদনে তাই ছেপে দেন। শুধুমাত্র দেশের ক্ষতি হয়, বা দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হয় এমন কপি চোখে পড়লে মিডিয়া ম্যানেজার ওপরওয়ালার মতামত চান। নইলে এসব এয়ারিটেলের ফেয়ারিটেলে পেয়ার কা দুশমন জান কা দুশমন হতে তাঁদের বয়েএএ গ্যাছে!

দোষটা কার? এয়ারটেলের মার্কেটিং এন্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার এবং তাদের মিডিয়া এজেন্সির। সবসময় এসব স্থানীয় ভাষায় লেখা পাবলিক কমিউনিকেশন মার্কেটিং ম্যানেজাররা ব্যক্তিগত ভাবে একবার ক্রস চেক করিয়ে নেন। এক্ষেত্রে এজেন্সিটি যে অপদার্থের একশেষ সে নিয়ে সন্দেহ নেই, মূল অপরাধ তাদেরই। গাদাগুচ্ছের টাকা খিঁচে এই অ্যাড কপি উপহার দেওয়া প্রায় ক্রিমিনাল অফেন্স, তাদের কন্ট্রাক্ট আজ কালের মধ্যে বাতিল না হলে আশ্চর্য হবো। তবে এয়ারটেলের মার্কেটিং ম্যানেজারও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ওটুকু সতর্কতা বজায় রাখার জন্যেই তেনাকে অত টাকা মাইনে দেওয়া হয়।

আবারও বলছি, আনন্দবাজারের দায়িত্ব এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তাদের কিছুই করার ছিলো না।

এই নিয়ে একটা মজার গল্প বলি। এসব কাণ্ডকে ইংরেজিতে বলে ফ 'পা' (faux pas)। এরকম মার্কেটিং ফ 'পা' র গল্প আপনি মার্কেটিং বা অ্যাড এজেন্সির লোকেদের কাছে গাদাগাদা শুনতে পাবেন। তারই মধ্যে থেকে এক উমদা পিস পেশ করি।

উত্তরভারতখ্যাত একটি ব্যথা বেদনা উপশমকারী মলম প্রস্তুতকারক কম্পানি ঠিক করলেন তাঁরা দক্ষিণ ভারতে ব্যবসা বাড়াবেন। দক্ষিণ ভারত অমৃতাঞ্জনের দুর্গ বললেই চলে। এঁরা সেখানে তেমন কিছু সুবিধা করে উঠতে পারেননি। সেখানে কিছু করতে গেলে সোজা সদর দফতরে কামান দাগাই শ্রেয়। ফলে অনেক ব্রেইনস্টর্মিং এর পর, দু-দুটি অ্যাড এজেন্সি পেশ করলো তাদের ক্রিয়েটিভ জ্যুইস নিংড়োনো সেই অসামান্য কপি, দেখা যাচ্ছে যে মলমের টিউব থেকে একটু মলম বেরিয়ে আছে, নিচে লেখা your own soothepaste। মানে আপনার ব্যথা বেদনায় আরাম দেয় বা সুদিং করে এমন পেস্ট। সঙ্গে টুথপেস্টের সঙ্গে অ্যালিটারেশন।

চমৎকার না?

অফ কোর্স চমৎকার! মার্কেটিং ম্যানেজার আর দুবার ভাবলেন না। কম্বুর্ন্তে বললেন গো অ্যাহেড গাইজ। ক্র্যা ক দ্য মার্কেট!

তা হইহই করে একদিন রাতের বেলা সেই হোর্ডিং এ মুড়ে ফেলা হলো সমস্ত চেন্নাই! অ্যাড এজেন্সি, মিডিয়া এজেন্সি আর মার্কেটিং ম্যানেজার সোল্লাসে গলা অবধি মাল টেনে ঘুমোতে গেলেন।

পরদিন সক্কালে সেই কম্পানির ডিরেক্টরের কাছে তামিলনাড়ুর গভর্নমেন্ট থেকে ফোন। ওপারের লোকটি যাবতীয় শ কারান্ত ব কারান্ত (শেষ হলে ম ও চ কারান্ত) গালি দিয়ে জানালো যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ এক্ষুণি যেন সমস্ত হোর্ডিং নামিয়ে ফেলা হয়। নইলে মেরিনা বিচে মে মাসে দুপুরে দাঁড় করিয়ে শুকনো ইডলি খাইয়ে এবং তদন্তে জল না দিয়ে সব কটাকে কোতল করা হবে!

যথারীতি কম্পানির সক্কলে না রাম না গঙ্গা! মার্কেটিং ম্যানেজার তখন মহাবলীপুরমের রিসর্টে তাঁর তামিল গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে বোধহয় ইকিড়মিকিড় চামচিকির খেলতে গেছিলেন। বড়কর্তার ধমক খেয়ে প্যান্টটা পরেই দৌড়!

চেন্নাই ঢুকে দেখেন সারা শহর হাসছে! যেখানেই সেই হোর্ডিং, সেখানেই ক্যাওড়া পাবলিক জড়ো হতে হুল্লাট মজা নিচ্ছে। তামিল ভদ্রজনেরা দেখামাত্র মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কম্পানির নামে খিস্তি করছেন, কেউ হোর্ডিংরে নামে ঢিল ছুঁড়ছেন...মানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি বা কংগ্রেসের রাজ্য দফতরের অবস্থা আর কি!

তা তিনি নেমে একজনকে পাকড়াও করলেন, 'এত হাসির কি হলো ভায়া?'

'ও হোহোহো, সুদপেস্ট.. হ্যা হ্যা হ্যা' করে সে ফের হেসে গড়িয়ে পড়ে!

ম্যানেজার সাহেব এবার ন্যায্য কারনেই অসহিষ্ণুহয়ে পড়েন, 'তাতে হয়েছেটা কি?'

সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকায়, তারপর ফের হাসিতে ফেটে পড়ে, 'তুমি তামিল নও, না?'

'না। তো?'

'তাই সুদ শব্দের মানে জানো না, ও হো হো হো'

এবার চেঁচিয়ে ফেলেন ম্যানেজার, 'বলি হেসেই যাবে না মানেটাও বলবে?'

'তামিলে সুদ মানে পোঁদ। এই হোর্ডিংটার মানে হচ্ছে, ও হো হো হো, টিউবে ভরা আপনার নিজের পোঁদের পেস্ট'!